রাহুগ্রস্ত বাংলাদেশ

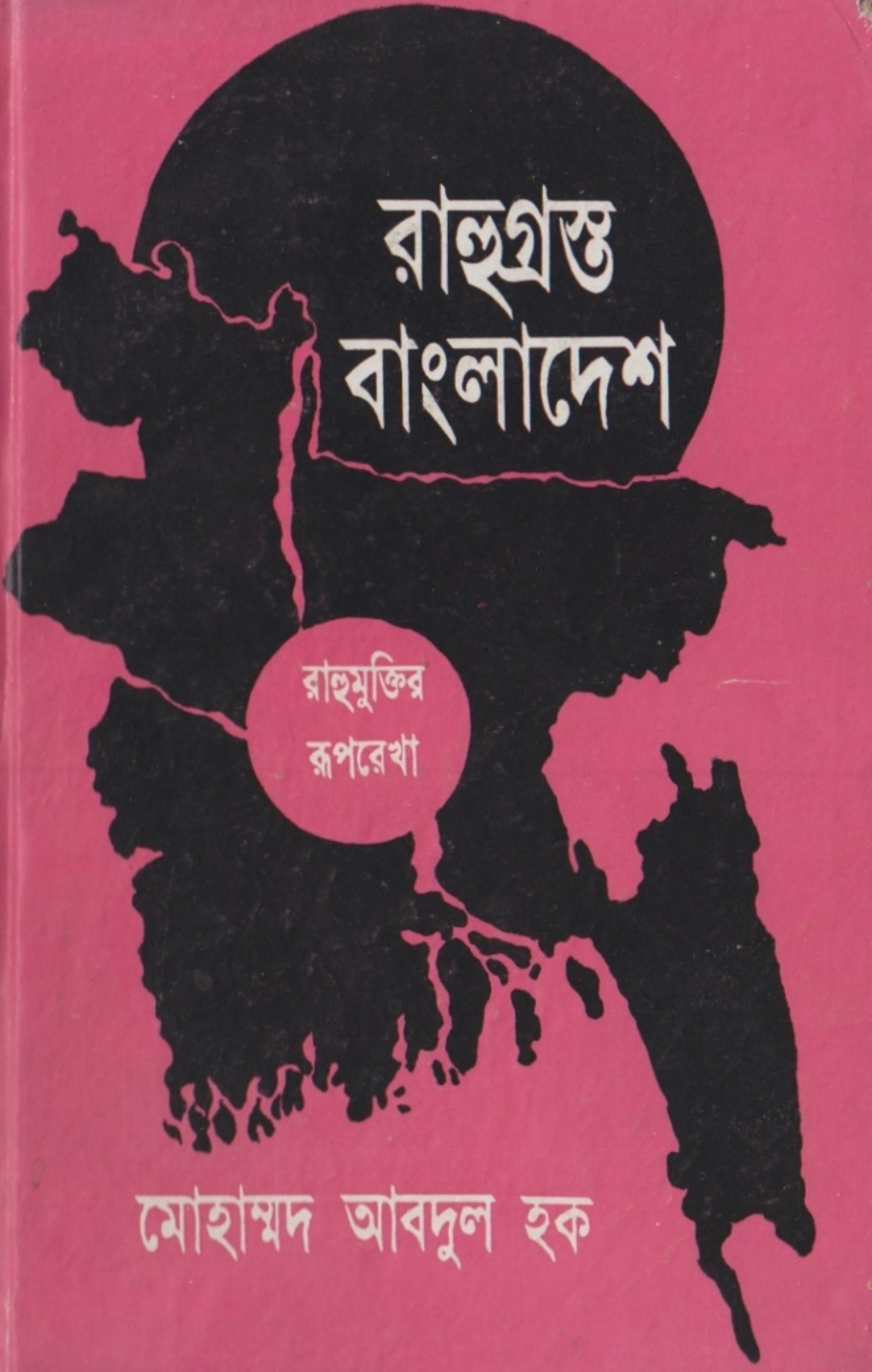

মোহাম্মদ আবদুল হক

রাহুগ্রস্ত বাংলাদেশ

(রাহু মুক্তির রূপরেখা)

সৌজন্য কপি
অনুগ্রহ পূর্বক লিখিত মতামত
পাঠালে কৃতার্থ হবো

মোহাম্মদ আবদুল হক

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ রুহুল আমিন বাবুল
রুনাপ্রকাশনী
৪/৫ প্যারীদাস রোড
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম সংস্করণ ঃ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯০
ফাল্গুন ১৩৯৬
প্রচ্ছদ ঃ আবদুর রৌউফ সরকার
গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার
মুদ্রণ ঃ সুশ্রী কম্পিউটার্স
২৫ পদ্মনিধি লেন, ঢাকা-১১০০
বাঁধাই ঃ মানিকগঞ্জ বাইন্ডিং হাউস
মূল্য ঃ শোভন- ১২৫·০০
সুলভ-৭৫·০০
Overseas-$ 7.00

RAHU GRASTA BANGLADESH.

(RAHU MUKTIR RUP-REKHA)

A Pen Picture of acute poverty & unemployment; of population explosion & stagnant social scene; of rampant corruption & maladminstration; of continued political stalemate & furstration in

BANGLADESH.

with an ACTION PLAN which is seemingly incredible in its pragmatism & confidence.

www.pathagar.com

ঃ গ্রন্থকারের চিঠিঃ

(বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম)

সিলেট হাউস,
টিকাটুলী, ঢাকা

১। বাংলাদেশের নিপীড়িত নির্যাতিত দারিদ্র প্রপীড়িত জনগণ,
২। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক নেতা নেত্রী ও কর্মীগণ,
৩। বাংলাদেশ সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

সমীপেষু।

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা,

আপনারা সকলে আমার সালাম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গ্রহণ করুন। আমি আপনাদেরই একজন নগণ্য খাদেম; আপনাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাথী। আমার পরম সৌভাগ্য যে জীবনের সপ্তম দশকেও আমি সুস্থ সবল ও কর্মঠ।

আপনাদেরই মতো আমি একজন ধর্মভীরু, দেশপ্রেমিক। দেশের সমস্যা জর্জরিত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি আমাকে দিবারাত্র অবিরাম পীড়া দেয়। দেশের এক কোটি গৃহহীন, সর্বস্বহীন, অনাহার অর্ধাহার অপুষ্টিতে কংকালসার, কর্মশক্তিহীন, চিন্তাশক্তিহীন যে মানব গোষ্ঠি কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার জন্য, ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্য দিনরাত ডাস্টবিনের পরিত্যক্ত খাদ্যসহ যেখানে যা কিছু খাবার পায় সেটাই কুড়াতে থাকেন, এদের জন্য আমারও প্রাণ কাঁদে।

আরো পাঁচ কোটি জনগোষ্ঠি যারা ভূমিহীন, উপার্জনহীন, আন্তর্জাতিক দারিদ্র সীমারেখার নিম্নতম স্তরের ও নীচে মানবেতর অবস্থায় রসাতলে অবস্থান করছেন, তাঁদের জন্য আমিও শংকিত।

আরো চার কোটি জনগোষ্ঠি, যারাও দারিদ্রের যে কোন সংজ্ঞারই অর্ন্তভুক্ত, যারাও আধুনিক সভ্যতার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য আমিও বিচলিত।

আর বাদবাকী এক কোটি লোক, যারা সুযোগসন্ধানী, দূর্নীতিবাজ, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারামের পার্থক্য ভুলে গিয়ে কেবল নিজেদের নিয়েই বিব্রত, তাদের জন্য আমি সর্বাধিক শংকিত।

www.pathagar.com

অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, সাধনা-গবেষণার উপর ভিত্তি করে আমি আমার এগারো কোটি ভাই বোন সহ রসাতল থেকে উত্থানের যে রূপরেখাটি বহুকষ্টে অংকিত করেছি, এই ক্ষীণ আশা নিয়ে যে, কোটি কোটি শিশু কিশোর যুবক যুবতী, যারা দেশটাকে রসাতলে ঠেলে দেয়ার জন্য দায়ী নয়, তাদের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে, তাদের আশা আকাংখার কথা চিন্তা করে, আর আমাদের অনিবার্য ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য, আসুন আমরা দেশটাকে বাঁচাবার একটা দৃঢ় সংকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলে এখনো বিশ্বের নিকৃষ্টতম এই দেশকে রসাতল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

আমার প্রদত্ত রূপরেখা একটি নীল নক্শা নয়। এটা প্রয়োজন মতো সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিবর্তনশীল। তবে আমরা সবাই মিলে যা করবো, তার ভিত্তি হতে হবে মানবিক বিবেচনা, জাগতিক বাস্তবতা আর দেশের জনগণের কন্‌সেন্‌সাস্ বা বৃহত্তর ঐক্য মত।

পুস্তক খানা পাঠ করে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, এমনকি কোন ভিন্ন মত থাকলে, আমি সাধ্যমতো উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

আসুন আমরা সবাই মিলে দেশটাকে রসাতল থেকে উদ্ধার করতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু করি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার মেহেরবাণীর উপর নির্ভর করে আমরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ আবদুল হক
১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অর্ধ শতাব্দীরও দীর্ঘকাল ধরে দেশ বিদেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক সামাজিক ও অথনৈতিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আবদুল হক প্রণীত "রাহুগ্রস্ত বাংলাদেশ" এক ব্যতিক্রমধর্মী পুস্তক। কোন একটি দেশের সমকালীন সার্বিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করে, শ্রেণীগতভাবে সমস্যা সমাধানের বাস্তবধর্মী পরামর্শ কোন পুস্তকে কোথাও প্রকাশ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আরো বেশী জটিল। কেবল আমাদের দেশের জনগণই নন, সারা বিশ্বের জনগণও জানেন, এক বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি, বাংলাদেশ নামক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, সমস্যায় জর্জরিত। কেবল মানব সৃষ্ট রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক সমস্যাই নয়, প্রকট অর্থনৈতিক সমস্যার আঘাতে এগারো কোটি মানুষের এই দেশটা কেবল টিকে থাকার জন্যই আন্তর্জাতিক সাহায্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

গ্রন্থকার ঠিকই বলেছেন, যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় হয়েছে, সেই অঞ্চলের সমস্যাবলী কোন কালেই চিহ্নিত হয়নি। গ্রন্থকার সমস্যাবলী চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হননি, সমস্যাবলীর সম্ভাব্য সমাধানেরও সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন।

আমাদের বিশ্বাস অর্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকালের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ তাঁর পরামর্শ পাঠকবর্গের মনে গভীর রেখাপাত করবে।

১৯৮৯ সালের এই দিনে (১০ ফেব্রুয়ারী) আমরা প্রকাশ করেছিলাম জনাব এম, এ, হক বিরচিত "সৃষ্টির সেরা শত মানব" পুস্তক। তখন বলেছিলাম, গ্রন্থকারের বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ কাহিনী "বিদেশে যা দেখে এলাম" প্রকাশনা স্থগিত রেখে সংগত কারণেই "সৃষ্টির সেরা শত মানব" পুস্তক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকাশ করলাম।

আজ আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি, "রাহুগ্রস্ত বাংলাদেশ" পুস্তকখানির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা বাধ্য হয়ে ছয় খন্ডের "বিদেশে যা দেখে এলাম" পুস্তক প্রকাশনা আবারও বিলম্বিত না করে পারলাম না। আমরা আশা করছি, আগামী মাস থেকেই "বিদেশে যা দেখে এলাম" পুস্তকের প্রথম খন্ড প্রকাশনার কাজে হাত দেবো।

আমরা মনে করি "রাহুগ্রস্ত বাংলাদেশ" নামক এই অনন্য সাধারণ পুস্তক সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশে এক চাঞ্চল্যকর আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

রুনা প্রকাশনী
৪/৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

রুহুল আমিন বাবুল
১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

০১ঃ প্রেক্ষাপট ৯

০২ঃ বাংলাদেশ—১৯৮৯ ২০

২·০১ঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ২১

২·০২ঃ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ২৮

২·০৩ঃ ঘটনা-দূর্ঘটনা ৩২

২·০৪ঃ শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি ৩৪

২·০৫ঃ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ৩৮

২·০৬ঃ ভিক্ষাবৃত্তি ৪০

২·০৭ঃ চরিত্র সংকট ৪১

২·০৮ঃ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ৪৩

২·০৯ঃ বাংলাদেশ-১৯৮৯ পরিক্রমা ৪৬

০৩ঃ বাংলাদেশের সমস্যাবলী ৪৭

৩·০১ঃ রাজনৈতিক সমস্যা ৪৯

৩·০২ঃ প্রশাসনিক সমস্যা ৫০

৩·০৩ঃ সামাজিক সমস্যা ৫২

৩·০৪ঃ অর্থনৈতিক সমস্যা ৫৫

৩·০৫ঃ বাংলাদেশের সমস্যা পরিক্রমা ৬০

০৪ঃ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ৬১

০৫ঃ প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান ৬৭

০৬ঃ সামাজিক সমস্যার সমাধান ৭৫

৬·০১ঃ ভূমিকা ৭৫

৬·০২ঃ শিক্ষা সমস্যা ৭৭

৬·০৩ঃ স্বাস্থ্য সমস্যা ৭৮

৬·০৪ঃ নিরাপত্তা সমস্যা ৮৬

৬·০৫ঃ নারী নির্যাতন ৮৯

৬·০৬ঃ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ৯০

৬·০৭ঃ মাদকাসক্তি সমস্যা ৯৩

৬·০৮ঃ সামাজিক সমস্যা পরিক্রমা ৯৬

০৭ঃ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ৯৭

৭·০১ঃ ভূমিকা ৯৭

৭·০২ঃ দারিদ্রের দুষ্টচক্র ৯৮

৭·০৩ঃ দারিদ্রের করুণ চিত্র ৯৯

৭·০৪ঃ দারিদ্র বেকারত্ব ১০০

৭·০৫ঃ দারিদ্র কবলিত দশ কোটি ১০১

৭·০৬ঃ দারিদ্র বনাম কৃষি ১০২

৭·০৭ ঃ দারিদ্র বনাম ভূগর্ভ সম্পদ ১০৪

৭·০৮ঃ দারিদ্র বনাম শিল্প ১০৫

৭·০৯ঃ দারিদ্র বনাম জনসংখ্যা ১০৯

৭·১০ঃ দারিদ্র বনাম পাঁচশালা পরিকল্পনা ১১১

০৮ঃ দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন ১১৩

www.pathagar.com

৮০১ঃ ভূমিকা ১১৩
৮০২ঃ ভূমির অপচয় ১১৪
৮০৩ঃ ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার ১১৭
০৯ঃ বাংলাদেশের ভূমি সম্পদ ১২৩
৯০১ঃ ভূমিকা ১২৩
৯০২ঃ ভূমির পরিসংখ্যান ১২৪
৯০৩ঃ চরাঞ্চল ১২৫
৯০৪ঃ হাওর-বাঁওড়ের নিম্নভূমি ১২৭
১০ঃ ভূমি পুনরুদ্ধার ১২৮
১০০১ঃ ভূমিকা ১২৮
১০০২ঃ অপচয়কৃত ভূমি পুনরুদ্ধার ১৩০
১০০৩ঃ নদ-নদীর চর পুনরুদ্ধার ১৩৪
১০০৪ঃ ভূমি পুনরুদ্ধার পরিক্রমা ১৩৫
১১ঃ কৃষি বিপ্লব ১৩৭
১১০১ঃ সনাতনী কৃষি ১৩৭
১১০২ঃ কৃষির 'মৌসুম বিপ্লব' ১৩৮
১১০৩ঃ কৃষির প্রধান মৌসুম ১৪১
১১০৪ঃ প্রধান মৌসুমে সুযোগ ও সম্ভাবনা ১৪৪
১১০৫ঃ শুকনো মৌসুমের চাষাবাদের সমস্যা ১৪৬
১১০৬ঃ শুকনা মৌসুমে পানি সংরক্ষণ ১৪৯
১২ঃ ভূমি বিপ্লব ১৫২
১২ঃ০১ঃ ভূমিকা ১৫২
১২০২ঃ দারিদ্র বনাম ভূমি সম্পদ ১৫৫
১২০৩ঃ ভূমিহীন বনাম স্থাবর সম্পত্তি ১৫৭
১২০৪ঃ গ্রামাঞ্চলে ফলের চাষ ১৫৯
১২০৫ঃ শিক্ষাঙ্গনে ফল ও সব্জি ১৬০
১২০৬ঃ নগরীতে ফলের চাষ ১৬১
১২০৭ঃ নার্সারী ১৬৩
১২০৮ঃ তিলোত্তমা ঢাকা ১৬৫
১৩ঃ বৃক্ষ বিপ্লব ১৬৭
১৩০১ ঃ ভূমিকা ১৬৭
১৩১০১ঃ কাঁঠাল ১৬৭
১৩১০২ঃ আম ১৭১
১৩১০৩ঃ পেয়ারা ১৭৩
১৩১০৪ঃ কুল ১৭৫
১৩১০৫ঃ নারিকেল ১৭৬
১৩১০৬ঃ তাল ১৭৮
১৩১০৭ঃ খেজুর ১৭৯
১৩১০৮ঃ সুপারী ১৮০
১৩১০৯ঃ কমলা, সাতকরা ১৮১

www.pathagar.com

১৩·১·১২ঃ বিলিম্বি ১৮৫
১৩·১·১৩ঃ বৃক্ষ বিপ্লব পরিক্রমা ১৮৬
১৪ঃ তৃণ, গুল্ম, সব্জি ১৮৭
১৪·০১ঃ বাঁশ, বেত, মুরতা ১৮৭
১৪·০২ঃ পেঁপে ১৮৯
১৪·০৩ঃ কলা ১৯১
১৪·০৪ঃ আলু ১৯২
১৪·০৫ঃ টমেটো ১৯৩
১৪·০৬ঃ কাকরল ১৯৪
১৪·০৭ঃ মাশরুম ১৯৫
১৪·০৮ঃ তৃণ, গুল্ম, সব্জি পরিক্রমা ১৯৬
১৫ঃ দারিদ্র বনাম বনায়ন ১৯৭
১৬ঃ পশু পালন ১৯৯
১৬·০১ঃ ভূমিকা ১৯৯
১৬·০২ঃ দুধেল গাভী ২০১
১৬·০৩ঃ দুধেল ছাগল ২০৫
১৬·০৪ঃ মোরগ–হাঁসের খামার ২০৬
১৭ঃ পানি সম্পদ ২০৮
১৭·০১ঃ ভূমিকা ২০৮
১৭·০২ঃ মৎস্য সম্পদ ২০৯
১৭·০৩ঃ চিংড়ি চাষ ২১২
১৭·০৪ঃ ব্যাঙের চাষ ২১৩
১৭·০৫ঃ মুক্তার চাষ ২১৪
১৭·০৬ঃ গুই সাপ ঃ কচ্ছপঃ কাঁকড়া ২১৭
১৭·০৭ঃ পানিতে অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন ২১৮
১৮ঃ দারিদ্র বনাম শিল্প ২১৯
১৮·০১ঃ ভূমিকা ২১৯
১৮·০২ঃ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ২১৯
১৮·০৩ঃ পাট শিল্প ২২০
১৮·০৪ঃ চা শিল্প ২২২
১৮·০৫ঃ চিনি শিল্প ২২২
১৮·০৬ঃ চামড়া শিল্প ২২৩
১৮·০৭ঃ রেশম শিল্প ২২৪
১৮·০৮ঃ ক্ষুদ্র শিল্প ২২৫
১৮·০৯ঃ পশু খাদ্য শিল্প ২২৭
১৮·১০ঃ কয়লা শিল্প ২২৯
১৮·১১ঃ পীট শিল্প ২৩০
১৮·১২ঃ চুনাপাথর শিল্প ২৩৪
১৮·১৩ঃ বোলডার শিল্প ২৩৪

www.pathagar.com

১ ঃ প্রেক্ষাপট

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে আমাদের পারিবারিক সাপ্তাহিক "বাংলার ডাক" পত্রিকায় বাংলাদেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার লেখা ছয়টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। নিবন্ধ গুলোর শিরোনাম ছিলোঃ-

(১) দেশটা কি রসাতলেই যাবে?

(২) রসাতল আর কত দূর?

(৩) রসাতল যাত্রা ঠেকানো কি সম্ভব?

(৪) রসাতল যাত্রা ঠেকাতে হলে?

(৫) রসাতল যাত্রা ঠেকাতেই হবে।

(৬) রসাতল যাত্রা ঠেকানো অবশ্যই সম্ভব।

ঐ নিবন্ধ গুলোর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দেশের গণ্যমান্য যে কয়জন ব্যক্তির সাথে আলোচনা হয়েছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব এ এস এম সায়েম, সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আহসান উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী সর্বজনাব ডক্টর এম এন হুদা, অধ্যাপক সামসুল হক ও বি এম আব্বাস এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ।

শ্রদ্ধাস্পদ মরহুম আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শে ঐ নিবন্ধগুলো একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার প্রয়াস পাই। সেই ছয়টি নিবন্ধ ছাড়াও পুস্তিকায় একটি পরিশিষ্ট যোগ করে দেই। "দেশটা কি রসাতলেই যাবে?" শিরোনামে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে।

পুস্তিকাটি প্রকাশ হওয়ার পর দেশের অনেক রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজসেবী, আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু লোকের সাথে সমস্যা জর্জরিত দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই সব আলোচনা থেকে আমার বিশ্বাস হয় যে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি যতটা সংকিত-সন্ত্রস্ত, তাঁদের অনেকেই তার চেয়ে কম সংকিত-সন্ত্রস্ত নন। কোন কোন পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুস্তিকাটিতে আমি যে সব কঠোর মন্তব্য করেছিলাম তার সাথে দ্বিমত পোষণ করাতো দূরের কথা, কেউ কেউ আমার চেয়ে আরো কঠোর ভাষায় তৎকালীন চলমান অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন।

১৯৮৫ সনে দেশে যে সার্বিক অবস্থা বিরাজ করছিলো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি বলেছিলামঃ- "সমাজ এখন কেবল নৈরাজ্য ও অস্থিরতায়ই ভুগছে না, অনেকটা উদভ্রান্ত, উন্মাদ হয়ে গেছে। গোটা সমাজটাই যেন পাগলামী মাতলামীর শিকারে পরিণত হয়েছে।"

www.pathagar.com

আরো বলেছিলাম, "যে দুর্নীতিকে একদিন জাতির এক নম্বর শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো, সেই দুর্নীতিই আজ সমাজের এক নম্বর শক্তি। এই দুর্নীতি এখন প্রায় সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।"

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমার লেখা "চাই শান্তি শৃংখলা, চাই আইনের শাসন" শীর্ষক নিবন্ধের রেশ টেনে ১৯৮৫ সালে বলেছিলামঃ- "সুদীর্ঘ ১১ বছর পর আজ আবার বিবেকের দংশনে নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখন অবস্থা আরো বেশী গুরুতর, কারণ এখন দেশের বিচার ব্যবস্থার উপরও জনসাধারণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।" আরো বলেছিলাম, "যে মানুষ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের শ্লোগানে সাড়া দিয়ে অখন্ড ভারতকে দ্বিখন্ডিত করেছিলো, যে মানুষ তার মুখের ভাষার জন্য পোয়া শতাব্দি পর্যন্ত দুর্দন্ড-প্রতাপ পাকিস্তানী শাসক গোষ্টির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলো, যে মানুষ অন্যায় অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য এক দুর্ধষ সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে রিক্ত হস্তে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলো এবং নয়টি মাস ধরে মারমুখি যুদ্ধ করে শোষকদের বিতাড়িত করে এক নুতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিলো, ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, মাত্র অর্ধ যুগ যেতে না যেতেই সেই মানুষ আজ লক্ষ্য ভ্রষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত, চেতনাহীন, স্পন্দনহীন।" আরো বলেছিলাম, "এই মারাত্মক পরিবর্তন, এই যে চরম নৈরাশ্য, সার্বজনীন অবিশ্বাস ও অস্থিরতা এ সবের কার্য্যকারণ নির্ণয় করার একটা প্রয়াসও কি হয়েছে? বছরের পর বছর এই অধঃপতনের ধারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, এর গতিরোধ করার কোন প্রচেষ্টাও হলো না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের আর কি হতে পারে?"

১৯৮৫ ইংরেজীতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, "কিন্তু বর্তমানে মারাত্মক অপরাধের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনায় অপরাধীদের চরম নিষ্ঠুরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষকে খুন করেই খুনিরা সন্তুষ্ট নয়। লাশ গুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করে, বিকৃত করে তারা তাদের ঘৃণ্যতম পৈশাচিক মানসিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। এই নিষ্ঠুরতা, এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পৈশাচিক মনোবৃত্তি থেকে পরিস্কার প্রতীয়মান হয় এদেশের কিছু সংখ্যক লোক আজ কতো নিষ্ঠুর হয়ে গেছে, কতো নীচে নেমে গেছে। নর হত্যাকে সাধারণ মানুষ যত ভয় করে তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় করে নিষ্ঠুরতাকে। একটি নরহত্যার খবরে মানুষ যতটুকু আতংকিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী আতংকিত হয় নিষ্ঠুরতার দৃশ্য দেখে বা শুনে। আজকাল দুষ্কৃতকারীরা নর হত্যা করছে কেবল প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার জন্যই নয়, বরং গোটা সমাজে আতংক সৃষ্টি করার জন্য। তাদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। গোটা সমাজ আজ আতংকে হতবাক ও ভীত সন্ত্রস্ত। সমাজ আজ দুস্কৃতকারীদের হাতে জিম্মী।"

দেশের সামাজিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৮৫ সালের সেই পুস্তিকায় লিখেছিলাম, "মানুষ কল্পনাই করতে পারেনি, এদেশের শাসকেরা দারিদ্রকে এভাবে সযত্নে লালন করবেন, ভিক্ষার সুযোগ বহাল রাখার জন্য, সুশিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা ও

www.pathagar.com

কুশিক্ষার পথ প্রশস্ত করে দেবেন যাতে করে মানুষ তাদের অধিকার ও ন্যায্য প্রাপ্য সম্পর্কে সজাগ না হতে পারে, উপলব্ধি না করতে পারে শাসকদের এই বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাজনিত কর্মকান্ড। মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এত শীঘ্র তাদের ঐতিহ্যবাহী মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হবে, আর তাদের স্বপ্নের দেশের শাসক গোষ্টি সেই অবক্ষয়ের গতিধারা প্রতিরোধ করার পরিবর্তে বরং জিইয়ে রেখে গোটা জাতিটাকে চরিত্রহীন করে ছাড়বেন। মানুষ ভাবতেও পারেনি এই দেশের শিক্ষাঙ্গন পরিণত হবে রণাঙ্গনে, আর এই শিক্ষাঙ্গনেই লালিত হবে নিয়মিত গুন্ডাবাহিনী, শ্বেত সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে দমিয়ে রাখার জন্য। ·· এই সব অচিন্তনীয়, অকল্পনীয় পরিস্থিতি মানুষকে আজ করে ফেলেছে বিমূঢ়, স্থবির, চেতনাহীন। মানুষের মনুষ্যত্বই আজ বিপন্ন। তাই সংগত কারণেই বলা যায়, দেশ এখন ধাবিত হয়েছে রসাতলের দিকে। এই রসাতল যাত্রা ঠেকাতে না পারলে জাতি হিসাবেই আমরা বিলুপ্ত হয়ে যাবো। আমরা ইতিমধ্যে সারা বিশ্বের করুণা ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়েছি; আমাদের এই রসাতল যাত্রা প্রতিহত না করতে পারলে সে দিন আর বেশী দুর নয় যখন আমরা সারা বিশ্বের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবো; সকলের জন্য আমরা হয়ে দাড়াবো একটি অবাঞ্ছিত বোঝা। তখন আমরা কারো করুণাও আশা করতে পারবো না।"

১৯৮৫ সালের পুস্তিকায় আরো বলেছিলাম, "যদিও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে আমরা পরাধীন ছিলাম, গরীব ছিলাম, কিন্তু ভিখারী ছিলাম না, মিসকীন ছিলাম না। আমাদের একটা আত্ম সম্মান, একটা আত্ম-মর্যাদা ছিলো। আজ আমরা পরিণত হয়েছি ভিখারীর জাতিতে, মিসকীনের জাতিতে, আত্ম মর্যাদাহীন জাতিতে। উপরোন্ত বৃটিশ প্রদত্ত নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার, সেটাও ধুলিসাৎ হয়ে গেলো। এখন আমরা নিরাপত্তাহীন। বিচারকে আজ আমরা বেচাকেনার সামগ্রীতে পরিণত করেছি।"

"দেশটা কি রসাতলেই যাবে?" পুস্তিকায় আমি আরো বলেছিলাম, "১৯৭৯-৮০-৮১ সালে বাংলাদেশ পার্লামেন্টের তিনটি বাজেট অধিবেশনেই আমি দেশের এই অধঃপতন মুখী অভিযাত্রার উপর সুদীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলাম। সেই তিনটি ভাষণেই আমি বলেছিলাম, "দেশের গণমানুষের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতই করা হয়নি। অল্প যে কয়টি সমস্যা সম্বন্ধে সবাই মোটামুটি অবগত আছেন, সেই কয়টি সমস্যারও অগ্রগণ্যতা নির্ধারিত হয়নি, সমাধানের প্রচেষ্টার তো কথাই উঠেনা।" আমি সেই তিন বছরের তিনটি বাজেট বক্তৃতায়ই বলেছিলাম, "কেউ বলেন দেশের সর্ব প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, কেউ বলেন ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতি, কেউ মনে করেন আইন শৃংখলার অবনতি, কেউ মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্নদশা। কিন্তু আমি মনে করি এ গুলো মারাত্মক সমস্যা বটে, তবে আসল সমস্যা হলো চরিত্র সংকট। মানবিক মূল্য বোধের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় ও দুর্নীতি সমাজ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে গোটা জাতিকে এতোই দুর্বল করে ফেলেছে যে, চরিত্র সংশোধন না করে অন্য কোন সমস্যার সমাধানই আর সম্ভব নয়। জনসংখ্যা সমস্যাই বলুন, খাদ্য সমস্যাই বলুন আর শিক্ষা সমস্যাই বলুন,

www.pathagar.com

যে সমস্যার সমাধানে হাত দেয়া যাবে দুর্নীতি সেই হাতকে অচল অবশ করে দেবে; ফলে সমস্যার কোন সমাধানই হবেনা ..... অর্থাৎ চরিত্র সংকট বা বিরাজমান দুর্নীতি দেশের এক নম্বর সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত অন্য কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়।"

"আমার এই সব বক্তব্যের উপর তখন কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি ..... কিন্তু পরবর্তি তিন বছরের অভিজ্ঞতা আমার সেই চিন্তা ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়ীত্বে থাকাকালীন সময়ে আমি দেশের সমস্যাগুলোর আরো গভীরে যাবার সুযোগ পাই। সেই সময় দেশের গণমানুষের মৌলিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার এবং সমস্যাবলীর অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করার যথেষ্ট উপাদান পাই। সমস্যাবলীর গভীরে গিয়ে আমার চিন্তা ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। আমি তখন থেকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, মানুষের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে না পারলে চরিত্র সংশোধন তথা দুর্নীতি দমন আদৌ সম্ভব নয়, কোন সমস্যার সমাধানই সম্ভব নয়।"

ক্ষুধা নিবারণ কথাটার তিন রকম অর্থ হতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষুধা নিবারণ কথাটা অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যখনি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় তখনই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঘোষণা দেয়া হয়, - "একজন লোককেও অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেয়া হবে না" এই ঘোষণার ভাষা দাম্ভিকতা পূর্ণ হলেও এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্কমূলক বক্তব্য রাখতে চাইনা। লোকতো সরাসরি অনাহারে মরে না। লোক মরে অপুষ্টিজনিত কারণে উদ্ভূত বিভিন্ন রোগে ; ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি পেটের পীড়ায়; চিকিৎসার অভাবে।

ক্ষুধা নিবারণ কথাটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, দেশে সব সময় চাহিদা মতো ধান, চাউল, গম মজুদ রাখা এবং বাজারে কমতি দেখা দিলেই ঐ মজুদকৃত খাদ্য বাজারে ছেড়ে দেয়া। এটা সরকার স্বীকৃত ব্যাখ্যা। ঘোষণা দেয়া হয়, খাদ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য যতটুকু গম চাউল আবশ্যক ততটুকুই দেশ থেকে সংগৃহিত হবে অথবা বিদেশ থেকে আমদানী করে আনা হবে। সেটা করা হয়ও; কখনো ভিক্ষা হিসাবে, কখনো বা ঋণ হিসাবে। এক খাদ্য মন্ত্রীতো বড় গলায় ঘোষণা দিয়েই ফেলেছিলেন, দেশ বিক্রি করে হলেও খাদ্য আমদানী করে অনাহারে মৃত্যু বন্ধ করা হবে। সর্বোপরি, প্রত্যেক সরকারই ঘোষণা দেন, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। তারপর ঐ নির্দিষ্ট সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন কোন না কোন কারণ দেখিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্য মাত্রা ছিলো ১৯৯০ সাল। অতি সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

ক্ষুধা নিবারণের তৃতীয় এবং বৃহত্তর অর্থ হলো দারিদ্র বিমোচন। আমি সব সময়ই ক্ষুধা নিবারণ বলতে সার্বিক ভাবে দারিদ্র বিমোচনই বুঝি। কারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না থাকলে দেশে খাদ্য দ্রব্যের পর্য্যাপ্ততা থাকলেও প্রকৃত অর্থে ক্ষুধা নিবারণ হয় না।

এটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে দারিদ্র বিমোচনের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা, কোন কার্য্যকরী পদক্ষেপের সন্ধান আমি খুজে পাইনি। তবে ১৯৪৭ খৃঃ ভারত বিভাগের পর তৎকালিন পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো। বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশে দারিদ্র বিমোচনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জনও হয়েছিলো। পাকিস্তানী শাসকবর্গ ঢাকঢোল না পিটিয়ে, অনেকটা চুপিসারে এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজটি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সিন্ধু প্রদেশেও ভূমির সদ্ব্যবহার শুরু হয়েছিলো এবং বেশ কিছুটা অগ্রগতিও সাধিত হয়েছিলো। এর ফলে পাঞ্জাব প্রদেশের গড়পরতা মাথাপিছু আয় অনেক বেড়ে যায়। সিন্ধু প্রদেশেও কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে অনুরূপ কোন পদক্ষেপের পরিবর্তে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নির্ভর করছে শিল্পায়নের উপর। শিল্পায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়; আর পশ্চিম পাকিস্তানীরাই এখানে এসে প্রায় বিনামূলধনে শিল্প স্থাপন শুরু করেন। শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিও শিল্প উন্নয়নের জন্য। এখানে ঐ প্রবঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত "দেশটা কি রসাতলেই যাবে?" শীর্ষক সেই পুস্তিকায় আমি দারিদ্র্যকেই বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছিলাম। আমি যুক্তি দিয়ে আশা প্রকাশ করেছিলাম বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। আমি দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করেছিলাম যে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রসাতল যাত্রা ঠেকানো অবশ্যই সম্ভব হবে।

আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি, ১৯৮৪–৮৫ সালে ভূমি মন্ত্রী হিসাবে আমি বাংলাদেশের খাদ্য দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ও জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করি "ভূমির অপচয় বন্ধ না করলে, ভূমির সর্বাত্মক, সর্বোত্তম, সদ্ব্যবহার" না করলে দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতি মিটানো সম্ভব হবে না; মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করা যাবে না; দারিদ্র বিমোচনের কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা যাবে না।

সে সময়ই আমি বার বার সংশ্লিষ্ট মহলে, প্রাসঙ্গিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানে জোর দিয়ে বলেছিলাম পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কোন একটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় মানুষের মৌলিক সম্পদ "ভূমি" বিবেচনায়ই আসেনি। এই সব পাঁচসালা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে কৃষিখাতের উৎপাদন এবং প্রচলিত ও সম্প্রসারিত ভূমি রাজস্বের উপর ভিত্তি করে। কৃষিখাত ছাড়াও যে ভূমি বহুবিধ অর্থকরী উৎপাদনের উৎস এবং ভূমির সদ্ব্যবহার যে হচ্ছে না, বরং অমার্জনীয় অপচয় হচ্ছে, সেই

www.pathagar.com

উপলব্ধিটুকুও ঐ সব পরিকল্পনায় খুঁজে পাইনি। "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করে যে বিপুলভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব এবং এটাই যে প্রধানতম পথ, যে পথে দেশের সার্বিক দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের উজ্জ্বল সম্ভবনা বিরাজ করছে, এই চিন্তাধারাই কোন একটি পরিকল্পনায় খুজে পাইনি। তাই, ভূমির গুণগত-মানগত উন্নয়ন, ভূমির সদ্ব্যবহার, এমন কি ভূমির অপচয়রোধও কোন পরিকল্পনায় স্থান পায়নি।

১৭/৬/৮৪ তারিখে তেজগাঁয়ে সাবেক জাতীয় সংসদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের আনুষ্ঠানিক অধিবেশন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য, সকল সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, বিভাগীয় প্রধানগণ, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ সকল কর্মকর্তাসহ প্রায় ৪০০ পদস্থ ব্যক্তি। সেই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জাতীয় অর্থনীতির উপর তাদের সুচিন্তিত ছাপানো প্রতিবেদন পাঠ করে শোনান। প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে পঠিত প্রতিবেদন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের যে কতগুলো কারণ চিহ্নিত করেন, তার মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অর্থাৎ তারা বলেন যে, প্রকল্পের জন্য দাবীকৃত ভূমি তড়িৎ গতিতে অধিগ্রহণ করে দিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়ে যেতো। এই অভিযোগটি আমি গ্রহণ করে নিতে পারলাম না। রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে আমি বললাম, উল্লেখিত প্রতিবেদনে এমন একটি অভিযোগ সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা সঠিকতো নয়ই বরং বিভ্রান্তিকর। এটা অনস্বীকার্য, যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমির আবশ্যকতা আছে। সে ভূমির মালিক হলো গরীব কৃষকবর্গ। ভূমি অধিগ্রহণের দাবী করা হয়, সেচের বাঁধ নির্মাণের জন্য, খাল কাটার জন্য, নতুন রাস্তা করার জন্য, পুল নির্মাণের জন্য, শিল্প স্থাপনের জন্য, আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য। এই সব অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য আবশ্যকীয় ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করেন প্রকল্প প্রস্তুতকারী প্রকৌশলী বা বিশেষজ্ঞগণ ; আর স্থান নির্ধারণ করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়ীত্বে নিয়োজিত পদস্থ কর্মকর্তাগণ। উচ্চ পর্যায়ে অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে অনুরোধ যায়, নির্বাচিত ভূমি অধিগ্রহণের করে দেয়ার জন্য। ডেপুটি কমিশনার ন্যূনতম কতটুকু ভূমির দরকার সেটা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ ভূমি অধিগ্রহণের দাবী এসেছে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর। তিনি কেবল ভূমির অবস্থান, মালিকানা, দখলদার এবং বর্তমানে সেই ভূমি কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বর্ণনা সহ চিত্র এঁকে পাঠিয়ে দেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে। সেখানে ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মাসিক সভায় অধিগ্রহনের বিষয়টি আলোচিত হয়। কোন বিভাগ থেকে আপত্তি না উঠলে প্রথম সভাতেই অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করে দেয়া হয়। ভূমির মূল্য নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডেপুটি কমিশনারের নামে নির্দিষ্ট খাতে মূল্য জমা দেয়া, ডেপুটি কশিনার কর্তৃক ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে তাদের উচ্ছেদ করে দেয়া এবং

www.pathagar.com

তারপর অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে ভূমি হস্তান্তর করে দেয়া এই সবই ডেপুটি কমিশনারের দায়ীত্ব।

আমি বললাম, এই হুকুম দখল বিষয়টি আমি গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। এর করুণ কাহিনী আমাকে বিচলিত করেছে। আমি যা পেয়েছি তা এই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপিত বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। তবু যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ করতে অযথা বিলম্ব হয়ে থাকে, তা হলে এরূপ দু'চারটি দৃষ্টান্ত আমাদের জানিয়ে দিলে অযথা বিলম্বকারীদের প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আমি এই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে বলতে চাই, আমার কাছে শত শত উদাহরণ আছে, যা প্রমাণ করবে ভূমি অধিগ্রহণ ও জবর দখল আইনের অপব্যবহার করে হাজার হাজার গরীব চাষীকে চিরদিনের জন্য ভূমিহীন করা হচ্ছে। অথচ অধিগ্রহণ ও জবর দখল করা ভূমি, হয় পুরোপুরি, না হয় আংশিক, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে; না হয় অবৈধভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনের দু'একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৯৪৫ সালে নোয়াখালী জেলা শহর নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় চৌমুহনীতে নূতন জেলা শহর স্থাপিত হবে। সাথে সাথে প্রায় ৮০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে দেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় চাষাবাদ। তৎকালীন গণপূর্ত বিভাগ এই বিশাল ভূ-খন্ডের মালিক হয়ে যান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে চৌমুহনীর পরিবর্তে মাইজদিতে নূতন জেলা সদর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আবার প্রায় সমপরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ ও জবর দখল করা হয় মাইজদিতে। আবার ভূমির শত শত মালিক পরিবারকে উচ্ছেদ করে দিয়ে শুরু হয়ে যায় কাজ। অচিরেই মাইজদিতে গড়ে উঠে নোয়াখালী জেলা সদর। কিন্তু জেলা সদর স্থাপনের জন্য চৌমুহনীতে অধিগ্রহণকৃত সেই বিশাল ভূমি অপব্যবহৃত হতে থাকে, কিছু সংখ্যক আমলার যোগ সাজসে ও স্বার্থে। ৪০ বৎসর পরও সেই ভূমি সাবেক মালিকগণ ফিরে পাননি। এই সবে মাত্র ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সাবেক মালিকের প্রায় সবই নিখোঁজ। অধিকাংশই মৃত। তাদের বংশধরেরা কে কোথায় আছে নির্ধারণ করাই কঠিন। অন্য দিকে অধিকাংশ ভূমি অবৈধ দখলে চলে গেছে। ঘর বাড়ী নির্মাণ করে সুদীর্ঘ দিন থেকে লোকজন সেখানে বাস করছে। ৪০ বছর পর এই অধিগ্রহণ করা ভূমি ফেরত দেয়ার আদেশ জারী করা হয়েছে সত্য, কিন্তু এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব হবে না। এই যে শত শত পরিবারকে চিরতরে উচ্ছেদ করে দেয়া হলো এবং এত বড় একটা এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলো তার ক্ষতি পূরণ দেবে কে?

প্রায় তিন দশক পূর্বে সদর্পে ঘোষিত হলো চট্টগ্রাম স্টীল মিল স্থাপিত হবে পতেঙ্গার সাগর সৈকতে। একটি স্টীল মিলের জন্য যা ভূমি দরকার তার ৪/৫ গুণ বেশী ভূমি অধিগ্রহণ করে গ্রামবাসিদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো। বার্ষিক কোটি কোটি টাকা ক্ষতি দিয়ে স্টীল মিলটি কোন মতে এখনো চালু আছে। কিন্তু বাড়তি যে বিরাট ভূমিটুকু

www.pathagar.com

গরীব চাষীদের বিতাড়িত করে বিপুল ব্যয়ে ঘেরাও করে রেখে দেওয়া হয়েছে এটা কত বড় অপচয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যে বিশাল এলাকা অধিগ্রহণ করে জবর দখল করা হয়েছে, তার এক চতুর্থাংশও কি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষদ থেকে অন্য অনুষদের দূরত্ব এতবেশী যে হেটে কূল কিনারা করা যায় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও মটরগাড়ী ব্যবহার করতে হয়। ভূমি ক্ষুধার্ত বাংলাদেশের জন্য এটা কি লজ্জার বিষয় নয়?

জরুরী প্রকল্পের নামে রাতারাতি ভূমি ইমার্জেন্সী রিকুইজিশন করে মালিকদের তাড়িয়ে দিয়ে ইমারত নির্মিত হয়ে গেছে, আর ১০/২০ বছর পর্যন্ত ভূমির মূল্য পরিশোধ হয়নি এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ আমার হাতে আছে। একটা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার কি এরূপ জুলুম সহ্য করতে পারে?

রিকুইজিশন আইনের সম্পূর্ণ অপব্যবহার করে ৩০/৪০ বছর ধরে গরীব নাগরিকের ঘর বাড়ী সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই রূপ অসংখ্য উদাহরণও আছে। এই জুলুম বন্ধ করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় দুইটি সহজ সরল নির্দেশ দিয়েছে। (১) যে কোন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তারা ন্যূনতম ভূমি দাবী করেছেন। (২) ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা না দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না এবং ভূমির দখল দেয়া হবে না।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সেই সভায় আমি প্রকাশ করলাম যে প্রত্যেক মন্ত্রী মহোদয়কে এই মর্মে আমি একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখছি, যে এই পর্যন্ত অধিগ্রহণ করা, যে ভূমি অধিগ্রহণের মূল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি তা আইনানুগভাবে জমির মূল মালিককে ফেরৎ দেবার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হউক।

প্রায় ১৫ মিনিটের এই বক্তব্য উচ্চ পদস্থ সকল ব্যক্তিকে অভিভূত করেছিল বলে আমার মনে হলো। আমি আসন গ্রহণ করার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঘোষণা দিলেন ভূমি অধিগ্রহণে অতীতে যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি হতে দেয়া যাবে না।

দুইদিন পর তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমার কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্র আসলো। পত্রটি লিখেছেন ঐ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব সামসুল হক। পত্রে তিনি বলেছেন সাভার উপজেলায় অবস্থিত রেডিও বাংলাদেশের একটি প্রকল্পে প্রায় ৪০ একর ভূমি অব্যবহৃত পড়ে আছে। এটা ফেরৎ দেয়ার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত শীঘ্রই পাঠানো হবে। এইখান থেকেই শুরু হয় অধিগ্রহণ করা অব্যবহৃত ভূমি ফেরৎ দেয়ার প্রক্রিয়া। প্রথম কিছুদিন এই প্রক্রিয়া বেশ দ্রুত বেগেই চলেছিলো। এখন এর গতি এতোই মন্থর হয়ে গেছে যে এই গতিতে আগামী একশো বছরেও এই প্রক্রিয়া শেষ হবে না।

ভূমি ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, ভূমির অপচয় রোধ, "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার", ভূমিহীন ও গৃহহীন কোটি কোটি মানুষের সমস্যাবলীর প্রতি সকল

www.pathagar.com

মহলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেই। ১৯৮৫ সালের ৮ জানুয়ারী তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এই আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনা সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ছাড়াও অর্থ, খাদ্য, কৃষি, সেচ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেই আন্ত মন্ত্রণালয় সভায় আলোচনার অবতারণা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভূমি ক্ষুধার্ত বাংলাদেশে ভূমির অপচয় দেখে আমি বিচলিত হয়েছি। ভূমি হলো আসল প্রাকৃতিক সম্পদ, যার উপর ভিত্তি করে মানুষ এ পৃথিবীতে আজীবন কাল তার ভাগ্য উন্নয়নে লিপ্ত আছে। যে সব দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ভূমির প্রাচুর্য আছে, যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, সে সব দেশেও ভূমির যথেচ্ছ অপচয় দেখিনি, দেখেছি ভূমির পরিকল্পিত সদ্ব্যবহার। আর আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশ, যা এক বিশাল জনসংখ্যার বোঝা বহন করতেই হিমশিম খাচ্ছে, এই দরিদ্রতম দেশে ভূমির যথেচ্ছ অপচয় চলছে তো চলছেই। এর প্রতিকারের কোন প্রচেষ্টা আমি দেখতে পাইনি।

বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), দুই সালা পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০), দ্বিতীয় পাঁচসালা-পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) পরীক্ষা করে ভূমি অপচয় রোধের, ভূমির সদ্ব্যবহারের কোন চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনা খুজে পাইনি। আমি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ নই, পরিকল্পনাবিদও নই; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে এবং দেশ বিদেশের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি, একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হতে হবে সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, আর যে কোন দেশেরই প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে ভূমি। আমি অবাক হয়েছি যে বাংলাদেশের কোন একটি পরিকল্পনাও দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ, অর্থাৎ "ভূমি সম্পদ" এর উপর ভিত্তিশীল নয়। কোন একটি পরিকল্পনাও ভূমির যথেচ্ছ অপচয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেনি, "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" কোন সুপারিশই করেনি।

আমার মতে বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী-সর্বনাশী সমস্যা হলো দারিদ্র। আর সেই দারিদ্র বিতাড়ণের কোন পরিকল্পনাই বাস্তব ধর্মী হতে পারেনা, যদি সেই পরিকল্পনা "ভূমির সর্বাত্মক, সর্বোত্তম, সদ্ব্যবহারের" উপর ভিত্তিশীল না হয়। আমি বিশ্বাস করি "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করতে পারলে দেশে বিরাজমান দারিদ্র-বেকারত্ব বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভব হবে। আর অবিশ্বাস্য মনে হলেও মাত্র দু'তিন বছরেই এই লক্ষ্য অর্জন অবশ্যই সম্ভব।

সরকারী পর্যায়ে ভূমি অপচয়ের যে সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি সেই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আমি পেশ করেছিলাম, তার মধ্যে ৬টি পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত বিমান বন্দর, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপরিমিত অনাবশ্যকীয় ভূমি অধিগ্রহণ, বনবিভাগের ও পানি উন্নয়ন

www.pathagar.com

বোর্ডের আওতাধীন অব্যবহৃত ভূমি ইত্যাদির উল্লেখ ছিলো। আমার প্রাথমিক বক্তব্যের উপর সুদীর্ঘ ইতিবাচক ও বস্তুনিষ্ঠ যে আলোচনা হয়, তার এক পর্যায়ে অর্থ সচিব মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, তিনি এক সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন; কেবল পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন যে বিশাল ভূমি অপচয় হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই তিনি মনে করেন, ভূমির সদ্ব্যবহার করতে পারলে খাদ্য উৎপাদন, তথা দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে।

সেই সভায় ভূমিহীন সমস্যার পাশাপাশি অনাবাদী ভূমি, এবং বিশেষ করে খাস ভূমির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, যেহেতু প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে পৃথকভাবে ভূমির মালিক করার মতো এতো ভূমি নেই, তাই ভূমিহীন সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণার আবশ্যকতা আছে। আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, ভূমিহীনদের সমবায় ভিত্তিক খামারের অংশিদারিত্ব দিয়ে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত করার সম্ভবনা বিবেচনা করা উচিৎ। আর নিবীড় গুচ্ছ গ্রামে অতি অল্প ভূমিতে ভূমিহীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

সেই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের ২০/২৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে একজনও আমার বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন নি, বরং একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। আমি আনন্দিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, ভূমি অপচয় রোধের প্রক্রিয়া অতঃপর চালু হবে এবং "ভূমির সর্বাত্বক সর্বোত্তম সদব্যবহারের" প্রক্রিয়া শুরু হবে। পরদিন (১৯৮৫ সালের ৯ জানুয়ারী) দেশের সকল দৈনিক পত্রিকায় এই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো। কয়েকটি পত্রিকায় সমর্থন সূচক সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিলো।

আজ প্রায় ৪ বছর পর বলতে বাধ্য হচ্ছি যে উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং খাস জমি বিতরণের যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, তাতে ভূমিহীনের শতকরা ১৫/২০ ভাগ পরিবারের পুর্নবাসন করতে না করতে খাস ভূমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাকী শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ ভূমিহীন পরিবার আর কোন দিনই ভূমির মালিক হওয়ার আশা পোষণ করতে পারবেনা। তাই তারা এক নৈরাশ্যের মহাসাগরে নিমজ্জিত হবে।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমি যতোই চিন্তা করি ততোই দেখি যে উন্নয়নমূলক যে সব প্রশংসনীয় কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেমন দেশ ব্যাপী বিদ্যুৎতের সম্প্রসারণ, বিরাট বিরাট সেতু নির্মাণ, নতুন রাস্তা নির্মাণ, নতুন শিল্প স্থাপন, দেশের রাজধানীর শ্রী বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদির সুফল সীমিত থাকছে দেশের ১৫/২০ ভাগ বিত্তশালী লোকের মধ্যে। এই সবের সুফল পৌছেনা দেশের শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ লোকের কাছে, যে সব লোক দারিদ্রের নিম্নতম পরিসীমারও নীচে অবস্থান করছে। আমার জানা মতে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এমন কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি যার সুফল সরাসরি দারিদ্র প্রপীড়িত ৮০/৮৫ ভাগ লোকের হাতে পৌছতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, কেবল

www.pathagar.com

উন্নয়নের অবকাঠামো সৃষ্টি করে, কেবল বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দারিদ্র বিমোচন আদৌ সম্ভব হবেনা। এতে ধনী আরো বেশী ধনী হবে, দরিদ্র আরো বেশী দরিদ্র হবে। বাস্তবে এটাই হচ্ছে।

দেশের অন্তিম দারিদ্র ও প্রকট বেকারত্ব বিমোচনে "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" একমাত্র প্রক্রিয়া যা অতি অল্প সময়ে অত্যাশ্চর্য সুফল দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় দেশের বেকার নরনারীর নিজ নিজ বসত বাড়ীতেই কর্ম সংস্থান সম্ভব হবে, আর সেই সাথে ক্ষুধার্ত মানুষের শহর মুখি মিছিল বন্ধ হবে। খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অনাহারী-অর্ধাহারী মানুষের আহার উপার্জন সম্ভব হবে। ভূমিহীন মানুষকে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। এ তাদের নাগরিকত্বের ভীত সৃষ্টি করবে, যা এখন নেই। এমন কি প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সাথে দরিদ্রতম মানুষের মনেও আশার সঞ্চার হবে। তারা নিজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কর্মমুখী হবে। অনাহার-অর্ধাহার থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি শুরু হবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় সুষম খাদ্য খেয়ে তাদের অপুষ্টিগত মানসিক জড়তা হ্রাস পেতে শুরু হবে। তারা তখন একটু উচ্চ আশা, উচ্চ আকাংখা পোষণ করতে শুরু করবে। বিত্তশালী প্রতিবেশীর মতো তারাও তখন ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানে আগ্রহী হবে। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে তখন ক্ষুধা নিবারণ শুরু হবে।

কিন্তু উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জিত হলেও তো দেশের সকল মানুষের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান প্রক্রিয়া চালু হলো না। সর্বশ্রেণীর মানুষের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান প্রক্রিয়া চালু না হওয়া পর্যন্ত হতাশা নৈরাশ্যে নিমজ্জিত জাতির আশার সঞ্চার হবেনা; হবে তখনই যখন সার্বিকভাবে সকল মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চালু হবে।

পূর্বেই বলেছি, বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটির জনগোষ্টির সমস্যাবলী কখনো চিহ্নিতই হয়নি। সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সমাধানের রূপরেখা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমরা এখন দেশের সমকালীন অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করবো।

www.pathagar.com

২ঃ বাংলাদেশ–১৯৮৯

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক উপলব্ধির জন্য বাংলাদেশের সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করা আবশ্যক; কেননা বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এত দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যে, একমাস পূর্বে যা কল্পনাও করা যায়নি আজ সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে, এবং সমাজ এটাকে আপাতত গ্রহণ করেও নিচ্ছে। আবার আজ যেটা অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়, দুদিন পর আকস্মিক ভাবে সেটাই হয়তো ঘটে যাবে, আর কিছুদিন হা–হুতাশ করার পর সমাজ সেটাকেও গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হবে। তাই দেশের সমকালীন সার্বিক অবস্থার একটা চিত্র এখানে লিপিবদ্ধ না করলে এই পুস্তক যখন আত্মপ্রকাশ করবে, তখন ভিন্নতর পরিস্থিতিতে পাঠকবর্গ হয়তো সমস্যাবলীর প্রস্তাবিত সমাধানকে অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করবেন। সেই জন্যই ১৯৮৯ সালের শেষ প্রান্তে, যখন এই পুস্তকের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে, তখনকার সার্বিক পরিস্থিতির একটা বস্তুনিষ্ঠ, ভাবাবেগ–বর্জিত চিত্র তোলে ধরা অপরিহার্য। এই চিত্রটি পাঠকগণের মনে যাতে আতংকের সৃষ্টি না করে, যাতে সমাজে বিরাজিত সন্দেহ–অবিশ্বাস–হতাশাকে আরো ঘনীভূত না করে তোলে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোন বক্তব্যই যাতে অতিরঞ্জিত না হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করি।

www.pathagar.com

২.১ঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

'বাংলাদেশ ১৯৮৯' অধ্যায়ে দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে চাইনা। এর অর্থ এই নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। এর আসল অর্থ হলো দেশের কলুষিত-লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে এখন আর মন চায় না। প্রায় তিন বছর হয়ে গেলো, প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে আমি দলীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করেছি। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে আবার জড়িত হওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা নেই।

প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত অর্থে আমি কোন দিনই দলীয় রাজনৈতিক কোন্দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার প্রথম সম্পৃক্তি ঘটে ১৯৭৬ সালে; তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধানের বিশেষ সহকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তারের উদ্যোগে এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে তার সাথে এক রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে। সেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, দেশে নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সমাজে বিরাজমান অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি নিবারণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখবেন। সেই প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করে আমি জাগদলের ১৪ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সারিতে যোগ দেই। তিনটি বছর কঠোর পরিশ্রম করে আমরা যখন জাগদলকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করে ফেলেছি, তখনই জিয়াউর রহমান জাগদল ভেঙ্গে দিয়ে বামপন্থি ডানপন্থি মধ্যপন্থিদের নিয়ে নূতন দল করার পায়তারা শুরু করেন। জাগদলের ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি একবাক্যে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচারণ করেন। জিয়াউর রহমান যখন এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে বি, এন, পি গঠন করেন, তখনই আমি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তার রাজনীতি বর্জন করি। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে বি, এন, পি প্রার্থীর তিনগুণ বেশী ভোটে নির্বাচিত হই। ১৯৮০ সালের প্রারম্ভে জিয়াউর রহমান প্রণীত "উপদ্রুত এলাকা বিল" নামক একটি জঘন্য স্বৈরাচারী আইন ঠেকাবার উদ্দেশ্যে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাতীয় সংসদের সকল বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জাসদ, জামাতে ইসলামী, ন্যাপ, জাতীয় দল, একতা পার্টি এবং নির্দলীয় সদস্যবর্গ) সর্বপ্রথম একতাবদ্ধ হয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন চালিয়ে সেই স্বৈরাচারী বিল প্রত্যাখ্যান করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলাম।

১৯৮৩ সালে জেনারেল এরশাদের আহবানে দ্বিতীয়বার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে জনদল নামক নূতন রাজনৈতিক দলের ২২ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সারিতে আমি যোগ দেই। তারপর জনদলের ১১ জন ভাইস চেয়ারম্যান এর মধ্যেও আমি স্থান পেয়ে যাই। আবার কঠোর পরিশ্রম করে নতুন দলটিকে জনসমর্থনের দিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকি। এরূপ সময় ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় গিয়ে দেখি জনদলের ১১জন ভাইস চেয়ারম্যান ও মহাসচিব ছাড়াও

www.pathagar.com

১ ডজন জেনারেল সেই সভায় উপস্থিত। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য জনদলকে শক্তিশালী করা। কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব হলো জনগণের নেতৃবর্গকে মন্ত্রীসভার আওতাভুক্ত করে নিলে দলগঠন সহজ হয়ে উঠবে। আমি প্রস্তাবের বিরোধীতা করলাম। সুদীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে আমি যুক্তি দিলাম, ক্ষমতাসীন লোক রাজনৈতিক দল গঠন করতে গেলেই নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের চেয়ে স্বার্থপর ব্যক্তিরা প্রাধান্য পেয়ে যাবে। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম দলগঠন প্রক্রিয়া ক্ষমতার বাইরে থেকে সম্পন্ন করার পর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে তারপর নির্বাচিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করাই হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আমি আরো বলেছিলাম, অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আমার এই মতামতের উপর বিশেষ কোন আলোচনা হলো না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদ বললেন, বিশেষ কারণে দুই একদিনের মধ্যেই তাকে অন্ততঃ ৪/৫ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মন্ত্রী সভার অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে ঘোষণা হয়ে গেলো প্রেসিডেন্ট জনদলের ৪ জন নেতাকে কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজনকে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চার জন পূর্ণ মন্ত্রীর মধ্যে আমি একজন।

এই প্রেক্ষিতেই অনিচ্ছা সত্বেও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলাম এবং ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য আমরা একমত হয়ে মন্ত্রীসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেই এবং ক্ষমতার বাইরে থেকে জনদলকে সুসংগঠিত করতে মনোনিবেশ করি। জনদল যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছে, ঠিক সেই সময় রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার পূর্বসুরীরই অনুকরণে ডান বাম মিলিয়ে নুতন রাজনৈতিক দল গঠনের কথাবার্তা শুরু করেন। জনদলের কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ এই সর্বসম্মত অভিমতকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু সপ্তাহ না যেতে যেতেই, ১৭ আগষ্ট '৮৫ তারিখ সকালে, সংবাদপত্রে দেখি বিভিন্ন মতাদর্শী দল মিলিয়ে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়ে গেছে, আর জনদল নাকি সেই ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। জনদলের মহাসচিব মিজানুর রহমান চৌধুরী কিছুই জানেননা, সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও দলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খানও কিছুই জানেন না। এই প্রেক্ষিতে আমি সেই দিনই জনদল থেকে পদত্যাগ ঘোষণা করলাম। পরদিন, অর্থাৎ ১৮ আগষ্ট ৮৫ তারিখে, দেশের প্রত্যেকটি দৈনিক সংবাদপত্রে ফলাও করে আমার পদত্যাগের কারণসহ সংবাদ প্রকাশিত হলো।

তার কয়েকদিন পর সংবাদপত্রে দেখলাম জনদল বিলুপ্ত করা হয়েছে, আর ডান বাম সব মিলিয়ে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই এক বিদ্রোহী দল ঘোষণা করলো, জনদল আছে ও থাকবে। তারা ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডেকে আমার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ সম্বলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জনদলের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণে রাজী করিয়ে নিলো। কয়েক মাস জাতীয় পার্টির বিরোধীতা করার পর ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে দেখতে পেলাম আমাকে বিদ্রোহী জনদলের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে বসিয়ে তারাই চুপে চুপে একের পর এক সরকারের সাথে লাইন লাগাচ্ছেন। তাই জনদল থেকে দ্বিতীয় বার ইস্তেফা দিয়ে, শেষ বারের মত দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করলাম। আর সাথে সাথে জনদল প্রথমে খন্ড বিখন্ড এবং পরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস টানার কারণ হলো, পাঠকবর্গকে এইটুকু বোঝানো যে আমি এখন সম্পূর্ণরূপে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। দেশের সার্বিক দুরাবস্থা নিয়ে অন্য অনেকের মত আমিও চিন্তিত, শংকিত। দেশটাকে বাঁচাবার একটি শেষ প্রচেষ্টা আমি এখন চালাচ্ছি, সম্পূর্ণ নির্দলীয় নিরপেক্ষ দেশ-প্রেমিক হিসাবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে দেশে এখন বেশ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। সরকার এখন নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করছেন, বিরোধী দলের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে, প্রধান বিরোধী দলগুলো যেন ক্লান্ত। তারা এখন আর রাজপথে নামছেননা।

কিন্তু এটাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আসল চিত্র নয়। আসল চিত্র হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়েই মতানৈক্য। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিলেন, তাদের এক বৃহৎ অংশ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেননি; অর্থাৎ এখনো দেশের সার্বভৌমত্বই বিতর্কিত। দেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান এখনো একটি বিতর্কিত দলিল। জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক ১৯৭২ সনে রচিত সংবিধান সংশোধনীর পর সংশোধনীর মাধ্যমে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে সেই সংবিধানের মৌলিকত্বই এখন বিকৃত হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো, ভ্রান্ত রাজনীতির কারণে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো, সে উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়নি, ভ্রান্ত রাজনীতির কারণে।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, এই দুটি দেশেই গণতন্ত্র বিকাশ লাভের সুযোগ পায়নি। উভয় দেশেই কিছুদিন পর পর সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে জনগণের আশা আকাংখা পরিস্ফুট হয়ে উঠেনি। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল মির্যা আসলাম বেগের সাম্প্রতিক উক্তি প্রণিধানযোগ্য। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল বেগ বলেছেনঃ-

> "আমার পূর্বসূরী জেনারেল মোহাম্মদ জিয়াউল হক ১৯৭৭ সনে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন, সেটা ছিল ভুল। জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর দেশের রাজনীতি থেকে সশস্ত্র বাহিনীকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত কেবল আমার নিজের নয়, বরং সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিফলন। পাকিস্তানের ৪২ বছরের ইতিহাসে অর্ধেকেরও বেশি সময় সশস্ত্র বাহিনী দেশটি শাসন করেছে। কিন্তু সামরিক শাসন কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। সেনাবাহিনী এটি অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে। আর কখনোই ১৯৭৭এর পুনরাবৃত্তি হবে না।"

রাষ্ট্র পরিচালনা একটি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। আজকের দিনে রাষ্ট্র পরিচালনা কেবল মানুষকে শাসন করাই নয়, আজকের রাষ্ট্র পরিচালনা একটি জাতির আশা-আকাংখা রূপায়নে জনসমর্থিত পন্থায় আইনের শাসনের মাধ্যমে অগ্রগামী পদক্ষেপ নেয়া; বিশ্বের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে জাতিকে বিশ্ব সমাজে তার ঈপ্সিত আসন পাবার

www.pathagar.com

যোগ্য করে গড়ে তোলে নেয়া। এই অতি জটিল দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হলো রাজনীতি। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক, সেটা অর্জন করতে হয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। সুদীর্ঘকাল মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে দেশের গণমানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে, তাদের আনন্দ-বেদনা, তাদের আশা-আকাংখা, তাদের নাড়ী-ভুড়ির স্পন্দন পর্যন্ত বুঝে নিতে হয় রাজনীতিবিদগণের। রাজনৈতিক নেতৃত্ব আরো বেশি কন্টকাকীর্ণ, আরো বেশি সময় সাপেক্ষ। একজন রাজনীতিবিদকে দেশের জনগণের আশা-আকাংখা বুঝতে হবে। কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সেটাও যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক নেতা হবেন এমন ব্যক্তি যিনি রাজনীতিতে পরিক্ষীত, যার রাজনৈতিক মতাদর্শ জনগণ ভালরূপে জানেন, যার ব্যক্তিগত চরিত্র, এমনকি পারিবারিক চরিত্র ও জনগণের অজানা নয়, এবং সব কিছু জেনে শুনেই জনগণ তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেছেন; তাকে নেতৃত্বে বরণ করেছেন।

তাই বিশ্বের সকল উন্নত দেশে, এমনকি স্থিতিশীল উন্নয়নমুখী দেশে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বর্তায় উচ্চশিক্ষিত প্রবীণ অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত ব্যক্তিদের উপর। এমনকি দেশের পার্লামেন্টের সদস্যগণও উপরোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী। আর দেশের মন্ত্রী সভার সদস্যবর্গ তো দেশের সেরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। জাপানের মন্ত্রীসভায় ৬০ বছরের কম বয়সের খুব কম লোকই স্থান পান। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ৫০ বছরের কম বয়সের মন্ত্রী বিরল। সেই জন্যই ঐ সব দেশের প্রশাসন, মন্ত্রীগণের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের নেতৃত্বে গণকল্যাণমুখী কাজ করে যায়। প্রশাসন পদে পদে ভুল করেনা; অন্যায় করেনা; জনগণকে হয়রানি করার চিন্তা করেনা, যা আমাদের দেশে অহরহ ঘটছে।

রাজনীতি শুদ্ধ পথে চলছে না ভ্রান্ত পথে যাচ্ছে, সে বিচার করার মালিক দেশের জনগণ। রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তির মূল্যায়ন করার মালিকও জনগণ। সেই জন্যই নির্বাচন হলো রাজনীতির কষ্টি পাথর; নির্বাচনের অর্থই হলো জনগণের রায়। সেই রায় যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ জনমতের প্রতিফলন না হয়, সেই রায় যদি দুর্নীতি লব্ধ হয়, বা ভয়-ভীতির ফসল হয়, তাহলে সেটাকে নির্বাচনই বলা যায়না। সেটা জনগণের রায়ই নয়।

বাংলাদেশে এখন অর্থবহ নির্বাচনের পরিবেশই নেই। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত, নির্বাচন সম্বন্ধে গণমনে যে বিতৃষ্ণা, যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেটা আমূল দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত লোক দেখানো নির্বাচন করে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হবেনা। বরং ক্ষতি হবে অপরিসীম।

এই অবাঞ্ছিত, অনাকাংখিত অবস্থার সৃষ্টি হলো কেন? এর কারণ বিশ্লেষণ করা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পন্ডিতবর্গের দায়িত্ব। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, এর কারণ হলো স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকে শুরু করে, স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত যারাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েছেন, তাদের সবাই রাষ্ট্রটিকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তুতি না নিয়ে ক্ষমতার আসনে বসে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ যেসব

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল বা নেতা এবং যেসব সামরিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন, তাদের কেউই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোন সুবিন্যস্ত জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষমতায় বসেননি। তারা ক্ষতায় গিয়েছিলেন কতিপয় অস্পষ্ট, চিত্তাকর্ষক, চমকপ্রদ স্লোগানের ভিত্তিতে, অথবা মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের পরিসমাপ্তি ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে যে সব স্লোগান ছিলো, তার মূলমন্ত্র ছিলো এক জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে তাদের একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি হিসাবে গড়ে তোলা। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সুদীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো, ঐসব মর্মস্পর্শী, চমকপ্রদ স্লোগান বাস্তবায়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো না। চার দশক পার হয়ে গেছে, আজো খন্ডিত পাকিস্তানে সেরূপ কোন পরিকল্পনা রচিত হয়নি।

প্রকৃত পক্ষে, স্বাধীন পাকিস্তানে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দলই মর্মস্পর্শী, চিত্তাকর্ষক, চমকপ্রদ স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে, অনুপ্রাণিত করতে কমবেশী সাফল্য লাভ করেছেন। তাদের সেসব স্লোগানকে নির্বাচনের মেনিফেষ্টো হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে কোন্ পথে, কোন্ পদ্ধতিতে তাদের মেনিফেষ্টো বাস্তবায়ন করবেন তার কোন বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা, রূপরেখা বা নীল-নকশা দেননি বা দিতে পারেননি। আর সামরিক বাহিনী, যারা পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে পর পর ক্ষমতা দখল করে অধিকাংশ সময়ই দেশ শাসন করেছেন, তাদের তো এরূপ কোন পরিকল্পনা বা রূপরেখা দেবার প্রশ্নই উঠেনা। তারা ক্ষমতা দখলের সময় একই যুক্তি দিয়েছেন, দেশটা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, স্বল্পতম সময়ে দেশটাকে পথে ফিরিয়ে এনে দিয়েই তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। পাকিস্তানের জিয়াউল হক তো সময় সীমা বেধেই দিয়েছিলেন মাত্র ৯০ দিন। কিন্তু ৯ বছর পরও তার প্রতিশ্রুত ৯০ দিন শেষ হয়নি।

যা বলছিলাম, সামরিক বাহিনীতো রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুব্যবস্থা, সুষ্ঠু-সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন না, আসার কথাও নয়। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার মত জটিল কাজের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তাদের নেই; থাকার কথাও নয়। সুসংহত রাজনৈতিক দল বা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছাড়া আর কারোই তো রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নেই। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প নেই।

যুক্তির জন্য বলছি, দেশের বিচারকগণ, যাদের উপর মানুষের আস্থা থাকাই স্বাভাবিক, তাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে দিলে কেমন হবে? রাষ্ট্র চলবে না, চলতে পারেনা; কারণ সামরিক বাহিনীরই মতো তাদেরও রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেই, অভিজ্ঞতা নেই। তাই বিচারপতিগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়ীত্ব গ্রহণের চিন্তাই করেননা। তবে অস্থায়ী ভাবে সাংবিধানিক শুন্যতা দেখা দিলে স্বল্প সময়ের জন্য সেই শূন্যতা পূরণে বিচারপতিগণ পিছপাও হন না। এটা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়ীত্ব গ্রহণ নয়।

চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, সুসংহত রাজনৈতিক দল এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, যাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ আছে, অভিজ্ঞতা আছে, তারাও তো ক্ষমতায় যাবার

www.pathagar.com

পূর্বে জাতিকে চিত্তাকর্ষক, গণকল্যাণমুখী স্লোগান ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার কোন বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা বা রূপরেখা দিতে পারেননি। আর ক্ষমতায় যাবার পর তারা পঞ্চবার্ষিকী দ্বিবার্ষিকী যেসব পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, সেসব পরিকল্পনা তো আমলাতন্ত্র কর্তৃক গতানুগতিক ভাবে প্রণীত।

দেশে আজ যে চরম হতাশা বিরাজ করছে, সর্বস্তরে যে অবিশ্বাস, অনাগ্রহ, কর্মবিমুখতা, এ সমস্তই দেশের ব্যর্থ ভ্রান্ত রাজনীতির ফসল। এই ভ্রান্ত রাজনীতির জন্য, এই ব্যর্থ রাজনীতির জন্য দায়ী কে? এরজন্য দায়ী সেইসব ব্যক্তি যারা পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে, প্রথম দ্বিতীয় কাতারের রাজনৈতিক নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন। এরজন্য আরো দায়ী সেই সব অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা কোন না কোন সময় এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্যই জাতি আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিশেহারা, হতাশাগ্রস্থ।

বাংলাদেশে আজ যে অন্যায়, অবিচার, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার প্রতিরোধ তো দূরের কথা, প্রতিবাদ করার মতো মনোবল বা আত্মবিশ্বাস জনগণের নেই। মানুষ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লাভ তো হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। আর অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তো ব্যর্থতার গ্লানিতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কোণঠাসা হয়ে বসে আছে।

একটা জাতির সর্বপ্রধান মৌলিক শক্তি হচ্ছে তার নাগরিকদের দেশপ্রেম। ১৯৭১ সালে যখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যায় লিপ্ত হয়, তখনই এ অঞ্চলের মানুষ দেশপ্রেমের এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সেই সময় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নেতৃত্বহীন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী। অন্যান্য যে সব নেতা পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর জন্য সংগ্রাম করে আসছিলেন, তারা সকলেই সেই মুহূর্তে আত্মগোপন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত।

অন্যদিকে যারা পশ্চিম পাকিস্তানের লেজুড় বৃত্তি করছিলেন, যারা হানাদার বাহিনীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিলেন, সেই সব স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তখন উঠে পড়ে লেগেছেন জনগণকে পাকিস্তান পন্থী বানাবার জন্য। অর্থাৎ সেই সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিপক্ষে বলার কেউ নেই, তাদের স্বপক্ষে দালালী করার বেশ কিছু নেতা তখন উঠে পড়ে লেগেছেন, এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস বিকৃত করতে, তাদের "সাচ্চা মুসলমান" বানাতে, তাদের গণহত্যার সমর্থনকারী বানাতে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি এদের মদদ যোগালো অঢেল অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, ঘাতক বাহিনীর সক্রিয় সাহায্য নিশ্চিত করে। ইতিমধ্যে পলাতক নেতৃবৃন্দ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে পাকিস্তানী দালালদের সহযোগিতায় হত্যাযজ্ঞ পুরাদমে চলছে, আর তারই পাশাপাশি চলছে ইসলামের নামে মানুষের বিবেক, মানুষের ঈমান বিকৃত করার প্রকাশ্য আন্দোলন।

www.pathagar.com

নয়টি মাস ধরে এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারা চলতে থাকে। এই নয়টি মাসের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে, কথা বলার মতো কোন নেতাই মাঠে ছিলেন না; আর থাকলেও পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে কথা বলা তখন অসম্ভব ছিলো। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে নগণ্য বিকৃতমনা দালাল ছাড়া এদেশের প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ বিবেকের দংশনে, স্বীয় প্রাণের আহবানে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলো। এটাই হলো দেশ প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। সুদীর্ঘ নয়টি মাসের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাঙালী বা বাংলাদেশী জাতি আত্মপ্রকাশ করলো।

কিন্তু এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জাতি দেশপ্রেমের যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো, ত্রিশলক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে, দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, অগণিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলো, মাত্র দুই দশক যেতে না যেতে সেই সুপরীক্ষিত বজ্র কঠিন দেশপ্রেম ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলো। আজ বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী বলে কয়জন লোক মনে প্রাণে গর্ব অনুভব করেন, আজ কয়জন লোক দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে ঝাপিয়ে পড়বেন? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজবার জন্য পাঠক বর্গকেই অনুরোধ করছি।

www.pathagar.com

২.২ ঃ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি

১৯৮৯ সালের শেষার্ধে বাংলাদেশের প্রধান আলোচ্য বিষয়টি হলো নিরাপত্তার অভাব। নৃশংস হত্যা, দুঃসাহসিক ছিনতাই, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনা সারাদেশের সর্বত্রই এতো ঘন ঘন সংঘটিত হচ্ছে যে মানুষ এখন জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা নিয়ে উদগ্রীব। সমকালীন ঘটনাবলীর সমালোচনা করলে দেখা যাবে এমন কোন দিন নেই যেদিন দেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরী ও শহরতলিতে দু'চারটি লোমহর্ষক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছেনা। শারমীন হত্যার লোমহর্ষক ঘটনা লোকে এখনো ভুলতে পারছেনা। সমাজের উচ্চ স্তরে শিক্ষিত পরিবারের এক ছেলে মুনির মাসের পর মাস জঘন্য পাপাচার নির্বিঘ্নে চালিয়ে গেলো, নববধূ শারমীনের আপত্তিতে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালালো; এই জঘন্য পাপাচার ধামাচাপা দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে চেষ্টা চলার সময়ই এক নারকীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিষ্পাপ বধূকে ধোকা দিয়ে চট্টগ্রাম নিয়ে গেলো, আর সেখান থেকে ফেরার পথে ঢাকার সন্নিকটে নৃশংস ভাবে স্ত্রীকে কুচি কুচি করে কেটে হত্যা করলো; এই নৃশংসতা ভুলে যাওয়া তো দূরের কথা, এটা নারী পুরুষ, এমনকি কিশোর কিশোরীদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কিছু দিন পর সংঘটিত অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা।

শিশু কন্যাকে অভিজাত এলাকায় অবস্থিত ভিকারুন্নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ফেরৎ নেবার জন্য রিকশা করে যাবার সময় স্কুলেরই সন্নিকটে ব্যস্ত রাস্তার উপর প্রকাশ্যে দু'টি তরুণ মোটর সাইকেল দিয়ে রিকসার গতি রোধ করলো, আর সম্মানিত মহিলার কাছে দাবী করলো, তার গায়ের অলংকার। উচ্চ শিক্ষিতা, সৎ সাহসী মহিলা সগিরা মোরশেদ অলংকার দিতে অস্বীকার করে রাস্তায় চলমান লোকের সাহায্যের জন্য চিৎকার করার সাথে সাথে গুড়ুম গুড়ুম করে দুটি পিস্তলের বুলেট তার বক্ষ বিদীর্ণ করলো। তরুণদ্বয় নির্বিঘ্নে মোটর সাইকেল চালিয়ে চলে গেলো, কেউ বাধা দিতে সাহস করলোনা, একটি গাড়ীও মোটর সাইকেলকে অনুসরণ করলো না। তবে সগিরা মোরশেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার স্পন্দনহীন লাশকে একটি বেবী টেক্সীতে করে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। সেখানে ঘোষণা করা হলো সগিরা মোরশেদ মৃত। অল্পক্ষণের মধ্যেই আতংক ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত সিদ্ধেশ্বরী, সার্কিট হাউস ও সন্নিকটস্থ মন্ত্রী পাড়ায়। ভিকারুন্নেসা স্কুলে কয়েক হাজার ছাত্রীদের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত।

নিম্নশ্রেণীর শিশু ছাত্রীদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ বাহিনী স্থানটি ঘেরাও করলেন, পদস্থ কর্মকর্তারা পরিদর্শনে আসলেন, স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও স্কুলে গিয়ে শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের অভয় প্রদান করলেন, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু সগিরা মোরশেদের অমূল্য প্রাণ তো আর ফিরে পাওয়া গেলনা। দুঃসাহসী ঘাতকেরাও ধরা পড়ল না। আতংক বিস্তার লাভ করলো সারা দেশের কচি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, তাদের অভিভাবকদের মধ্যে।

www.pathagar.com

এতোদিন শিশুদের নিরাপত্তার জন্য পিতা মাতারা স্বয়ং নির্ভয়ে যেতেন শিশুদের স্কুলে পৌঁছে দিতে ও ফেরৎ আনতে। এখন শিশুদের সাথে যাওয়া পিতা-মাতার জন্যই বিপজ্জনক। এতোবড় একটা আঘাত শিশু কিশোরদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে পাঠকবর্গই তা অনুমান করুন। এটাই কেবল একমাত্র বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্কুলে যাওয়া আসার পথে শিশু অপহরণ হয়েছে, শিশুর মাতা-পিতা ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন, এরকম ঘটনা এখন নিত্য নৈমিত্তিক। তাই কিছু লোক শিশু কিশোরীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে কি খুব অন্যায় করেছেন? অনেকেই কিশোরীদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে বাসায় প্রাইভেট টিউটর রেখে পড়াবার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু আর্থিক চাপ বহন করতে হিমসিম খাচ্ছেন।

এই তো সেদিন দিনে দুপুরে বিনা উসকানিতে মেঘনা টেক্সটাইল মিলের জেনারেল ম্যানেজার মাহমুদ হাসানকে প্রাণ দিতে হলো কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিকের ছুরির আঘাতে। তার অন্যায়, একটু কড়াকড়ি করে কয়েকটি মাসের মধ্যে তিনি এই মিলটিকে ক্রমাগত ক্ষতির হাত থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। কোন শ্রমিক বিক্ষোভ নয়; কোন প্রতিবাদ উত্তেজনা নয়; ঠান্ডা মাথায় ছুরিকাঘাতে তার জীবনাবসান ঘটানো হলো মিল গেইটে, নিরাপত্তা প্রহরীদের চোখের সামনে। এরপর যদি অন্যান্য মিলের কর্মকর্তারা তাদের মিলের ক্ষতি বন্ধ করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে সাহসী না হন, তাহলে তাদের দোষারোপ করার মানবিক যৌক্তিকতা কতটুকু থাকবে?

মুন্সিগঞ্জের গাওদিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিনের নৃশংস হত্যা কি কম হৃদয় বিদারক! তাকে ঢাকা থেকে ডেকে নেয়া হলো একটি সালিশী বিচারের নামে। স্থানীয় বাজারে পৌঁছা মাত্র তার উপর সশস্ত্র হামলা। নিমেষের মধ্যে তার কুচি কুচি করা লাশ নদীর পানির সাথে মিশে গেলো। ঘটনার প্রতিক্রিয়াও কম ভয়াবহ নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আক্রান্ত হলো দু'টি গ্রাম! দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাম দুটিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করলো! শত শত লোক হলো গৃহহীন, সর্বহারা! আর এ সবই ঘটলো সালিশী বিচারের উপলক্ষ্যে।

রাতের অন্ধকারে অপহরণের নয় দিন পর একই পরিবারের ছয়জন সদস্যের গলিত লাশ উদ্ধার করা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্নিকটস্থ একটি খালের গভীর জলে ডুবানো দুটি ড্রামের ভিতর থেকে। এই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দিয়ে আতংক বিস্তার করে কোন লাভ নেই।শিশু পুত্র কন্যাসহ একটি পুরো পরিবারকে পৈশাচিক ভাবে হত্যার পিছনে কারণটি হলো তাদের সম্পত্তি দখল। এরূপ সম্পত্তি দখলের অথবা অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তি হজম করার জন্য সারাদেশে হাজার হাজার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তার এক ক্ষুদ্রাংশ ও তো দেশের জনগণ জানতে পারছে না।

এই পৈশাচিক ঘটনার আর একটি মারাত্মক দিক হলো, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগ যে, গলিত লাশ উদ্ধারের নয়দিন পূর্বে বলপূর্বক অপহরণের ঘটনাটি নাকি সংশ্লিষ্ট থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কেবল তাই নয়, প্রায় এক বছর পূর্বে গৃহস্বামীকে বলপূর্বক অপহরণ করে গুম করে দেয়া হয়েছিল। সেই মামলা বিচারাধীন থাকাকালেই ঐ

www.pathagar.com

আসামীগণ বিরাজবালা নাম্নী বিধবা ও তার পুত্র কন্যাকে বলপূর্বক টেনে হেঁচড়ে নৌকায় তুলে সদর্পে বিলের মধ্যে নিয়ে যায়। আর সেখানে একের পর এক তাদের কুচি কুচি করে কেটে ড্রামে ভর্তি করে চুন মিশিয়ে ডুবিয়ে রাখে। বিরজাবালা হত্যাযজ্ঞ সারাদেশের মানুষের মনে এক অবিস্মরণীয় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে আর একটি আকর্ষনীয় খবর। এক সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদার্র ফজলু মিয়া তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে তেজগাঁও শুল্ক গুদামে তারা ১৫ বার ডাকাতি করেছে; কিন্তু ধরা পড়েনি। কারণ তাদের সহায়ক ছিলো ক্ষমতাশালী লোক। ফজলু মিয়াও তো সরকারী চাকুরে।

মাসিক ব্যাংকার পত্রিকার অক্টোবর ১৯৮৯ সংখ্যায় বিভিন্ন ব্যাংকে দুর্নীতি, জালিয়াতি ও আত্মসাতের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়ার পর অনেকেই হয়তো আর ব্যাংকের দিকে পা বাড়াবেন না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকের উপরে লোকের যে আস্থা ছিলো, ক্রমে ক্রমে সে আস্থাও হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির উপর এই অবস্থার অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে খুব বেশীদিন লাগবে না।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে কমপক্ষে তিনটি ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে। প্রথমটি যশোরের কেশবপুর উপজেলা সোনালী ব্যাংক ট্রেজারী শাখায়, দ্বিতীয়টি চুয়াডাঙ্গার ডামুরহুদা উপজেলার রূপালী ব্যাংক শাখায়, তৃতীয়টি বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ উপজেলার কৃষি ব্যাংক শাখায়। তিনটি ঘটনায়ই ডাকাতদের লক্ষ্য ছিলো ব্যাংক প্রহরীর আগ্নেয়াস্ত্র হস্তগত করা, এবং তিনটি ক্ষেত্রেই তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়। ব্যাংকে ডাকাতি করে স্ট্রং রুম ভেঙ্গে অর্থ নেয়ার ঝুকির চেয়ে ডাকাতরা আগ্নেয়াস্ত্র লুট করাই পছন্দ করেছে। এর রহস্য বুঝা মোটেই কঠিন নয়।

১ অক্টোবর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের কয়েকটি শিরোনামঃ "শান্তি বাহিনীর গুলিতে ৭ জন নিহত", "সিলেটে তিন তরুণের লাশ উদ্ধার", "একরাতে রাউজানে ৫ বাড়িতে ডাকাতি।" একই পত্রিকায় আরো সংবাদ আছে "পটুয়াখালীতে তিনটি বাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতি ও দুই লক্ষাধিক টাকা লুট", কুমিল্লায় তিনটি স্থানে তিনটি ডাকাতিতে দুইজন নিহত ও পৌণে তিন লক্ষ টাকা লুট", নরসিংদীতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ছয়টি ডাকাতি", "নওগায় একটি, হবিগঞ্জে একটি ও পার্বতীপুরে একটি দুধর্ষ ডাকাতি।"

৩০শে সেপ্টেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাকের ভিতরের পাতায় মামুলি ধরণের একটি শিরোনাম, "বিভিন্ন স্থানে ২৩টি খুনের ঘটনা।" খবরে বলা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪ ব্যক্তি খুন হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনাই নৃশংসতা, পৈশাচিকতা ও চরম নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। দেশে এখন নরহত্যা একটি মামুলি দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনার বশে প্রতিপক্ষকে কিলঘুষি মারা বিশ্বের সর্বত্রই কমবেশী ঘটে যায়। শত্রুতাবশতঃ, বিশেষ করে ভূমির দখল বা মালিকানা নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা আমাদের ভূমি ক্ষুধার্ত দেশে অজানা ছিলনা। কিন্তু এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে দুই একটা কিলঘুষি বা লাঠির আঘাতের চেয়ে হত্যার ঘটনাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকাশ্য দাঙ্গার পরিবর্তে গুপ্ত হত্যা প্রসার লাভ করছে। কারণ বোধগম্য। কিলঘুষি মেরে মামলা করার সুযোগ দিয়ে ঝামেলা

www.pathagar.com

ডেকে আনবো কেন? গুপ্ত হত্যা করে ফেললেতো আর সাক্ষী দেবার কেউ থাকবেনা। তাই ঝামেলাও নেই। এখন এই হয়ে গেছে মানুষের মনোবৃত্তি।

ঢাকার ভি আই পি রোডে জহুরা মার্কেটের সংলগ্ন স্থানে বস্তাবন্দী নিহত মহিলার লাশ নিয়ে কিন্তু খুব একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি, কারণ সে মহিলাতো অজ্ঞাত পরিচয়। এইরূপ অজ্ঞাত পরিচয় শত শত নরনারী দেশব্যাপী নিহত হচ্ছে, তার কোন পরিসংখ্যান তো নেই।

www.pathagar.com

২.৩ ঃ ঘটনা–দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা কথাটির অর্থ হলো আকস্মিক অশুভ ঘটনা বা বিপদ। যা সদা সর্বদাই ঘটছে তাকে দুর্ঘটনা বলা চলে না। তদুপরি স্রেফ গাফিলতির জন্য, অসর্তকতার জন্য, বিকল যানবাহন বেপরোয়া ভাবে চালাবার জন্য যে মারাত্মক ঘটনায় অসংখ্য লোক মর্মান্তিক ভাবে প্রাণ হারায় বা পঙ্গু হয়ে যায়, সে সব ঘটনাকে দুর্ঘটনা হিসাবে চালিয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা দেখিনা। রেলগাড়ী চলাকালে বিধিবদ্ধ সতর্কতা অবলম্বন না করার জন্য যে সব মারাত্মক ঘটনায় শত শত লোক প্রাণ দিয়েছে বা পঙ্গু হয়েছে, সেই সব ঘটনার কথাতো রেলযাত্রীরা ভুলতে পারেনা। লঞ্চ ডুবীর ঘটনায় তো গাফিলতি আরো বেশী জঘন্য। অর্থের লোভে লঞ্চের বহন শক্তির দ্বিগুন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করলে যে অঘটন ঘটবে তা তো আর আকস্মিক নয়, অপ্রত্যাশিত নয়। শত শত যাত্রী এই রূপ ঘটনায় কিছু দিন পর পর প্রাণ দিচ্ছেন, অথচ এর প্রতিবিধান নেই। সড়ক দুর্ঘটনা তো নিত্য–নৈমিত্তিক ব্যাপার। ২৫ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের উথলিতে নওগাঁ থেকে ঢাকাগামী যাত্রী বোঝাই নৈশ কোচ যে ভাবে স্পীডব্রেকারকে অবজ্ঞা করে প্রথমে পুলের বাঁ দিকের রেলিং এ ধাক্কা মারে, তার পর ডান দিকে মোড় নিয়ে ডানের কংক্রিট রেলিং ভেঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, এটাকে দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এটা গণ হত্যা পর্যায়ের অপরাধ। প্রায় ৩৫ জন যাত্রীর প্রাণহানী এবং অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর অঙ্গহানী ঘটে এই একটি ঘটনায়।

সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে এই ঢাকা আরিচা রাস্তার নয়ার হাট থেকে আরিচা ঘাট পর্যন্ত এলাকায়। এই কথাটি কর্তৃপক্ষ কি এখনো উপলব্ধি করতে পারেননি! একই এলাকায় একই রাস্তার উপর বছরের পর বছর বারে বারে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অথচ এর কোন প্রতিবিধান হচ্ছে না, এটাতো কোন সভ্যদেশ গ্রহণ করতে পারে না।

১৪ সেপ্টেম্বর মহানগরীর সন্নিকটস্থ ডেমরায় একটি যাত্রীবাহী বাস খালে পড়ে ডুবে গিয়ে যে ১২ জন যাত্রী প্রাণ দিলো এবং অজ্ঞাত সংখ্যক যাত্রী আহত হলো, এটাও কি দুর্ঘটনা? ষ্টীল বডির স্থলে নিষিদ্ধ কাঠের নড়বড়ে বডির বাস চলতে দেয়াই হলো কেমন করে? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নিমজ্জিত বাসের মধ্যে আরো লাশ রয়ে গেছে, স্থানীয় জনগনের এই দাবী নিয়ে বাদানুবাদ লেগে গেলো, এবং লাশ উঠানোর কাজ বন্ধ করে শুরু হয়ে গেলো পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ। লাঠি চার্জ করে জনগনকে শান্ত করতে না পেরে ব্যবহার করতে হলো কাঁদুনে গ্যাস। অশ্রুতপূর্ব এই পরিস্থিতির কারণটি কি নির্ধারণ করা হয়েছে? এটা কি কর্তৃপক্ষের উপর জনগণের চরম আবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়?

শৃংখলাবোধ বলে কোন কিছু যে এদেশে আর নেই, তা দেখতে হলে ঢাকা মহানগরীর যে কোন রাস্তার পরিবহন ব্যবস্থার দিকে একনজর দৃষ্টি দিলেই যথেষ্ট হবে। সুন্দর সম্প্রসারিত রাস্তায় লাইন ধরে গাড়ী চললে যানজট হওয়ার কোন কারণই নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু লাইন ধরে চলা যেন আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। রাস্তায় বাস, ট্রাক, মটর কার, জীপ, বেবীটেক্সী, রিক্সা ও ঠেলা গাড়ীর মধ্যে ফ্রিষ্টাইলে অবিরাম প্রতিযোগিতা চলছে। তাই একদিকে হচ্ছে যখন তখন সংর্ঘষ, আর একদিকে হচ্ছে দীর্ঘ স্থায়ী যানজট। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতির সমাধান কি করা যায় না? যথেষ্ট প্রচেষ্টা কি হয়েছে? অবশ্যই হয়নি।

শহরের বাহিরে, দুর পল্লার রাস্তায়, যেখানে যানজটের কোন কারণ নেই, সেখানকার দৃশ্যটাই বা কি? দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানোর প্রতিযোগিতা হচ্ছে এই সব রাস্তায়। প্রায় প্রত্যেকটি গাড়ী যেন মারমুখী হয়ে চেষ্টা করছে অগ্রগামী গাড়ীকে ওভার টেক করতে। আর সামনের গাড়ী, সেটা বাসই হোক আর ট্রাকই হোক, পিছনের গাড়ীকে ওভার টেক করতে দেয়া যেন অপমানজনক মনে করে কিছুতেই তাকে অতিক্রম করতে দিচ্ছে না। কোন এক সুযোগে পিছনের গাড়ী হয়তো জীবনের ঝুকি নিয়ে ওভার টেক করে ঐ প্রতিবন্ধকতাকারী গাড়ীর ড্রাইভারকে শাসিয়ে দেবার জন্য রাস্তা অবরোধ সৃষ্টি করে দিলো। তারপর চিল্লাচিল্লি গালাগালি হাতাহাতি। ইতিমধ্যে উভয় দিক থেকে আগত বহুগাড়ী আটকা পড়ে গেছে। দু'চার জন প্রবীনলোক এগিয়ে এসে করজোড়ে বিবাদমান পক্ষ গুলোকে নিরস্ত্র করলেন; তখন আবার যান বাহন চলতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে সকলেরই আধ ঘন্টা একঘন্টা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি যদি একদিকে কোন ট্রাক–বাস ড্রাইভার এবং অপরদিকে কোন মটর কারের মালিকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে, তা হলে তো আর কথাই নেই। তখন ট্রাক বাসের ড্রাইভারগণ তাদের সংগঠনের নাম ধরে ঘোষণা দিয়ে দিলো রাস্তা বন্ধ। সমর্থকের অভাব নেই। দু'চার ঘন্টা আটকা পড়ার পর ঐ মটর কারের মালিক বাধ্য হয়ে "আপোষ" করে ছাড়া পেলেন।

ফেরি ঘাটের সর্বশেষ পরিস্থিতি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঢাকা কুমিল্লা মহাসড়কের মেঘনা ও গোমতি ফেরি ঘাটে যা ঘটছে তা বর্বর অরাজকতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সেখানে জোর যার মুল্লুক তার। ফেরির নৌকায় কে আগে উঠবে তার কোন নিয়ম কানুনের বালাই নেই। অন্যান্য ফেরি ঘাটেও একই অবস্থা।

www.pathagar.com

২·৪ ঃ শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি

শিক্ষাঙ্গনে অশান্ত পরিস্থিতি, অস্থিরতা, হানাহানি, খুনখারাবি তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু ১৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সারারাত ধরে গেরিলা কায়দায় গুলী বিনিময় হওয়ার পরই কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ২০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে পুলিশ তল্লাশী চালায়। এর ফলে আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয় এবং ছাত্র নামধারী ৩৪ জনকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের অন্যতম ব্যক্তি হলো গোলাম ফারুক অভি, যার বিরুদ্ধে কয়েকটি খুনের মামলা বিচারাধীন আছে। এই গোলাম ফারুক অভি একটি উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান। তার মা 'শ্রেষ্ঠ মাতা' হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার ৫ ভাইবোন নাকি সবাই ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত। সেও ছিলো মেধাবী ছাত্র। সে এক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। তার স্বীকারোক্তিতে সে সব কথাই নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছে। গোলাম ফারুক অভি কি একাই পড়াশোনার পরিবর্তে সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথ বেছে নিলো? নিশ্চয়ই না। তার মতো শত শত অভি ঐ পথ বেছে না নিলে আজ সারা দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো রণাঙ্গণে পরিণত হতো না।

আজ সারা দেশের শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দেশ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। আসল অবস্থাটা তার চেয়েও খারাপ। বিত্তশালী লোকের অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের এই কলুষিত পরিবেশে রেখে জীবনের আশা-আকাংখাকে ধূলিস্যাত করার ঝুকি নিচ্ছেন না। তাই তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে, জ্ঞানার্জনের জন্য। এতে কারো দুঃখ করার কথা নয়। কিন্তু এর মধ্যেও উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। একই পাড়ার একজন সাধারণ মেধাবী ছেলে বিদেশে চলে যাবার সুযোগ পেলো, ভাল কথা। কিন্তু বিদেশে শিক্ষা লাভ করে সে কি এদেশে ফিরে আসবে? সম্ভাবনা কম। আর এই একই পাড়ার উচ্চতর মেধাবী আর একটি ছেলে বিদেশে যাবার সে সুযোগ না পেয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এই কলুষিত পরিবেশে পড়ে থেকে তার তীক্ষ্ণ মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চারটি লেটার ও ষ্টার পেয়ে এক একটি প্রতিশ্রুতিশীল ছেলে বছরের পর বছর অলস বসে আছে, কারণ পরবর্তি কাংখিত উচ্চশিক্ষায় ভর্ত্তি করাই হচ্ছে না, না হয় ভর্তি হলেও পড়াশুনা শুরু হচ্ছে না। এই মেধাবী ছেলেমেয়েদের মানষিক প্রতিক্রিয়াটি একবার অনুমান করা যাক। এদের উৎসাহ উদ্দীপনা বিনষ্ট না হয়ে পারে না। দেশপ্রেম নামক পবিত্র অনুভূতি এদের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারেনা। এরা অবশ্যই শোনে তাদের ভাগ্যবান সহপাঠীরা বিদেশে উচ্চমানের বিদ্যালয়ে হুড়হুড় করে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে, জ্ঞান অর্জন করছে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সফল প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর তারা এখানে বসে তিলে তিলে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য হা-হুতাশ করছে। এমতাবস্থায় স্বল্প মেধাবী ছেলেমেয়েরা পিতামাতার আর্থিক সচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে যখন বিদেশের

www.pathagar.com

নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা শুরু করবে, অথবা অন্যত্র উচ্চস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখনো উচ্চতর মেধাবী তাদের সহপাঠীরা এদেশে বসে সেশন জঠের ঠেলায় জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টুকু হারাতে থাকবে। স্বল্প মেধাবী ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ হয়তো বিদেশী ডক্টরেট নিয়ে বাংলাদেশেরই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়ে আসবে, আর তখনো তাদের উচ্চতর মেধাবী সহপাঠীরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়; এর বাস্তবতা দেখতে হলে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের মেধাবী ছেলেরা যদি গোলাম ফারুক অভির মতো বিপথগামী হয়, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অভির গ্রেফতারের পর নিউমার্কেট, এলিফেন্ট রোড ও গাওসিয়া মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এটা প্রণিধানযোগ্য। অভির ভয়ে ব্যবসায়ীরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো। অভির দলকে উচ্চহারে চাঁদা দিতে হতো। অভির নিজে যাবার দরকারই ছিল না। তার চিঠিই ছিল যথেষ্ট।

এই অবস্থা চলে আসছে ঢাকা মহানগরীর বহু এলাকায় এবং দেশের প্রায় সকল বাণিজ্য কেন্দ্রে। চাঁদা আদায়ের অনুরূপ পদ্ধতি পাকা পোক্ত হয়ে আছে সর্বত্র। ২৩ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাকে একটি শিরোনাম হলো "তিন মাসে সংঘর্ষে ১২ জন ছাত্রের মৃত্যু ৪ শত আহত।" সংবাদে বলা হয়েছে গত ৩ মাসে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় ১২ জন ছাত্রের মৃত্যু ঘটেছে এবং আহত হয়েছে ৪ শতেরও বেশী ছাত্র। বিভিন্ন জেলার ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। সঠিক সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সেশন জট দেখা দিয়েছে। খবরে আরো বলা হয়েছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যে সকল অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে সেগুলো সহজ লভ্য নয়।

প্রত্যেকদিনই সংবাদপত্রে দেশের কোন না কোন শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি খুনাখুনির সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। এই হানাহানির জন্য সারাটি বছরই দেশের কিছু না কিছু বিদ্যালয় বন্ধ থাকছে। এমনি করে মারামারি হানাহানির জন্য অনেক বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, আবার কিছু দিন পর খুলে দেয়া, এই লুকোচুরি খেলা চলেই আসছে।

প্রথমদিকে দেশের মাদ্রাসাগুলো এই মারামারি খুনাখুনিতে জড়িত ছিলনা। অধুনা একের পর এক বড় বড় মাদ্রাসা রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে ১৪ আগষ্ট মহররমের রাতে ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসায় যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলে, তা ছিলো অত্যন্ত গুরুতর। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় এই ঘটনার পর সারা দেশে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার জের হিসাবেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ হয়, একজন ছাত্র নিহত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অবিরাম চলছে। তিনমাসে ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও বিবাদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ চলছে। পরীক্ষায় নকল করাতো প্রায় সার্বজনীন প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। ছাত্ররা সদর্পে বলে, নির্বাচনে কারচুপী করে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়,

www.pathagar.com

তবে পরীক্ষায় একটুখানি নকল করে মাত্র একটি সার্টিফিকেট পাওয়া এমন কি অন্যায়। তাই নকল করে পরীক্ষায় পাশ করা এখন দাবীর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছে। তবে মেধাবী ছাত্রছাত্রী, যারা এস এস সি, এইচ এস সি পরীক্ষায় লেটার ষ্টার পাবার যোগ্য, মেধা তালিকার শীর্ষে স্থান লাভেরও আশা করে, তাদের মধ্যে নকলের প্রবণতা এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ নকল করে পাস করা যেতে পারে। কিন্তু নকল করে লেটার, ষ্টার এমনকি মেধা তালিকায় স্থান পাবার দৃষ্টান্ত এতোদিন স্থাপিত হয়নি। কিন্তু ১৭ অক্টোবরের দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ঃ "দুর্নীতির মাধ্যমে এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম ও এইচ এস সিতে দশম স্থান দখল" শীর্ষক যে সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা নকলের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর উপর এক নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত। তাদের মনে এখন স্বভাবতই সন্দেহ জাগছে আরো কত ক্ষমতাধর আমলার ছেলেমেয়েরা অনুরূপভাবে বেপরোয়া নকল করে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নিতে থাকবে তার তো কোন পাত্তা পাওয়া যাবে না। এই সন্দেহ, এই দুশ্চিন্তা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কতটুকু নিরুৎসাহ করবে তা বলা মুশকিল। অনেকেই হয়তো আর মেধা তালিকায় স্থান লাভের চিন্তা ছেড়েই দিবে। কারণ একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দুই ছেলে যদি একই বছরে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় নিজের বাসায় বসে প্রাইভেট টিউটারদের সক্রিয় সহায়তায় নিশ্চিন্তে নকল করে, একজন এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং আর একজন এইচ এস সি পরীক্ষায় দশম স্থান দখল করে নিতে পারে, তাহলে ৪৬০টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কতজনের ছেলেমেয়ে যে এই সুযোগ গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতে করবে তার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আর ইউ, এন, ওর উপরস্থ আরো যে শত শত কর্মকর্তা রয়ে গেছেন তাদের ছেলেমেয়েরাই বা এ সুযোগ গ্রহণ করবে না কেন? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই একটি ঘটনা তীক্ষ্ণ মেধাবী ছেলেমেয়েদের উৎসাহ উদ্দীপনায় যে নিষ্ঠুর আঘাত করলো এরতো কোন প্রতিকারের সন্ধান নেই।

এটাও সর্বজনবিদিত যে আজকাল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে গেলে প্রাইভেট টিউটার রাখতেই হবে। আর যে সে প্রাইভেট টিউটার হলে চলবেনা। নামকরা প্রাইভেট টিউটার, যার যাদুদন্ডের স্পর্শে আসতে পারলে নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে লেটার পাওয়া নির্ঘাত, এমনকি ষ্টারও পাওয়া যেতে পারে। এসব স্বনামধন্য শিক্ষকগণ এখন বিদ্যালয়ের ক্লাশে দায়সারা গোছের কাজ করে চাকুরী বহাল রাখছেন, আর সকাল-সন্ধ্যা নিজ নিজ সুবিধাজনক আস্তানায় দলের পর দল ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাওয়ার পথ শিখিয়ে দেন। তারা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি দেন আকাংখিত রেজাল্টের নিশ্চয়তা দিয়ে। এমনো সৌভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রী আছে যাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটার রাখা হয়েছে। এই পথে পরীক্ষার রেজাল্টও এখন অগ্রীম বিকিকিনি হয়ে থাকে।

সরকার বার বার ঘোষণা দিচ্ছেন ২০০০ সালের পর দেশে আর নিরক্ষরতা থাকবেনা। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে নিরক্ষরতার অনুপাত বছরের পর বছর বেড়েই চলছে। কেউ কেউ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন। অথচ

www.pathagar.com

বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী স্বীকৃতি ও অনুদানই পাচ্ছে না। সরকার গত বছর এক হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয়করণ করেছেন। এর মধ্যে এমনো প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যে গুলো ১০/১৫ বছর পর্যন্ত আর্থিক টানাটানি সত্বেও সুশিক্ষা দান করছিলো। রাষ্ট্রীয়করণের প্রায় দুই বছর হয়ে গেলো, আজও কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বেতনই পাচ্ছেননা। এমতাবস্থায় এই সব স্কুলে পড়াশোনা চলবে কেমন করে?

দেশে উচ্চ শিক্ষিত বেকারেরা চাকুরীর অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর অনেক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে ক্লাশ নেওয়া হয়না। বহু সরকারী স্কুল আছে যেখানে অনুমোদিত ২৫ জন শিক্ষকের স্থলে প্রায় সব সময় অর্ধেকেরও বেশী পদে শিক্ষক নেই। এমনো সরকারী স্কুল আছে যেখানে ২৫ জন শিক্ষকের স্থলে প্রায়শঃই ৬/৭ জনের বেশী শিক্ষক থাকেননা। শিক্ষকের স্বল্পতার জন্য স্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট পর্যন্ত করেও শিক্ষক পাচ্ছে না। ১ অক্টোবরের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশ, বেগমগঞ্জ ও মঠবাড়িয়া উপজেলায় বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাজবাড়ীর দু'টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। বেগমগঞ্জ উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ৬০ জন শিক্ষকের পদ খালি আছে। মঠবাড়িয়া উপজেলায় ৩২ জন শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে।

সর্বোপরি, আমাদের প্রথম স্বাধীনতার চার দশকেরও উর্ধ্ব সময়ে এবং দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত স্বাধীনতার প্রায় দুই দশক পূর্ণ হ'তে যাচ্ছে অথচ এখনো কালোপযোগী একটা শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হলোনা। যে শিক্ষানীতি এখন অনুসরণ করা হচ্ছে এটা যে যুগোপযোগী নয় সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু সময় উপযোগী শিক্ষানীতি গঠনের কোন দৃঢ় সংকল্পইতো দেখিনা।

www.pathagar.com

২.৫ ঃ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে যে অধঃপতন ঘটে গেলো এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে নবনিযুক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ আজিজুর রহমান ছদ্মবেশে কয়েকটি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে স্বচক্ষে যা দেখেছেন তার যে অংশটুকু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যে কোন জাতির জন্য সেইটুকুই কলংকজনক। স্বাস্থ্য মন্ত্রী তো আর তার নিজের মন্ত্রণালয়ের কুৎসা রটনা করতে যাননি; তিনি তো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেননি; সাংবাদিক সম্মেলনও করেননি। তার আকস্মিক পরিদর্শনের সময় ঘটনাক্রমে সংশ্লিষ্ট স্থানে যে দু'একজন সচেতন নাগরিক উপস্থিত ছিলেন ও তাকে চিনে ফেলতে পেরেছিলেন, তাদের মুখে হাসপাতালের এই করুণ পরিস্থিতি সংবাদপত্রে গিয়ে পৌঁছেছে। দেশের বৃহত্তম হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগে স্বাস্থ্য মন্ত্রী স্বচক্ষে যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখেছেন তার পুনরাবৃত্তি করে দেশের সম্মানিত চিকিৎসকগণকে বিব্রত করতে চাইনা।

সারা দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার গুরুতর অবক্ষয়ের একটি প্রমাণ হলো, বিগত কিছু কাল থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের চিকিৎসা কেন্দ্রে। সেখানকার বারোটি অতি উচ্চমানের ও সুবৃহৎ প্রাইভেট হাসপাতাল প্রতিদিনই ভর্তি করছে বাংলাদেশী রোগীদের। অনেকেই যাচ্ছেন সেখানকার বিখ্যাত হৃদরোগ হাসপাতালে। অনেকটা অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে অস্ত্রপচার বা চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসছেন তারা।

অনেকেই যাচ্ছেন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য। বিরাট বিরাট প্রাইভেট হাসপাতালের প্রত্যেকটিতেই ক্যান্সারের চিকিৎসা হয় অতি উচ্চমানের। আজকালতো অস্ত্রপচারের আবশ্যকতা দেখা দিলে প্রায় যে কোন রোগীই ব্যাংকক চলে যেতে চাচ্ছেন। যার আর্থিক সংস্থান নেই তাকে সাহায্য করছেন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা। এরূপ একটি উদাহরণ হলো বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থার (বিসিআইসি) পদস্থ কর্মকর্তা ফজলুল হক এর ছেলে তুহিন। এই মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র তুহিনকে আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের সন্নিকটে একটি ট্রাক এমন নির্মম ভাবে আঘাত করে যে তার দু'টি পা'ই ভেঙ্গে চুরে যায়, আর একটি পায়ের মাংশপেশী সব খসে পড়ে। মুমূর্ষ তুহিনের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত এদেশে হলোনা। তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় অনাত্মীয় সুহৃদ ব্যক্তিগণের সহায়তায় তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যাংককে। তার স্নেহময়ী মা তাকে নিয়ে মাস চারেক থাকেন ব্যাংককের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে। তুহিনের পিতাও এই দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংককে। তুহিনের প্রাণ রক্ষা হয়ে গেছে। তার একটি পা সেরে উঠেছে, আর এক পা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে।

একদিকে আমাদের দেশের ক্রমাবনত চিকিৎসা বিভ্রাট আর একদিকে ব্যাংককে স্বল্প ব্যায়ে অতি উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, এখন বাংলাদেশের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাংককমুখি করে তুলেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বিমানের ব্যাংকক ফ্লাইটের সম্প্রসারণ করতে হবে। এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে পাঠকগণের মন আর বিষাক্ত করতে চাইনা।

১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের একটি শিরোনামঃ "গামছায় ঔষধ ফিল্টার হয়, মিটফোর্ডে আলু পিয়াজের মত ঔষধের কাচামাল পড়ে থাকে।" সংবাদে বলা হয়েছে, ইউনিসেফ পরিচালিত অনুসন্ধানে দেখা গেছে পরিত্যক্ত বাথরুম ঔষধের স্যাঁত স্যাঁতে গুদাম, তার মধ্যে আবার পোকা মাকড়, আরশুলা, ইদুর, পিপড়া। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই কারণেই বোধ হয় নির্ধারিত মূল্যের অনেক কম দামেও বাজারে ঔষধ বিক্রি হয়। এর একটা সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো ১৬ সেপ্টেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাকে। একই তারিখে একই পত্রিকায় আরো একটি শিরোনামঃ "রাজশাহীর গ্রামে বিষক্রিয়ার কারণ, বর্জিত ঔষধের প্রতিক্রিয়া।" সংবাদে প্রকাশ, রহস্যজনক বিষক্রিয়ায় পটিয়া উপজেলায় এই পর্যন্ত পাঁচ জন মারা গিয়েছে, আর ২১৫ জন গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ হচ্ছে। পটিয়া উপজেলার এক হাওরে কয়েক বিঘা জমিতে হাজার হাজার প্যাকেট গবাদি পশুর ক্রিমি নিয়ন্ত্রক ঔষধ বা কীটনাশক অথবা ঐ ধরণের দ্রব্য স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। এই গুলো পানিতে গলে নদনদী দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। তদন্ত শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ হবে কি? প্রায় বত্রিশটি গ্রামে এই পরিত্যক্ত ঔষধের বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে বলে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এরূপ একটি জঘন্য কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ত্বরিত গতিতে করলে জনগণের কিছুটা আস্থা সৃষ্টি হতো।

১০ অক্টোবরের দৈনিক ইত্তেফাকের একটি শিরোনামঃ "নীলফামারীতে ডায়রিয়ায় ৫০০ আক্রান্ত।" খবরে বলা হয়েছে, দুই সপ্তাহে ২২ জন লোক ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে, এবং দৈনিক ২২/২৩ জন ডায়ারিয়া রোগী হাসপাতালে ভর্ত্তি হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভ্রাট যে একটি জাতীয় সমস্যা এবং এ সমস্যার আশু সমাধান আবশ্যক এর স্বীকৃতিটুকুও অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

২৬ঃ ভিক্ষাবৃত্তি

জাতীয় পর্যায়ে ভিক্ষাবৃত্তি, অর্থাৎ দাতা দেশ গুলোর নিকট থেকে অনুদান, সাহায্য ও ঋণ গ্রহণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ভিক্ষাবৃত্তি দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে। মসজিদ-মাজার-কবর স্থান ইত্যাদিতে ভিক্ষুকের সমাবেশ দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। মহানগরীর ব্যস্ততম ট্রাফিক পয়েন্টে ভিক্ষুকদের বিপদজনক বিচরণ কর্মব্যস্ত চিন্তামগ্ন মানুষকে অস্থির করে তুলেছে।

১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে "অপহৃত শিশুদের পঙ্গু করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিতে লাগান হচ্ছে" শিরোনামে যে সচিত্র প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে তা জাতির আর একটি কলংকজনক অধ্যায়। একই পত্রিকায় ১৭ সেপ্টেম্বরের "শিশু অপহরণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ" প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সংঘবদ্ধ বিবেকহীন পেশাজীবি দল জড়িত আছে। জরাজীর্ণ বুড়োবুড়ি, স্বাস্থ্যবতী নারী, পঙ্গু-বিকলাঙ্গ মানুষ, আর কিশোর-কিশোরী ও শিশুরা ভিক্ষা লাভের আশায় জড়ো হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থলে। ব্যস্ত সমস্ত ট্রাফিক পয়েন্ট গুলোর কাছাকাছি তারা ওত পেতে থাকে আর ট্রাফিকের লালবাতি জ্বলার সাথে সাথে এরা ধাবিত হয় দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসা গাড়ীগুলোর দিকে। গাড়ী থামার আগেই তারা আগ বাড়িয়ে শুরু করে ভিক্ষা পাওয়ার আকুতি। করুণায় হোক আর ঝামেলা এড়ানোর জন্যই হোক, গাড়ীর আরোহীরা দু'এক টাকা দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ট্রাফিকের সবুজ বাতি জ্বলে গেছে। মোটর গাড়ী, বেবী-ট্যাক্সী, রিক্সা আবার যথেচ্ছ ভাবে এগিয়ে যাবার জন্য ছুটছে। আর ফাঁকে ফাঁকে ভিখারীর দলও গাড়ীর পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে, শেষ মুহূর্তে দু'একটা টাকা পাবার আশায়। জীবনের ঝুকির কোন চিন্তা নেই। এ দু'একটি টাকাই তাদের কাছে জীবনের চেয়ে বড়।

ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্যই একটা জাতীয় সমস্যা, কিন্তু ভিক্ষার মনোবৃত্তি মহামারীর মতো মারাত্মক। ভিক্ষাবৃত্তি জাতির ধ্যান ধারণার উপর আঘাত হানছে। একশ্রেণীর লোকতো ধর্মের নামে ভিক্ষালব্ধ আয়কে সম্মানিত উপার্জন বলে মনে করে নিচ্ছে। এরা কায়িক পরিশ্রম বিমুখী। ধর্মান্ধ মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এরা সমাজের উপর এক বোঝা হিসাবে বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

২.৭ ঃ চরিত্র সংকট

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখতে গেলে সর্বপ্রথমেই এসে যায় মারাত্মক চরিত্র সংকট। এই চরিত্র সংকট এখন এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি, পণ্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কম দেয়া, আত্মসাৎ করা, চুরি, চোরাচালানী, ঘুষখোরীসহ সর্বপ্রকার দুর্নীতি এখন আর সমাজে গর্হিত কাজ বলে গণ্য হয়না। সমাজ এখন এইসব কার্যকলাপকে বাস্তব বলে, এমনকি বাহাদুরী হিসাবে, গ্রহণ করে নিচ্ছে। সমাজে এখনো যে দু'চারজন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, সমাজে তাদের কোন মূল্যই নেই। কারণ প্রায় গোটা সমাজই আজ নগদ ফায়দা লুটতে ব্যস্ত। "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও" কথাটা আজ আমাদের সমাজ সাদরে বরণ করে নিয়েছে। চোরাচালানীকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে কেবল ভাল পারিশ্রমিকই পাওয়া যায় না, অপ্রত্যাশিত মোটা অংকের ভাগ পাবার সম্ভাবনাও থাকে। হাইজ্যাকারের, পকেট মারের দলে ভিড়লেও নগদ পারিতোষিক যথেষ্ট। কিন্তু সৎ ব্যক্তির হিতোপদেশে তো নগদের আস্বাদ নেই। তাই সৎ ব্যক্তি এখন সমাজে অবহেলিত।

সৎ পিতা-মাতার অবস্থাটাও আজ অত্যন্ত নাজুক। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক মরহুম আসাফদ্দৌলা রেজাকে রোগ শয্যায় যখন দেখতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, একটা ব্যথা বুকে নিয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে বলে মনে হয়। আর সেই ব্যথাটা হলো তাঁর ছেলে মেয়েরা ভাববে তাদের পিতামাতার বোকামীর জন্যই তারা জীবনটাকে একটুখানি উপভোগ করতেও পারলোনা। রেজা সাহেব ও তার স্ত্রী উভয়ই উচ্চ বেতনে চাকুরী করতেন। তথাপি তারা রোজ রোজ তো আর মস্ত বড় রুই মাছ, ডজন ডজন মুরগী, ঝুড়ি ঝুড়ি আম ক্রয় করে নিয়ে আসতে পারতেন না। তাদের কচি ছেলে মেয়েরা প্রায়ই বলতো, তাদের প্রতিবেশী ও খেলার সাথীদের এক বাসায় তারা রোজই দেখে বিরাট বিরাট মাছ, ঝুড়ি ঝুড়ি আম ইত্যাদি। রেজা সাহেব বললেন, ছেলে মেয়েদের কি করে বলি, তাদের বন্ধুদের পিতাতো সরকারী এক ছোট চাকুরী করেন, আর সেই সুবাদে ঐ সব বড় বড় মাছ আর ঝুড়ি ঝুড়ি আম বৈধ অর্জিত নয়। সত্য কথাটা না বলে ঘুরিয়ে ছেলে মেয়েদের যতই বুঝান না কেন তারা চুপ মেরে থাকলেও তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে, পিতা মাতার বোকামীর জন্যই তারা প্রতিবেশীর মতো প্রাচুর্যের স্বাদ পাচ্ছেনা। সমাজে আজ যে কয়জন ব্যক্তি দুর্নীতি পরিহার করছেন তাদের অবস্থা আসাফদ্দৌলা রেজারই মতো।

দুর্নীতি সমাজের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে। সমাজে আজ দুর্নীতিবাজদের জয়জয়াকার। দুর্নীতিবাজের দাপটে সৎ ব্যক্তিরা কেবল পরাজিতই নন। তারাও পরোক্ষ ভাবে দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। যিনি অবৈধ আয়ের পথ পরিহার করেন, তিনি কি আজ অবৈধ ব্যয় না করে এই সমাজে চলতে পারেন? যিনি ঘুষ খাননা তাকেও কিন্তু ঘুষ দিতে হচ্ছে। যিনি কোন অবৈধ আয়ের পথে যান না, তাকে আর না হোক, চাঁদার নামে মাদক দ্রব্য সেবনের টাকা যোগান দিতে হচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি সরকারী

www.pathagar.com

যে মহলে যাবেন সেই মহলেরই কোন না কোন স্তরে অবৈধ ব্যয় না করলে কোন প্রতিকারই পাবেন না। এমনকি ব্যাংক থেকে নিজের টাকা তুলতে গেলেও এখন বখশিস দাবী করার প্রবণতা চালু হয়ে গেছে। সুদহীন ব্যাংকেও নাকি ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হয় না। ইসলামের নামে এটাও হজম হচ্ছে।

দুর্নীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিকটি হলো বিচারের উপর এর বিষক্রিয়া। লোকের বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করে ন্যায় বিচার পাওয়া যায়না। এই বিশ্বাস হয়তো বা ষোল আনা সঠিক নয়। বিচার ব্যবস্থায় হয়তো এখনো কিছু লোক আছেন, যারা দুর্নীতিমুক্ত। কিন্তু একজন বিচারক কেবলমাত্র সৎ, দুর্নীতি মুক্ত থাকলেই তো ন্যায় বিচার নিশ্চিত হলো না। এমনকি দেশের কিছু সংখ্যক আদালতে যদি দুর্নীতি মুক্ত বিচার নিশ্চিতই হয়ে যায় তাহলেও তো বিচারের পবিত্রতা অর্জিত হলোনা। সেই পবিত্রতা নির্ভর করছে গণমানুষের বিশ্বাসের উপর। সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত প্রবাদ "কেবল ন্যায় বিচার করাই যথেষ্ট নয়, মানুষের বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে ন্যায় বিচার করা হচ্ছে।" আজ বাংলাদেশে সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দেশের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, দুর্নীতির আশ্রয় ছাড়া ন্যায় বিচার পাওয়া যায়না। কেবল তাই নয়, অবস্থাটা আরো মারাত্মক। মানুষের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় প্রমাণ করিয়ে নেয়া মোটেই কঠিন নয়।

বিচার ব্যবস্থার উপর এই যে অবিশ্বাস, এটাই আজ মানুষের নিরাপত্তাহীনতার সবচেয়ে বড় কারণ। সম্প্রতি ঘোষিত বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কীত সুপ্রীম কোর্টের রায় মানুষের উপরোক্ত মারাত্মক বিশ্বাস পরিবর্তনের একটা সূচনা সৃষ্টি করেছিলো। যারা এই রায়ের সঙ্গে কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট নন, তাদেরও মনে একটা ধারণা হচ্ছিল যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের স্বাধীন রায় দেয়ার ক্ষমতাটুকু লুপ্ত হয়নি। এই রায় ঘোষিত হওয়ার পর পরই উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন তাতে ঐ চিন্তাধারাটি বেশ কিছুটা শক্তি অর্জন করেছিলো। তাতে অভিজ্ঞ মহল আশার আলোক পাচ্ছিলেন। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা হয়েছিলো, সরকার এই রায় খোলা মনে গ্রহণ করে নিবেন এবং এটা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করবেন না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী সে আশার উপর আঘাত হেনেছে। সেই ঐতিহাসিক রায়ের উপর কোন কোন মহল বিতর্কিত মন্তব্য করায় সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন। এখন অভিজ্ঞ মহলের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টের ঐ রায়ের উপর ভিত্তি করে আর একটা অবাঞ্ছিত কোন্দল শুরু হয়ে যেতে পারে। এটা একটা শুভ লক্ষণ নয়।

www.pathagar.com

২.৮ ঃ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরা সুকঠিন। একদিকে কোটি পতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে আর অন্যদিকে গৃহহীন, ভূমিহীন, কর্মহীন, অর্ধাহারী, অনাহারী লোকের সংখ্যাও বেড়ে চলছে। দেশের ১১ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ছয় কোটি লোক দারিদ্রের নিম্নতম পরিসীমারও অনেক নিম্নে অবস্থান করছে। একদিকে প্রাচুর্যের জন্য সমাজের উর্ধস্তরের কয়েক হাজার পরিবার সম্পদের পাহাড় গড়ছে, যথেচ্ছভাবে অর্থের অপচয় করছে, আর অন্যদিকে কোটি কোটি লোক দারিদ্রের দুষ্ট চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমাগত জাতির উপরে অবাঞ্ছিত বোঝায় পরিণত হচ্ছে। অর্ধাহার অনাহার জনিত অপুষ্টিতে এদের জীবনী শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, আর সরাসরি অনাহারে মৃত্যু বরণ না করলেও অপুষ্টি জনিত কারণে উদ্ভূত বিভিন্ন রোগে জর্জরিত হয়ে এরা কেবল বেঁচে থাকার জন্য অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। আর না হয় রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। দেশের প্রায় তিন কোটি নারী-পুরুষ হয় সার্বক্ষণিক না হয় খন্ডকালীন বেকারত্বে ভুগছে। এদের মধ্যে শিক্ষিত যুবক বেকারের সংখ্যাই আনুমানিক ৫০ লক্ষ।

আর্ন্তজাতিক অর্থানুকুল্যে দেশের উন্নয়নের কার্যকলাপ চলছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার এক কানাকড়িও ঐ দারিদ্র প্রপীড়িত, অর্ধাহারে, অনাহারে, অপুষ্টিতে জর্জরিত জনগোষ্ঠির হাতে গিয়ে পৌছেনা। বরং উন্নয়নের নির্মানাদি কাজে সংশ্লিষ্ট বিত্তশালী লোক সম্পদ সম্প্রসারনের সুযোগ পাচ্ছে। এই সব লোকের বাড়তি আয়ের জন্য ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে, যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েই চলেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্রয় ক্ষমতা কমছে।

দেশে বিরাজমান এই অর্থনৈতিক বৈষম্য, একদিকে অফুরন্ত সম্পদ, আর অন্যদিকে চরম দারিদ্র, এই দুঃখজনক পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটার জন্য কোন একটি সরকারকে বা কোন একটি রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠিকে দায়ী করা যাবে না। এর জন্য ১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতার পর থেকে ত্রুটি পূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে মারাত্মক ভুল ভ্রান্তিকে দায়ী করা যায়। তবে মূল দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্রমাগত ভ্রান্তিমূলক প্রয়োগ এবং জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার উপর।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), যার অনুমোদনকারী ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোর্চ্চ স্থান লাভ করেছিল "দারিদ্র বিমোচন"। সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিলো, দারিদ্র প্রশমিত করাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। আরো বলা হয়েছিলো, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেকার ও অর্ধ বেকারের কর্মসংস্থান করতে হবে। দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়াতে হবে, উৎপাদনের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করতে হবে। লক্ষ্যনীয় যে দারিদ্র প্রশমিত করাকে সদ্য সমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংস প্রাপ্ত অবকাঠামো পুনর্গঠনেরও উপরে স্থান দেয়া হয়েছিল। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী সময়েই সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনপ্রতিনিধির হাত থেকে সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়। এতদসত্বেও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্র ধরেই প্রস্তুত হয়। তবে এই বার দারিদ্রকে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রথমস্থান থেকে নামিয়ে চতুর্থস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আর দারিদ্র প্রশমিত করার পরিবর্তে বলা হয় দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি রোধ করা দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য।

তারপর আসে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে দারিদ্রকে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে দারিদ্র কোন স্থানই পায়নি। আলোচনা প্রসঙ্গে দুই এক স্থানে দারিদ্র প্রশমিত করার আবশ্যকতার উল্লেখ থাকলেও সরাসরি লক্ষ্য মাত্রায় সেটা স্থান পায়নি।

তবে অপ্রিয় হলেও সত্য যে কোন একটি পরিকল্পনায়ও সরাসরি দারিদ্র বিমোচনের বা প্রশমনের কোন কার্যক্রমের বাস্তবধর্মী সুপারিশ নেই। দারিদ্রের সহচর "বেকারত্ব" সম্বন্ধেও একই কথা। সার্বক্ষনিক বা খন্ডকালীন বেকারদের কর্ম সংস্থানের সরাসরি কোন সুপারিশ কোন একটি পরিকল্পনাতেই খুঁজে পেলাম না। কেউ হয়তো দাবী করবেন তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনা ও একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার সকল সুপারিশ সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বাস্তবায়িত হয়ে গেলে দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যা দুরীভুত হয়ে যেতো।

আমি এই অভিমতের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করতে পারলামনা। দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন বা প্রশমন করার সরাসরি পরিকল্পনা ছাড়া এই সর্বগ্রাসী ব্যাধির উপশম সম্ভব নয়। শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ দরিদ্র বেকারের কর্মসংস্থান হয়তো সম্ভব, কয়েক কোটির কর্মসংস্থান কোন মতেই সম্ভব নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকার গ্রামবাসিদের জন্য তো গ্রামে গ্রামে কর্মসংস্থানের মত শিল্প স্থাপন আমাদের দেশে অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়। লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসিদের নিজ নিজ গ্রাম থেকে দুরে আবাসিক শিল্প এলাকায় নিয়ে কর্মসংস্থান করতে পারলেও জটিল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে গ্রামে ফেলে রেখে কর্মক্ষম পুরুষ দূরবর্তী স্থানে কর্মরত থাকা বিভিন্ন সামাজিক কারণে খুব কমলোকের পক্ষেই সম্ভব। তাই বিশ্বের সর্বত্রই শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ মজুর আশেপাশের গ্রাম সমুহের বাসিন্দা।

শিল্পায়ন ছাড়া কোন দেশেরই চূড়ান্ত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন হয়ে যাবে। শিল্প ছাড়া অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন, সড়ক, পুল, বন্দর, নগর ইত্যাদি নির্মাণে শ্রমিক নিয়োগ হয় স্বল্পকালীন সময়ের জন্য। নির্মান কাজ শেষ হলে তো আর শ্রমিকের দরকার নেই। তাই এ সব কাজের মাধ্যমে দারিদ্র বেকারত্ব ঘুচানো যায় না।

www.pathagar.com

অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে উন্নয়নের কাজে যারা পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে, তারাই বেশী লাভবান হয়। অর্থাৎ ধনী আরো বেশী ধনী হওয়ার সুযোগ পায়। ফলতঃ ধনী দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তেই থাকে। এই সম্বন্ধে পরবর্তিতে আরো বিশেষ আলোচনা করা যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে শিল্পায়ন অতি সীমিত অবদানের বেশী কিছু অর্জন করতে পারবেনা।

www.pathagar.com

২৯ঃ বাংলাদেশ–১৯৮৯ পরিক্রমা

তাই 'বাংলাদেশ ১৯৮৯' এর চিত্রটি হলো, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য–ব্যর্থতা–হতাশা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা–অন্যায়– অবিচার–চরম–দুর্নীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা–স্বাস্থ্য–নিরাপত্তার চরম অবনতি, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে কয়েক কোটি লোকের অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে কেবল বেঁচে থাকার জন্য একটুখানি খাদ্য সংগ্রহ করতে মনুষ্যত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দেয়া, আর অন্যদিকে কয়েক হাজার পরিবারের সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার সুযোগ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের মোক্ষম প্রতিবাদ হলো হরতাল। কিন্তু হরতালের পর হরতাল করতে করতে এই মোক্ষম অস্ত্রটি ভোঁতা হয়ে গেছে, হরতালের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। তবু সরকার বিরোধী হরতালের ডাক দিলেই জনগণ সাড়া দেয়, দিন মজুররা পর্যন্ত হরতালের বিরুদ্ধাচারন করেনা। তারা অবশ্যই বুঝে অর্ধেক দিন কাজ বিরতি দিয়ে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, অথচ তারা হরতালের প্রতিবাদ মুখর নয়। সামগ্রিক নৈরাশ্য হতাশার মধ্যে মেহনতি মানুষ এখন হরতালকে বিনোদনের এক সুযোগ বলে ধরে নেয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি এখন রাষ্ট্রীয় নিয়ামক শক্তি হিসাবে সদর্পে বিরাজ করছে। দুর্নীতি নামক ব্যবসাটি এখন জমজমাট। দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করেও জবাবদিহির কোন ঝুকি নেই। আমলাতন্ত্রের জঘন্য অন্যায়েরও কোন প্রতিকার নেই। প্রকাশ্যে ঘুষ দেয়া হচ্ছে, লজ্জা শরমের কোন বালাই নেই।

সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা সেশন জটের জন্য বিপর্যস্ত; প্রাথমিক শিক্ষা লন্ডভন্ড, মাধ্যমিক শিক্ষাও প্রায় অচল; চিকিৎসার জন্য যেতে হয় বিদেশে, নিরাপত্তার জন্য মাস্তানদের দিতে হয় চাঁদা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে সম্পদের পাহাড়, আড়ম্বরতার মাধ্যমে অপচয়, অন্যদিকে দারিদ্রের কষাঘাতে কোটি কোটি মানুষ অপুষ্টিজনিত কারণে জীবনী শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে; শিক্ষিত বেকার যুবকেরা নৈরাজ্য–হতাশার জ্বালা নিবারণ করতে মাদকাসক্তির দিকে ঝুকছে।

'বাংলাদেশ ১৯৮৯' এর যে চিত্র উপরে লিপিবদ্ধ করেছি এর একটি বাক্যও অতিরঞ্জিত নয় বরং বাস্তবের ভয়াবহতা বর্জিত ও পরিমার্জিত একটি আংশিক চিত্র। 'বাংলাদেশ ১৯৮৯' এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র আরো অনেক ভয়াবহ, অনেক হৃদয়বিদারক।

www.pathagar.com

৩ ঃ বাংলাদেশের সমস্যাবলী

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত "দেশটা কি রসাতলেই যাবে?" শীর্ষক পুস্তিকায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশ নামক ভূ-খন্ডটির সমস্যাবলী কোন দিনই চিহ্নিত করা হয়নি, সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা তো দূরের কথা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'বাংলাদেশ ১৯৮৯' এর যে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছি তার মধ্যে বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যাগুলোর উল্লেখ আছে। "দেশটা কি রসাতলেই যাবে?" পুস্তিকার পরিশিষ্টে বাংলাদেশের সমস্যাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম, প্রত্যেকটি মৌলিক সমস্যার শাখা প্রশাখার একটি তালিকা দিয়েছিলাম এবং সমস্যা সমাধানের অগ্রগণ্যতাও নির্ধারণ করেছিলাম।

বর্তমান আলোচনায় সমস্যা সমাধানের অগ্রগণ্যতার চেয়ে সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতাকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করার পর বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি মৌলিক সমস্যার শাখা প্রশাখা নির্ধারণ করবো। তারপর এই সব সমস্যা সমাধানের পথ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো। সর্বশেষে, দেশের প্রশাসন ও সমাজের চলমান পরিস্থিতির বাস্তবতার নিরিখে সমস্যাবলী সমাধানে অগ্রগণ্যতার সুপারিশ করবো।

সমস্যার 'দুষ্টচক্রে' নিমজ্জিত বাংলাদেশে অন্তহীন সমস্যা। সমস্যার উপরে সমস্যা, সমস্যার তলায় সমস্যা, সমস্যার ভিতরে সমস্যা। আর এই সব সমস্যা যেই-সেই সমস্যা নয়; জাতির চলার পথে বাঁধাদানকারী সমস্যা। জাতির আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সমস্যা, জনগণের আশা আকাংখা অর্জনে ব্যর্থতার সমস্যা। এমন কি মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা। জাতির অস্তিত্বের সমস্যা।

জাতির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসংখ্য সমস্যাবলী ক্রমাগত জন্ম দিয়ে যাচ্ছে নুতন নুতন সমস্যার। সমস্যায় জর্জরিত মানুষ তাই আজ দিশেহারা; নৈরাশ্য-হতাশার মহাসাগরে নিমজ্জিত মানুষ কুল কিনারা পাচ্ছে না; এমন কি শেষ সম্বল হিসাবে আকড়িয়ে ধরার মতো ভাসমান তৃণও পাচ্ছে না।

পূর্বেই বলেছি, বাংলাদেশ নামক ভূ খন্ডটির ইতিহাসে কোন দিন এই অঞ্চলের মানুষের সমস্যা চিহ্নিত হয়নি। সমস্যা চিহ্নিত না করে, সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা নিরুপণ না করে, সমস্যার অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ না করে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অবাস্তব।

আমি গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী জাতির, তথা বাংলাদেশের সমস্যাবলী চিহ্নিত করার এক দুঃসাহসিক প্রয়াস চালাচ্ছি। জাতির হাজারো সমস্যাকে আমি মৌলিক চারটি ভাগে ভাগ করেছি। এই চারটি মৌলিক ভাগ হলোঃ

১। রাজনৈতিক সমস্যা
২। প্রশাসনিক সমস্যা
৩। সামাজিক সমস্যা
৪। অর্থনৈতিক সমস্যা

www.pathagar.com

দেশ, জাতি ও ব্যক্তি যতো সব সমস্যায় আজ ভুগছে, সেই সকল সমস্যাই উপরোক্ত চারটি মৌলিক সমস্যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এমন কি দেশের কোন একটি এলাকায়ও যে সব স্থানীয় সমস্যা মানুষের জীবন জীবিকায় বাধা সৃষ্টি করছে, সেই সব বিশেষ বিশেষ সমস্যাও উপরোক্ত চারটি মৌলিক সমস্যারই কোন না কোন একটির শাখা

এই চারটি মৌলিক সমস্যার সমাধান না করে দেশটাকে, জাতিটাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নেয়া অসম্ভব। একটা রেলগাড়ী যেমন লাইনচ্যুত হয়ে গেলে আর এগুতে পারে না, আমাদের জাতিটাও এখন ঠিক সেই লাইনচ্যুত অবস্থায় উপনীত। লাইনচ্যুত রেলগাড়ীকে যেমন রেল লাইনের উপর পুনঃস্থাপন করে এগিয়ে নিতে হয়, আমাদের জাতিটাকেও এখন ঠিক তেমনি ভাবে একটা সুনির্দিষ্ট লাইনের উপর প্রতিষ্ঠিত করলে এর অগ্রযাত্রা সম্ভব হবে, তাছাড়া নয়।

আমি আশা করি, আমি বিশ্বাস করি, এই অভিমত কেবল একা আমারই নয়, সমগ্র জাতির প্রত্যেকটি মানুষ অন্তরের অন্তঃস্থলে এই অভিমতই পোষণ করেন।

জাতিটাকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার পথ পরিষ্কার করার জন্য আমি দেশের চারটি মৌলিক সমস্যার বিশ্লেষণ দিচ্ছি; সমস্যাগুলোর শাখা প্রশাখা তালিকাবদ্ধ করছি। আমার এই বিশ্লেষণই যে চূড়ান্ত, আমার প্রণীত তালিকায় যে প্রত্যেকটি মৌলিক সমস্যার সমস্ত শাখা প্রশাখাই স্থান পেয়ে গেছে, এমন দাবী আমি করিনা। বস্তুতঃ এক একটি মৌলিক সমস্যার আওতাধীন অসংখ্য ছোট বড় সমস্যা রয়ে গেছে, যেগুলো গণজীবনে বাধার সৃষ্টি করছে; মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়ে বিরাজ করছে।

তবে এক একটি মৌলিক সমস্যার সমাধান শুরু করে কিছুটা সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে ঐ মৌলিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত অঙ্গ প্রতঙ্গও প্রশমিত হতে শুরু করবে। একজন রোগীর বেলায় যেমন আসল রোগ চিহ্নিত করে তার চিকিৎসা শুরু করতে হয়, আসল রোগের চিকিৎসাই সর্বাগ্রে শুরু করতে হয়; আসল রোগ সারতে শুরু হলে, সেই রোগের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গও রোগ মুক্ত হতে শুরু করে। আসল রোগ সেরে গেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেরে উঠে। হয়তো বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এখানে সেখানে অল্প বিস্তর সম্পূরক চিকিৎসার দরকার হয়। একজন রোগাগ্রস্থ মানুষের রোগমুক্তির বেলায় যা খাটে, একটি জাতির কঠিন সমস্যা নামক ব্যাধির বেলায়ও সে কথাই খাটে। ব্যক্তির বেলায় যেমন হৃদরোগ, জন্ডিস, আলসার, টাইফয়েড ইত্যাদি কঠিন ব্যাধির জটিল চিকিৎসার দরকার হয়, একটি জাতির বেলায়ও তেমনি কঠিন রাজনৈতিক ব্যাধি, প্রশাসনিক ব্যাধি, সামাজিক ব্যাধি ও অর্থনৈতিক ব্যাধির জটিল চিকিৎসার আবশ্যক। সেই জটিল চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই ব্যাধির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করার এই প্রয়াস।

নিম্নে দেশের চারটি সমস্যাও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লিপিবদ্ধ করলামঃ

www.pathagar.com

৩:১ ঃ রাজনৈতিক সমস্যা

৩ঃ১ঃ০১ জাতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতবাদ।

৩ঃ১ঃ০২ যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অভূতপূর্ব ত্যাগ তিতীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো, সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অনুপ্রেরণার দুঃখজনক অবক্ষয়।

৩ঃ১ঃ০৩ স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক দেশের যে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণীত হয়েছিলো, সেই সর্বসম্মত সংবিধানকে পর্যায়ক্রমে বিকৃত করে একটি বিতর্কিত দলিলে রূপান্তর।

৩ঃ১ঃ০৪ আদর্শ ভিত্তিক, কর্মসূচী ভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তে গোষ্ঠী ভিত্তিক, ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক এবং বিদেশী মদদপুষ্ট রাজনীতির প্রচলন।

৩ঃ১ঃ০৫ রাজনৈতিক দল গঠনের অবাধ সুযোগ করে দেয়ায় অসংখ্য নাম সর্বস্ব জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ।

৩ঃ১ঃ০৬ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন' কে পদদলিত করে "ভোটার বিহীন নির্বাচন" "বাক্স ভর্তির নির্বাচন" "মিডিয়া ক্যুর নির্বাচন" ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের প্রাণের দাবী "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে" প্রহসনে পরিণত।

৩ঃ১ঃ০৭ নির্বাচন উপলক্ষ্যে অর্থের সীমাহীন ছড়াছড়ির মাধ্যমে মানুষকে অর্থ গৃধনু করে তোলা।

৩ঃ১ঃ০৮ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য দল বা ব্যক্তি কর্তৃক মাস্তান বাহিনী পুষে ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণকে নির্বাচন বিমুখী করে তোলা।

৩ঃ১ঃ০৯ দলীয় রাজনীতির স্বার্থে কিশোর কিশোরীসহ গোটা ছাত্র সমাজকে অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের দিকে ধাবিত করে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করা।

৩ঃ১ঃ১০ ভ্রান্ত স্বার্থান্ধ ও নৈতিকতাবিহীন রাজনীতির কারণে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণমনে গভীর সন্দেহ ও হতাশার সৃষ্টি এবং দেশপ্রেমের চরম অবক্ষয়।

৩ঃ১ঃ১১ রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী জঘন্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের দন্ডাদেশ মওকুফ করে সন্ত্রাসের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান।

৩ঃ১ঃ১২ নতজানু পররাষ্ট্র নীতির জন্য দেশের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে গণমনে গভীর সন্দেহ।

www.pathagar.com

৩·২ঃ প্রশাসনিক সমস্যা

৩ঃ২ঃ০১ সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের জবাবদিহির চিরাচরিত নিয়মাবলী বাস্তবায়ন না করায় তাদের বেপরোয়া ও গণবিরোধী মনোবৃত্তির বিকাশ লাভ।

৩ঃ২ঃ০২ প্রশাসনের সর্বস্তরে সিদ্ধান্তহীনতা, গতিহীনতা, স্বজনপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা।

৩ঃ২ঃ০৩ সর্বস্তরে সর্বগ্রাসী দুর্নীতির নির্লজ্জ ব্যাপকতায় গোটা প্রশাসনের উপর জনগণের চরম অনাস্থা।

৩ঃ২ঃ০৪ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে "ঘুণে ধরা, ঔপনিবেশিক, পাকিস্তানী" ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে দলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থে "ভেঙ্গে ফেলে ঢেলে সাজানো" স্লোগান দিয়ে লন্ডভন্ড করে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রবণতা।

৩ঃ২ঃ০৫ বিচার ব্যবস্থার উপরও জনগণের ক্রমাগত আস্থাহীনতা।

৩ঃ২ঃ০৬ দেওয়ানী আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হতে সুদীর্ঘকাল বিলম্ব হওয়ায় সামাজিক জটিলতা ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বৃদ্ধি। এমন দেওয়ানী মামলাও আছে, যা বংশানুক্রমে চলছে আর বিবদমান দলের হানাহানিও অব্যাহত আছে।

৩ঃ২ঃ০৭ ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জনগণের অভিযোগের উপর সিদ্ধান্তহীনতার জন্য হানাহানির বৃদ্ধি লাভ। এমনো অভিযোগ আছে, যার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ২০/৩০/৪০ বছর পর্যন্ত ঝুলছে। একটু মনোযোগ দিলে সিদ্ধান্ত নিতে দুচার ঘন্টার বেশী সময় লাগতে পারেনা।

৩ঃ২ঃ০৮ সৎ পথে অন্যায়ের প্রতিকার নেই বলে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস।

৩ঃ২ঃ০৯ অর্থ দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ক্রয় করে নেয়া অতি সহজ বলে মানুষের ক্রমবর্ধমান ধারণা।

৩ঃ২ঃ১০ জানমালের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার জন্য গণমনে সার্বক্ষণিক আতংক।

৩ঃ২ঃ১১ নৃশংস খুন, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ডাকাতিসহ নিষ্ঠুর হত্যা, দুর্ধর্ষ রাহাজানি, প্রকাশ্য দিবালোকে দুঃসাহসিক হাইজ্যাক, প্রতিরোধের চেষ্টা করলে নির্ঘাত খুন, বল প্রয়োগে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন , এসিড নিক্ষেপ করে মহিলাদের চেহারা চিরতরে বিকৃত করে দেয়ার মতো জঘন্য অপরাধ ইত্যাদির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

৩ঃ২ঃ১২ রাজপথ, রেলপথ, নৌপথে যখন তখন দলবদ্ধ ডাকাতদের আক্রমণ, রাতে দুরপাল্লার রাজপথ অবরোধ করে দু'দিক থেকে আগত সকল প্রকার যান বাহনে ঘন্টার পর ঘন্টা দুঃসাহসিক ডাকাতি ও যাত্রীগণকে মারপিট।

৩ঃ২ঃ১৩ জঘন্য অপরাধের অপ্রতুল তদন্ত ব্যবস্থা, অপরাধ তদন্তে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, কোন কোন ক্ষেত্রে থানায় জঘন্য অপরাধকে মামুলি অপরাধ বানিয়ে নেয়ার প্রবণতা।

www.pathagar.com

৩ঃ২ঃ১৪ সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের সীমাহীন অর্থ লিপ্সা, অমার্জনীয় অবহেলা ও ঝুকিপূর্ণ বেপরোয়া কার্যকলাপের জন্য অহরহ রাজপথ নৌপথ ও রেলপথে মারাত্মক দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোকের আকস্মিক মৃত্যু বা সারা জীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ।

৩ঃ২ঃ১৫ ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থাহীনতার জন্য গণবিচার নামক প্রহসনের মাধ্যমে উন্মত্ত জনতা কর্তৃক প্রকাশ্যে নরহত্যা, চোখ উপড়ানো ইত্যাদি পৈশাচিক ঘটনার ক্রমবর্ধমান পুনরাবৃত্তি।

৩ঃ২ঃ১৬ নারী নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে অবাঞ্ছিত জ্বালাতন, এ সবের কারণে পারিবারিক সৌহার্দ্যের অভাব বা পারিবারিক অশান্তি, যার ফলে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি।

৩ঃ২ঃ১৭ প্রায় প্রত্যহ দেশের কোন না কোন স্থানে গণ বিক্ষোভের কারণে রাজপথ অবরোধ, খেয়াঘাট অবরোধ, রেলগাড়ী, লঞ্চ চলাচলে বাধা, স্থানীয় হরতাল, স্কুল কলেজে ধর্মঘট, উপজেলা সদরে বিক্ষোভ ইত্যাদির জন্য সাধারণ মানুষের জীবিকা অর্জনে বাধার সৃষ্টি এবং লক্ষ লক্ষ কর্মঘন্টা বিনষ্ট।

৩ঃ২ঃ১৮ একদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে আর অন্যদিকে স্কুল কলেজে শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। এমনো সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় আছে যেখানে দীর্ঘ দিন ধরে সরকার অনুমোদিত শিক্ষকের অর্ধেক পদই খালি, যার জন্য ছাত্ররা ধর্মঘট পর্যন্ত করেও কোন লাভ হয়নি; এমনো রাষ্ট্রায়ত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যার শিক্ষকেরা দু'বছর ধরে বেতনই পাচ্ছেন না।

৩ঃ২ঃ১৯ ঢাকা মহানগরীসহ প্রায় প্রত্যেক শহরে যখন তখন কোন না কোন সভা, উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে অতিব্যস্ত জনপথের উপর মঞ্চ তৈরী করে, সামিয়ানা খাটিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নাগরিকদের সাধারণ জীবন যাত্রা অবলীলাক্রমে বাধাগ্রস্থ।

৩ঃ২ঃ২০ প্রশাসনে চরম বিশৃংখলা, কর্মকর্তাদের মধ্যে আইন সঙ্গত আদেশ অমান্য করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীগণ পর্যন্ত দাবী আদায়ের জন্য বিক্ষোভের পথ অবলম্বন, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক মাসের পর মাস ফাইল আটকিয়ে রেখে ভুক্তভোগীদের হয়রানী করা, এমন কি ভুক্তভোগীরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে অভিযোগের দীর্ঘদিন পরও মাননীয় মন্ত্রী ফাইল উদ্ধার করতে অপারগতা প্রকাশ করার মতো নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

www.pathagar.com

৩·৩ ঃ সামাজিক সমস্যা

৩ঃ৩ঃ০১ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মানুষের ধ্যান–ধারণা, চিন্তা চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক বন্ধন, শৃংখলা ও অনুশাসন গড়ে উঠেছিলো, সেই সমাজ ব্যবস্থা ক্রমাগত অবক্ষয়ের মাধ্যমে অপমৃত্যুর মুখোমুখি।

৩ঃ৩ঃ০২ মানবিক মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয়ের কারণে ভালমন্দ, ন্যায়–অন্যায়, কর্তব্য দায়িত্ব, হালাল–হারাম, দয়া–মায়া, গুণীজনের সমাদর, গুরুজনের অনুসরণ ইত্যাদির অবলুপ্তি।

৩ঃ৩ঃ০৩ সমাজে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, উশৃংখলতা, বেপরোয়া মনোভাব, নিষ্ঠুরতা, অপরাধ প্রবণতার আশংকাজনক বৃদ্ধি।

৩ঃ৩ঃ০৪ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মাদকাসক্তির উদ্বেগজনক বৃদ্ধির কারণে অসংখ্য যুবক পথভ্রষ্ট হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে পরিবারের উপর অবাঞ্ছিত বোঝা হিসাবে অবস্থান।

৩ঃ৩ঃ০৫ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে জ্ঞানার্জনের প্রতি অনীহা, নকল করে পরীক্ষায় পাস করার জঘন্য প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি।

৩ঃ৩ঃ০৬ শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বজনীন দুর্নীতি, শিশু কিশোর ছাত্র–ছাত্রীও জানে যে তাদের শিক্ষকগণ দুর্নীতির মাধ্যমে চাকুরী পান, দুর্নীতির মাধ্যমে সুবিধাজনক স্থানে বদলী নেন এবং বেতন পাওয়ার জন্য ঘুষ দেন।

৩ঃ৩ঃ০৭ উচ্চস্তরের শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের কারণে টাকার ছড়াছড়ি, আগ্নেয়াস্ত্রের সরবরাহ ও অস্ত্র যুদ্ধে খুনাখুনির প্রচলন।

৩ঃ৩ঃ০৮ পারিবারিক সৌহার্দ্যের দ্রুত অবক্ষয়ের জন্য নারী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, স্বামী জ্বালাতন, এমন কি স্বামী হত্যা ও নারীদের আত্মহত্যার আশংকাজনক বৃদ্ধি।

৩ঃ৩ঃ০৯ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দীর্ঘকাল অমীমাংসিতভাবে ঝুলে থাকার জন্য বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে, অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে, কলহ–দ্বন্দ্ব বিরাজ করায় সামাজিক অশান্তি, এবং বহুক্ষেত্রে বংশ পরম্পরায় প্রতিশোধমূলক হাঙ্গামা–হত্যা।

৩ঃ৩ঃ১০ দেশে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক, হিংস্র মনোবৃত্তির প্রসার, যার পরিণতিতে প্রতিপক্ষকে নারকীয়ভাবে নির্বংশ করার প্রবণতা।

৩ঃ৩ঃ১১ সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সুদীর্ঘদিন কারাগারে রাখাকালীন তাদের মনোবৃত্তি পরিবর্তনের, তাদেরকে দক্ষ পেশাজীবি হিসাবে গড়ে তোলার ও তাদের পূনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাদের আবার অপরাধের পথে ফিরে যাওয়া।

www.pathagar.com

৩ঃ৩ঃ১২ সেসন জট নামক এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাধি দেশের উচ্চ শিক্ষাকে পঙ্গু করে ফেলেছে, যার জন্য চার বছরের কোর্স আট বছরেও শেষ হয়না; এই ব্যাধি উচ্চ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের হতাশাগ্রস্থ করে ফেলেছে, যে জন্য তাদের একাংশ ক্যাম্পাসে টাকার ছড়াছড়ি ও অস্ত্রের ঝনঝনানীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়, আর অন্য এক অংশ আলস্য হতাশার জ্বালায় মাদক দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩ঃ৩ঃ১৩ একদিকে ২০০০ সালের মধ্যে সারা জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সরকারী ঘোষণা আর অন্যদিকে সর্বস্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষায় চরম অবহেলা জাতিকে শিক্ষাবিমুখী করে তুলেছে।

৩ঃ৩ঃ১৪ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রমে মানুষের কষ্টার্জিত ও রাষ্ট্রের ভিক্ষালব্ধ কোটি কোটি টাকার অপচয়; "ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট" স্লোগানের পাশাপাশি লক্ষ কোটি দম্পতির গড় পড়তা অর্ধডজনেরও বেশী ছেলেমেয়ের ক্রমাগত জন্মলাভ।

৩ঃ৩ঃ১৫ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চরম অবনতি, হাসপাতালের জরুরী বিভাগে চরম গাফিলতি, অপরিচ্ছন্নতা ও দুর্নীতির কারণে দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত, মাস্তানদের গুলিবিদ্ধ মুমূর্ষ ব্যক্তিদের আর্তনাদ, মৃত্যুবরণ বা চিরতরে পঙ্গু হওয়ার দৈনন্দিন ঘটনা।

৩ঃ৩ঃ১৬ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে খাতাপত্রে অর্ধডজন ডাক্তারের অবস্থান দেখানো হলেও কার্যতঃ পালা করে মাত্র দু'একজন ডাক্তারের বাস্তব উপস্থিতি, বাদবাকীরা জেলা সদর বা দেশের রাজধানীতে প্র্যাইভেট প্রাকটিস করে, মাসান্তে উপজেলায় গিয়ে বেতন গ্রহণ ও পালা বদলানো।

৩ঃ৩ঃ১৭ বিগত কয়েক বছরে চিকিৎসার মান এতোই নীনে নেমে গেছে যে, একটু বিত্তশালী রোগীরা এখন দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসার উপর আস্থাহীন হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যাংককমুখী হয়ে গেছেন। এক ডজনের ও বেশী অতি উচ্চমানের সুবৃহৎ হাসপাতালের অধিকারী ব্যাংকক এখন বাংলাদেশের চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেছে।

৩ঃ৩ঃ১৮ সর্বস্তরে সর্বগ্রাসী নৈরাজ্যের জন্য মানুষের কর্মস্পৃহা ও কর্মশক্তি শিথিল হয়ে মানুষ, বিশেষ করে দারিদ্রের আর্ন্তজাতিক সীমারেখার নিম্নে অবস্থানকারী মানুষ, যে কোন সুযোগে কর্মবিরতি পছন্দ করে এবং হরতালের আহবান হলে সেটাকে বিনোদনের সুযোগ হিসাবে লুফে নেয়। হরতালের কারণ জানবার চিন্তাও করে না, এর পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামায় না।

৩ঃ৩ঃ১৯ সারা দেশে পেশাগত ভিক্ষুকদের কোন পরিসংখ্যান নেই। কচি শিশু থেকে শুরু করে ৮০/৯০ বছরের বৃদ্ধ নরনারী ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে। এই বিশাল ভিক্ষুক গোষ্ঠির মধ্যে কর্মক্ষম নরনারীর সংখ্যা যথেষ্ট। কচি শিশুদের ক্রয় করে না হয় চুরি করে বিকলাংগ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হচ্ছে।

৩ঃ৩ঃ২০ পেশাগত ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়াও মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, ক্লাব, সংগঠন ইত্যাদির নামে চাঁদা আদায় করে আত্মসাৎ করা ভদ্রবেশী ভিক্ষার এক সহজ পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩ঃ৩ঃ২১ দেশ যতোই আন্তর্জাতিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে, ভিক্ষার মনোবৃত্তি জাতির মধ্যে ততোই প্রসার লাভ করছে। বিদেশে আমাদের সোনার বাংলার পরিচিতি হলো ভিক্ষুকের দেশ, মিসকিনের দেশ।

৩ঃ৩ঃ২২ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রদেশ, বিশ্বের দরিদ্রতম কয়েক কোটি মানুষের আবাসভূমি, আমাদের এই দেশ আবার অপচয়ের দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্থান লাভ করার যোগ্য। এমন কিছু সামাজিক প্রথা বিরাজ করছে যেগুলো মানুষকে অবৈধ আয়ের সন্ধান করতে বাধ্য করে। জন্ম উপলক্ষে, জন্ম বার্ষিকীতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, মৃত্যু উপলক্ষ্যে, মৃত্যু বার্ষিকীতে ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান, বিবাহ উপলক্ষে মাত্রাতিরিক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক শানশওকতের প্রদর্শনী, অতিমূল্যবান স্বর্ণালংকারের প্রতি অপরিসীম আসক্তি ইত্যাদির জন্য গোটাদেশে যে পরিমাণ অপচয় হয় তার কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও এগুলো যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তশালী লক্ষ কোটি পরিবারের অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণ তা সন্দেহাতীত।

www.pathagar.com

৩·৪ ঃ অর্থনৈতিক সমস্যা

৩ঃ৪ঃ০১ এগার কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ এক কোটি গৃহহীন, পাঁচ কোটি ভূমিহীন, তিন কোটি কর্মহীন, আর এসব মিলিয়ে ছয় কোটি লোক অনাহারে, অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ক্রমাগত কর্মশক্তি, এমনকি জীবনীশক্তিও হারিয়ে জাতির উপর এক অসহনীয় বোঝা হয়ে গেছে।

৩ঃ৪ঃ০২ সরকারী পরিসংখ্যান মতে দেশের মানুষের গড়পড়তা মাথা পিছু আয় ১৫০ ডলার বা ৫০০০ টাকার মতো। দারিদ্রের আন্তর্জাতিক নিম্নতম সীমারেখারও নিম্নে অবস্থানরত আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৫০ ডলার বা ১৭০০ টাকার উর্দ্ধে নয়। এবং দরিদ্রতম অন্ততঃ এক কোটি মানুষের বার্ষিক গড়পরতা মাথা পিছু আয় ৩০ ডলার বা ১০২০ টাকার উর্দ্ধে নয়। নির্দ্বিধায় বলা যায় বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির আবাসভূমি বাংলাদেশ এই সোনার বাংলাদেশে অন্ততঃ এক কোটি লোকের গড়পরতা দৈনিক ৩·৫০ (সাড়ে তিন) টাকা আয়ের উপর বেঁচে আছে।

৩ঃ৪ঃ০৩ বাৎসরিক গড়পরতা খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৭ লক্ষ টন ধরা হয়। কিন্তু এর মধ্যে কয়েক বৎসর পর পর যেসব সর্বনাশী প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, সেটা ধরা হয় না। অর্থাৎ বার্ষিক গড়পরতা খাদ্য ঘাটতি আরো বেশী।

৩ঃ৪ঃ০৪ দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণের প্রতিশ্রুতিও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এবং বছর বছর খাদ্য উৎপাদনে কিছুটা অগ্রগতি হলেও দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।

৩ঃ৪ঃ০৫ সরকার ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কর্তৃক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমিত বলে স্বীকার করলেও জাতির মাথাপিছু আয় বাড়ানোর বিকল্প চিন্তা–ভাবনা পরিকল্পনা অনুপস্থিত।

৩ঃ৪ঃ০৬ দেশের মৌলিক সম্পদ 'ভূমির' যথেচ্ছ অপচয়, "ভূমির' সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারে" এর কোন চিন্তা–ভাবনা পরিকল্পনা নেই।

৩ঃ৪ঃ০৭ চারদশক ধরে 'বিনিময় সম্পত্তি' ও দুই দশক ধরে 'অর্পিত সম্পত্তি' উদ্ভুত সমস্যাগুলোকে ঝুলিয়ে রেখে একদিকে এই সব ভূমির অপচয় এবং অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মামলায় যুগ–যুগ ধরে অপরিসীম অর্থ ব্যয়।

৩ঃ৪ঃ০৮ ভূমি প্রশাসনে জটিলতা ও সিদ্ধান্তহীনতার জন্য কোর্ট কাছারীতে হাজিরা ও ধর্ণা দিতে গড়পড়তা দৈনিক পঞ্চাশ লক্ষ কর্ম ঘন্টার অপচয়।

৩ঃ৪ঃ০৯ প্রাকৃতিক সম্পদের সুপরিকল্পিত আহরণ ও সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা না থাকায় দেশ প্রচুর কর্মসংস্থান ও আর্থিক আয় থেকে বঞ্চিত।

৩ঃ৪ঃ১০ সরকারী পরিসংখ্যান মতে দেশে প্রায় ২৪ লক্ষ একর অনাবদী ভূমি পড়ে আছে এই অনাবাদী ভূমি চাষাবাদে আনার কার্যক্রম এখনো গ্রহণ করা

www.pathagar.com

৩ঃ৪ঃ১১ খাস ভূমি বিতরণের জন্য গুচ্ছ গ্রাম নামক যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে এ কার্যক্রম অপরিবর্তিত থাকলে দেশের সমূহ খাসভূমি বিতরণ করার পর ভূমিহীনদের শতকরা বড়জোর ২০ ভাগ লোক ভূমির মালিক হবে, আর বাকী শতকরা ৮০ ভাগ ভূমিহীন চিরতরে ভূমির মালিক হবার একটা ক্ষীণ আশা থেকেও বঞ্চিত হবে।

৩ঃ৪ঃ১২ বন বিভাগের আওতাভুক্ত লক্ষ লক্ষ একর ভূমির অমার্জনীয় অপব্যবহার।

৩ঃ৪ঃ১৩ সরকারী বিভিন্ন বিভাগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের আওতাধীন লক্ষ লক্ষ একর ভূমির দুঃখজনক অপচয়।

৩ঃ৪ঃ১৪ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা হলেও বর্ষাকালের পর নদ–নদী হাওর–বাওর, খাল–বিল এবং সর্ব প্রকার জলাশয়ে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে খাদ্য উৎপাদনে সেই পানি ব্যবহারের কর্মসূচী অনুপস্থিত।

৩ঃ৪ঃ১৫ বন্যা, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত এড়িয়ে পরিকল্পিত চাষাবাদের বিকল্প ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

৩ঃ৪ঃ১৬ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণ, জনগণকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার অপর্যাপ্ত প্রতিবিধান।

৩ঃ৪ঃ১৭ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল বর্ষাকালীন কৃষিকর্ম প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বার বার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও, বিকল্প হিসাবে শুকনা মওসুমে কৃষিকাজ সম্প্রসারণের কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেই।

৩ঃ৪ঃ১৮ রাসায়নিক সার ও কীট নাশক প্রয়োগ করে দেশের অনেক এলাকায় উৎপাদনের হার উন্নীত করা হলেও দেশের বহু এলাকায় এখনো রাসায়নিক সার প্রয়োগ আরম্ভই হয়নি। কৃষকেরা এখনো রাসায়নিক সার সম্বন্ধে কুসংস্কারে ডুবে আছেন, সার প্রয়োগ পদ্ধতি শিখেননি, কীটনাশক প্রয়োগের ব্যবস্থা এতোই অপ্রতুল যে, হঠাৎ করে পোকার আক্রমণে এক একটি এলাকার কোটি কোটি টাকার ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩ঃ৪ঃ১৯ গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে পানি তুলে সীমিত এলাকায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেলেও ভূগর্ভে পানির অপ্রতুলতা, উত্তোলন কার্যক্রমের ব্যয়বহুলতা, ও নলকূপ প্রায়শঃই অকেজো থাকার জন্য চাষাবাদের অনিশ্চয়তা।

৩ঃ৪ঃ২০ দেশের গো–সম্পদের গুণগত মানগত ও সংখ্যাগত ক্রমাবনতির জন্য কৃষিকাজ ব্যাহত ও খাঁটি দুধ দুষ্প্রাপ্য। গো–মাংসের ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত থেকে দৈনিক হাজার হাজার গরু চোরাই পথে আসছে আর দুধের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বছরে কোটি কোটি টাকার গুড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

৩ঃ৪ঃ২১ আমদানীকৃত গুড়ো দুধের বিশুদ্ধতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ এবং গুড়ো দুধে ক্ষতিকর তেজস্ক্রীয়তা প্রমাণিত হওয়ায় জনমনে আতংক।

৩ঃ৪ঃ২২ পশু সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অতিমূল্যবান চামড়া সংগ্রহের, রক্ষণাবেক্ষণের ও পাকা করার উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় যে স্থলে ১৫/২০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব ছিল সে স্থলে ১৩/১৪ কোটি ডলারের বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

৩ঃ৪ঃ২৩ গবাদি পশু থেকে প্রাপ্ত অতি উৎকৃষ্ট জৈব সার গোবরের অপচয়।

৩ঃ৪ঃ২৪ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগী উৎপাদন সারা বিশ্বে, এমন কি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশেও এতো প্রসার লাভ করেছে যে, মুরগীর মাংস ও ডিম অন্য আমিষ খাদ্যের চেয়ে অনেক সহজলভ্য ও সস্তা, অথচ, আমাদের দেশে এখনো এই দুটি উৎকৃষ্ট খাদ্য অপ্রতুল ও মূল্যের দিক দিয়ে সাধারণের ধরা ছোয়ার বাইরে।

৩ঃ৪ঃ২৫ দেশের প্রধানতম রপ্তানী সম্পদ 'পাট' এর অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক বাজার এবং পাটকলগুলোর ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি ও বিভিন্ন জটিলতার কারণে পাট চাষীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

৩ঃ৪ঃ২৬ প্রচুর সম্ভবানাময় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের অপ্রতুল ব্যবস্থা। সেই মান্দাতার আমলের "জাল যার, জলা তার" নীতি অনুসরণ করায় মৎস্য চাষের দিকে মনোনিবেশ না করে মৎস্যজীবীরা অবাধে মৎস্য নিধন করছেন, মৎস্য উৎপাদনের দিকে এগুচ্ছেন না। তাঁরা "মৎস্যজীবী" থাকছেন, "মৎস্যচাষী" হচ্ছেন না।

৩ঃ৪ঃ২৭ মৎস্য চাষে দেশের কোন কোন স্থানে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও সারাদেশে এখন পর্যন্ত মৎস্য চাষের সাড়া জাগানো আগ্রহ উৎসাহের অভাব।

৩ঃ৪ঃ২৮ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, জিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী, আদমজী জুট মিলের মতো প্রায় সকল বৃহৎ শিল্পই বছরে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়ে জাতির উপর অর্থনৈতিক বোঝা হিসাবে চেপে আছে। এসব লোকসানমুখী শিল্পকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অপ্রতুল প্রচেষ্টা।

৩ঃ৪ঃ২৯ দেশের প্রায় দুই হাজার রুগ্ন ক্ষুদ্রশিল্প সুদীর্ঘকাল থেকে অচল অবস্থায় পড়ে থাকায় অপূরণীয় ক্ষতি এবং ঐসব শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেকারত্ব বরণ।

৩ঃ৪ঃ৩০ যথেষ্ট পরিমাণ জামানত ছাড়াই শিল্প স্থাপনের জন্য বিরাট অংকের ঋণ নিয়ে মূলধন আত্মসাৎ করার প্রবণতা।

৩ঃ৪ঃ৩১ শিল্প খাতে বাংলাদেশের লজ্জাকর ব্যর্থতার কার্যকারণ নির্ধারণ, দায়-দায়িত্ব নিরূপণ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা।

www.pathagar.com

৩ঃ৪ঃ৩২ কোটি কোটি নারীপুরুষের সর্বকালীন বা খণ্ডকালীন বেকারত্ব ঘুচানোর পরিকল্পনার অনুপস্থিতি, ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতার উদ্বেগজনক বৃদ্ধি, গ্রামাঞ্চল থেকে একশ্রেণীর বেকার নারী পুরুষের রাজধানীমুখী মিছিল, এবং রাজধানীর উপর ভিক্ষুকের ক্রমবর্ধমান উপদ্রব।

৩ঃ৪ঃ৩৩ সার্বিকভাবে মানুষের অনিষ্টকারী বিভিন্ন প্রজাতির লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষকে সযত্নে লালন করে একদিকে প্রচুর পরিমাণ ভূমির অপচয়, আর অন্যদিকে এই অনিষ্টকারী বট বৃক্ষের বীজ দেশের সর্বত্র পাকা দালানের উপর অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে দালানে ফাটল ধরে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি।

৩ঃ৪ঃ৩৪ প্রশংসনীয় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে শতাব্দির পুরোনো, বৃদ্ধ, জীর্ণ এক একটি গাছ কেটে সেই স্থলে একাধিক নূতন ফলের চারা লাগানোর কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ স্থান পায়নি এবং বৃক্ষ কর্তন না করে কেবল এক তরফা বৃক্ষ রোপণের অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি উপেক্ষিত।

৩ঃ৪ঃ৩৫ দেশের উত্তরাঞ্চলে ঐতিহাসিক বরেন্দ্র এলাকায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে দেশী বিদেশী যে সব বৃক্ষরাজী রোপণ করা হয়েছিল, রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতির জন্য সেই সুপ্রসারিত বহু ব্যয়ী প্রকল্পের অপমৃত্যুর সম্ভাবনা।

৩ঃ৪ঃ৩৬ প্রশংসনীয় বাৎসরিক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীতে ফলগাছের পরিবর্তে উচ্চমানের কাঠের চারা ও অনর্থকরী বিদেশী গাছের চারা গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত পাঠিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ও নগদ অর্থকরী ফল উৎপাদনকে নিরুৎসাহীত করা।

৩ঃ৪ঃ৩৭ বনবিভাগের আওতাধীন ও পাহারাধীন যে সব বনাঞ্চল রহস্যজনকভাবে উজাড় হয়ে গেছে, সেই সব এলাকায় প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যে নূতন বনায়ন কার্যক্রম চালু হয়েছে সেই কার্যক্রম ফলবান বৃক্ষের পরিবর্তে ফলহীন বৃক্ষ রোপণের ভ্রান্ত প্রবণতা।

৩ঃ৪ঃ৩৮ ঢাকা মহানগরীর শ্রীবৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে দেশীয় সহজ উৎপাদনশীল ফলগাছের পরিবর্তে বিদেশী বৃক্ষ রোপণের প্রবণতা, যার জন্য যে কোন বিদেশী আগন্তুক বিমান বন্দরে অবতরণ করে শহরের কেন্দ্র স্থল পর্যন্ত আসতে এবং শহরের উন্নত এলাকাগুলো পরিভ্রমণ করতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গাছপালার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ করবেন ইউরোপ আমেরিকার সুপরিচিত গাছপালা।

৩ঃ৪ঃ৩৯ বনায়ন পরিকল্পনায় ফলবান বৃক্ষকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থনৈতিক অকাট্যযুক্তি গ্রহণে রহস্যজনক বিলম্ব।

৩ঃ৪ঃ৪০ বাৎসরিক এবং স্বল্পস্থায়ী ফলবান উদ্ভিদ, যেমন কলা, পেপে, আনারস ইত্যাদির চাষ সম্প্রসারণের অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টা, যদিও এসব ফলের চাষ অন্য যে কোন চাষের চেয়ে অনেক বেশী লাভজনক।

www.pathagar.com

৩ঃ৪ঃ৪১ অতি স্বল্প মেয়াদী এবং সহজ-উৎপাদনশীল খাদ্যদ্রব্য, যেমন গোল আলু, মিঠা আলু, টমেটো, ভুট্টা, সয়াবীন, কাউন, চীনা, বজরা, তরমুজ, চীনা-বাদাম ইত্যাদির উৎপাদন বাড়ানোর ও দেশব্যাপী বিতরণের অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টা।

৩ঃ৪ঃ৪২ আদা, হলুদ, পিয়াজ, রসুন, এমন কি মরিচ ইত্যাদি মসলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে রপ্তানী করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র উৎপাদনে উৎসাহ, প্রক্রিয়াজাত করণ ও বাজারজাত করণের অভাবে উৎপাদন এতোই কম হয় যে প্রায় বছরই এসব আমদানী করতে হয়।

৩ঃ৪ঃ৪৩ সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই মহা আড়ম্বতার ছড়াছড়ি, শানশওকত প্রদর্শনীর অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা এবং প্রচুর অর্থের অপচয়।

৩ঃ৪ঃ৪৪ সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে, অপরিসীম অবাঞ্ছিত অপচয়।

৩ঃ৪ঃ৪৫ বিশ্বের দরিদ্রতম এই দেশে অঢেল স্বর্ণালংকারের সমাগম এবং ব্যবহারের প্রদর্শনী ভারসাম্যহীন অর্থনীতিরই পরিপুরক।

৩ঃ৪ঃ৪৬ সর্বোপরি কোটি কোটি সর্বকালীন বা খন্ডকালীন বেকার নারী পুরুষের কর্ম সংস্থানের কোন পরিকল্পনাই নেই।

www.pathagar.com

৩.৫ ঃ বাংলাদেশের সমস্যা পরিক্রমা

পূর্বেই বলেছি, এই দুর্ভাগা দেশের নিপীড়িত মানুষের সমস্যাবলী কোনদিনই চিহ্নিত হয়নি। পুথি পুস্তকে মানুষের সমস্যাবলীর তালিকা খুঁজে পাইনি। আরো বলেছি, সমস্যা চিহ্নিত না করে সমস্যা সমাধানের কোন প্রচেষ্টাই বাস্তবধর্মী হতে পারে না।

যেহেতু এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্যই হলো চির-বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত এগার কোটি মানুষের সমস্যা সমাধানের একটি রূপরেখা, একটি নীল-নকশা তৈরী করে জাতিকে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এবং বিশেষ করে ক্ষমতাশীল সরকারকে উপহার দেয়া, সেই হেতু এই চিরবঞ্চিত নির্যাতিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠির সমস্যাবলী চিহ্নিত করার দুঃসাহসী কাজে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আমি জানি উপরের চারটি তালিকায় দেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে সমস্যাবলী স্থান পেয়েছে তা অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যে কোন পাঠকই একটু ধৈর্য ধরে এই তালিকাগুলো পাঠ করলে হয়ত প্রত্যেকটি তালিকাই সম্প্রসারণের চিন্তা করবেন। কোন সহৃদয় পাঠক যদি তার সুচিন্তিত অভিমত পাঠান, তাহলে যথাসময়ে সেটা পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হবে।

চিহ্নিত করা সমস্যাগুলোর উপর এখন আমরা একটু গভীর দৃষ্টিপাত করবো।

www.pathagar.com

৪ ঃ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান

রাজনীতির স্থান সকল নীতির উর্দ্ধে। রাজনীতিকে রাজার নীতি বলুন, রাষ্ট্রীয় নীতি বলুন, দেশের গণমানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করার নীতি বলুন, আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের নীতিই বলুন, রাজনীতির স্থান সকল নীতির উর্দ্ধে। রাজনীতি অন্য সকল নীতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক। রাজনীতি অন্য যে কোন নীতিকে শক্তিশালী করতে পারে, আবার ধ্বংসও করতে পারে। রাজনীতি জাতিকে সুসংহত করতে পারে, ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ভিত সুদৃঢ় করতে পারে। আবার এই রাজনীতিই জাতির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে হানাহানির সূত্রপাত ঘটাতে পারে, জাতীয় ঐক্য খান খান করে ধ্বংস করে দিতে পারে। ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলকে ভেঙ্গে চুরমার করে নামসর্বস্ব দল সৃষ্টির সুযোগ দিয়ে গোটা জাতিটাকে হাস্যাস্পদ করতে পারে। সর্বোপরি দুর্নীতির বীজ বপন করে, নির্বাচনে প্রকাশ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে গোটা জাতিটাকেই দুর্নীতিবাজ করে তুলতে পারে।

এই জন্যই যে দেশের রাজনীতি যতো সৎ সুষ্ঠ সুন্দর ন্যায় নীতি ভিত্তিক গণকল্যাণ মুখী, সেদেশই ততো বেশী উন্নত, গতিশীল; সেই দেশের মানুষই ততোবেশী শান্তি–শৃংখলা উপভোগ করে এবং আত্মোন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করার সুযোগ পায়।

পক্ষান্তরে, যে দেশের রাজনীতি যতোবেশী অসৎ দুর্বল, যতোবেশী আত্মকেন্দ্রীক, যতোবেশী পংকিল, সেই দেশ ততো বেশী অশান্তি অস্থিরতায় ভোগে। আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেয় সর্বস্তরে বিশৃংখলা।

বাংলাদেশ আজ যে বিশৃংখলা, অরাজকতা, নৈরাজ্যের জন্যে রসাতলে গেছে, তার শুরু হয় ১৯৪৭ সালের স্বাধীন পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে। স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে দেশের রাজনীতির মূল গতিধারায় এমন অভাবনীয় অগণতান্ত্রিক পরিবর্তন এসে যায় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত ত্যাগ তিতিক্ষা পদদলিত করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা অপব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই ভ্রান্ত রাজনীতি আজো সংশোধিত হয়নি। দেশ আজ যে কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে তার কিছুটা বিবরণ দিয়েছি "বাংলাদেশ ১৯৮৯" অধ্যায়ে। সেই বর্ণনার সাথে যদি ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসের বিভিন্ন তারিখে দৈনিক সংবাদপত্রে সরকার পরিবেশিত কিছু তথ্য এবং সরকার সমর্থনকারী অসংখ্য বিজ্ঞপ্তি, দেয়াল পোষ্টারের বক্তব্য যোগ দেয়া হয় তাহলে আর বিশেষ কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না। তাই গুটা কয়েক উদাহরণ নিম্নে পেশ করলামঃ

"প্রতিবাদের বিকল্প ভাষা বের করুন" শিরোণামের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আজ দেশের মানুষ যে অর্থনীতির যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে · · ·এরজন্য কে দায়ী? একদিনের হরতালে জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ হয় ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত ছয় বছরে ৬৬ টি হরতালের জন্য জাতির ক্ষতি হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা" ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি হরতালের পর পরই সরকারী দল জাতিকে অভিনন্দিত করেন, হরতাল প্রত্যাখ্যান করে জীবন যাত্রা সাধারণ ভাবে চালিয়ে যাবার জন্য। আর এখন

www.pathagar.com

অকপটে স্বীকার করা হয়ে গেলো যে, সারাটি জাতি প্রত্যেক হরতালের দিন কাজ থেকে বিরত থেকে দৈনিক ২৫০ কোটি টাকা, ও সর্বমোট ১৬৫০০ কোটি টাকা নষ্ট করছে। আক্ষরিক অর্থেই উপরোক্ত সরকারী বক্তব্য সঠিক নয়। কিন্তু হরতাল যে, ক্ষতিকর একথার সাথে দ্বিমত পোষণের কোন কারণ নেই। যে ক্ষয়ক্ষতির জন্য সরকার সংগত কারণেই উদ্বিগ্ন, সেই ক্ষয়ক্ষতি কি কেবল সরকারের, না কেবল জাতির। হরতাল তো কেবল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোই ঘোষণা করেননি। যখন যে সংগঠনই হরতাল ঘোষণা করেছেন, একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারী দল ছাড়া আর এমন কোন রাজনৈতিক দল আছে, এমন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে, এমন কোন্ সংগঠিত জনগোষ্ঠি আছে যারা বিগত ছয় বছরে এই সব হরতালের মতো আত্মঘাতি পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন দেননি?

ব্যক্তি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে, যারা হরতালের ডাক দেন ও স্বপক্ষে কাজ করেন তাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি অন্য কারো ক্ষতির চেয়ে কম নয়। যে দিনমজুরের একটি দিনের, এমন কি একটি বেলার ক্ষুধা নিবারণের মতো সঞ্চয়ও নেই, সেই দিনমজুরও নির্দ্বিধায় হরতালের ডাকে সাড়া দেয়। কেন তারা এই আত্মঘাতি পদক্ষেপ নেয় তা অনুধাবণ করার চেষ্টা কি হয়েছে? হরতাল বা ধর্মঘট আজ সমগ্র জাতির চরম হতাশা, চরম অনাস্থা, চরম বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে কারো দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে দেশের রাজনীতি সঠিক পথে চললে, কল্যাণমুখী হয়ে গেলে, অন্যায়-অবিচার-অনাচারের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আইনের শাসনের ধারক ও বাহক হয়ে গেলে, কেবল রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান-ই নয়, প্রশাসনিক ও সামাজিক সমস্যারও সমাধান ত্বরান্বিত হয়ে যেতো। তখন সারাটি জাতি মনোনিবেশ করতো অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে, জাতি তখন কর্মমুখী হয়ে যেতো। আর জাতি একবার কর্মমুখী হয়ে গেলে, দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন অবশ্যই সম্ভব হতো। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশ তখন একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতো।

কিন্তু এখানে আমরা যে বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, সেটা হলো, চার দশকেরও উর্দ্ধকাল ধরে যে রাজনীতি ক্রমাগত অধঃমুখী ধাবিত হচ্ছে, সেই রাজনীতির গতি পরিবর্তন করে শুদ্ধিকরণ কি আদৌ সম্ভব?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এটা অসম্ভব নয়। আজ যে সব দেশের রাজনীতি পংকিলতার উর্দ্ধে বিরাজ করছে, যে সব দেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আইনের শাসন অলংঘনীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব দেশের ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ, এমন কি সরকার প্রধানেরও চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হলে, অভিযুক্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, এমন কি সরকার প্রধান, লজ্জায় মাথা হেট করে দোষ স্বীকার করে নিয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে রাজনৈতিক নির্বাসনে চলে যান। ঐসব দেশও তো চিরকাল সুসভ্য ছিলোনা। কোথাও স্বৈরাচারী শাসন বিরাজ করছিলো, কোথাও বা অর্ন্তদ্বন্দ্বে দেশ দ্বিধা বিভক্ত ছিলো। একটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐসব দেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে, আর সেই সাথে দেশের স্থায়ী প্রশাসন

www.pathagar.com

জনগণের শোষণ নির্যাতনের ভূমিকা পরিত্যাগ করে জনগণের খাঁটি সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিয়েছে, বিচার বিভাগ ভয়ভীতি প্রলোভনের উর্দ্ধে উঠে বিচারকের বিবেক ভিত্তিক রায় দিচ্ছে, রাজনৈতিক প্রশাসনিক বিচার বিষয়ক স্থিতিশীলতার সাথে সাথে সমাজেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যায়নীতি; দূরীভূত হয়েছে বিশৃংখলা। শিক্ষাঙ্গণে জ্ঞানার্জনের পবিত্র পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার জন্য প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে তার মেধা উৎকর্ষের সুযোগ পাচ্ছে এবং এই সবেরই সমষ্টিগত সুফল হচ্ছে জাতির সঠিক অগ্রগতি। প্রত্যেকটি কর্মক্ষম নরনারী উৎপাদন মূলক বা উৎপাদনের সহায়ক কাজে লিপ্ত আছে, প্রতিটি দিনের শেষে প্রত্যেকটি নারী পুরুষ একটা তৃপ্তি উপভোগ করছে। সে তৃপ্তি হলো নিজের জন্য। জাতির জন্য, সে ঐ দিনই কিছুটা অবদান রাখতে পেরেছে।

এজন্যই সেই সব উন্নত দেশে যত্রতত্র রেষারেষি হানাহানি নেই, বিশৃংখলা নেই, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ নিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ঐসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবিরাম গতিতে চলছে।

আমাদের দেশে উপরে বর্ণিত অবস্থার ঠিক বিপরীতমুখী কর্মকান্ড গণ জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন সকলেরই কাম্য। কিন্তু বিভিন্ন মতাদর্শী, পরস্পর বিরোধী, এমন কি সংকীর্ণ গোষ্ঠিস্বার্থের বশবর্তী রাজনৈতিক কর্মকান্ড জাতির সার্বিক কর্মক্ষমতাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিস্তার লাভের কোন আশা নেই।

কিন্তু যেসব পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ, চিন্তাধারা ও কর্মসূচী জাতিকে পঙ্গু করে ফেলেছে সেগুলোর কোন আপোষ ফর্মূলা কি আদৌ সম্ভব? যারা দেশে অবাধ গণতন্ত্র চান, তারা কি গোষ্ঠি বিশেষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের সাথে আপোষ করতে পারেন? যারা বিশ্বাস করেন সংসদীয় গণতন্ত্র ছাড়া স্বৈরাচার বন্ধ করা যাবে না, তারা কি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারেন? যারা বিভিন্ন ধর্মীয় লোকের আবাসভূমি এই রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্ম নিরপেক্ষতার যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করেন, তারা কি মৌলবাদী মতবাদের সাথে আপোষ করতে রাজী হবেন? সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ কি মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তাগণের সাথে আপোষ করতে পারবেন? যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়েও রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প, তারা কি পরমুখাপেক্ষী হিসেবে ভিন্ন রাষ্ট্রের করুণার উপর নির্ভরশীল হতে রাজী হবেন? তারা কি বিদেশের অনুপ্রেরণা ও মদদ প্রাপ্ত দলের সাথে আপোষ করতে রাজী হবেন? জাতির নাম "বাংলাদেশী" থাকবে না "বাঙ্গালী" হবে, এই প্রশ্নে কি আপোষ সম্ভব? একশত পঞ্চাশটির মত রাজনৈতিক দল, যাদের অধিকাংশেরই ঠিকানা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, এতোসব রাজনৈতিক দলের স্থলে গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে আদর্শ–উদ্দেশ্য– কর্মসূচী ভিত্তিক মাত্র ৫/৬ টি দলকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসাবে ঘোষণা দিতে কি ঐক্যমত গঠন করা যাবে?

আমার মনে হয় এই সব পরস্পর বিরোধী মতবাদ, চিন্তাধারা ও স্বার্থান্ধতার সমন্বয় সাধন করে একটি 'কনসেনসাস' বা বৃহত্তর ঐক্যমত গঠন বর্তমান পরিবেশে এই হতভাগা দেশে সম্ভব নয়। এই জন্যই দেশটাকে রাহুগ্রস্ত বিশ্লেষণে আখ্যায়িত করেছি।

www.pathagar.com

অথচ দেশটাকে রাহুমুক্ত করতে না পারলে, অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন গুলোতে একটা বৃহত্তর ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারলে এই দেশের উন্নয়নের তো প্রশ্নই উঠেনা, বরং অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

এখন তা হলে উপায় কি? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্নে একটা বৃহত্তর ঐক্যমত ছাড়া কোন দেশই উন্নয়নের পথে এগুতে পারেনি। চির বিতর্কিত সংবিধান নিয়ে একটি দেশ কখনো স্থিতিশীল হতে পারেনা। বৈধ ভাবেই হোক, আর অবৈধভাবেই হোক, যারা যখন ক্ষমতায় বসে যাবেন, তারাই তখন তাদের ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠিগত স্বার্থে সংবিধানকে যেমন খুশি তেমন সংশোধন করতে থাকবেন। এই প্রক্রিয়ায় দেশের সংবিধানের কোন মৌলিকত্বই থাকতে পারেনা। এমন অবস্থায় একটি জাতি বা রাষ্ট্র বিশ্ব সমাজে সম্মানজনক স্থানই পাবেনা। আর আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আদৌ সম্ভব হবে না; যেমন আমাদের দেশে হচ্ছে না। এখন তা হলে উপায় কি? আমার দৃষ্টিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন একেবারে অচল; স্থবির। দেড় শতাধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে গোটা দশেক রাজনৈতিক দল কমবেশী সক্রিয় থাকলেও তাদের আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এতোই পরস্পর বিরোধী, এতোই সংঘাতমুখী যে এই অবস্থায় কোন একটা সমন্বিত কনসেনসাস বা বৃহত্তম ঐক্যমত গঠনের কোন সূত্রই নেই। কোন দল চাচ্ছেন দেশটাকে তাদের সুবিধামত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে, কোন দল সেই অগ্রযাত্রায় বাধা দেয়াতেই ব্যস্ত, কোন দল দেশটাকে টেনে নিতে চান পিছন দিকে, কোন দল ডানে, কোন দল বায়ে।

দেশের সংবিধান যদি 'কনসেনসাস' অর্থাৎ বৃহত্তর জনমতের উপর ভিত্তিশীল হতো তাহলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপের স্বপক্ষে অন্তত যুক্তি দেয়া যেতো। কিন্তু দেশের সংবিধান এতোই বিতর্কীত হয়ে গেছে যে প্রায় সব দলই এর পরিবর্তন চান। আগেই বলেছি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান যারা রচনা করলেন, তারাই অতি অল্পদিনের মধ্যে সেই সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করে বসলেন, এবং সেটাও তড়িঘড়ি করে। তারপর ক্ষমতা বদলের প্রত্যেক পালার সাথে সাথে সংবিধানও বদল হতে থাকলো। ক্ষমতা বদলের সাথে সংবিধান বদলের অথ দাঁড়ায়, সংবিধান ক্ষমতাসীন দলের হাতে এক ক্রীড়নক। কিন্তু আসলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মতে এবং সারা বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী সংবিধানের মধ্যেই অর্ন্তনিহিত থাকে একটা জাতির ভিত্তি, জাতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, যেগুলো পুতপবিত্র, যেগুলো সহজ পরিবর্তনশীল নয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সংবিধানের মূলনীতি গুলোই এখন বিতর্কিত। এই অবস্থায় জাতিটাকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করার জাতির আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বিতর্কের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করার পথ একটাই আছে। সে পথটি হলো এই সব মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য জনমত যাচাই করা। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী প্রত্যেকটি মৌলিক প্রশ্নে জনগণের রায় নেয়া। প্রত্যেকটি প্রশ্নে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি যে রায় দিবেন, সেটাকে কনসেনসাস বা বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যমত ধরে নিয়ে তদানুযায়ী দেশের সংবিধান সংশোধন করা।

www.pathagar.com

এইরূপ জনমত যাচাই, অর্থাৎ গণভোটের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার উদ্যোগ যারাই নিবেন তারাই জনসমর্থন পাবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন দলই প্রস্তাবিত গণভোটের বিরোধিতা করবেন বলে মনে হয় না। করলে জনগণ ধরে নেবে এমন দল দেশের রাজনৈতিক, তথা সার্বিক সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধান চান না। ক্ষমতাসীন সরকার এই প্রস্তাব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে বাস্তবায়িত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে জনগণের প্রশংসা কুড়াবেন। যেসব প্রশ্নে গণভোটের রায় চাওয়া হবে, রায় প্রকাশিত হওয়ার পর সেইসব প্রশ্নে গণরায়কে জাতির ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হবে। ঐসব সিদ্ধান্ত কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবেনা, এমন কি ঐসব মৌলিক প্রশ্নে নূতন করে বির্তক তোলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে গণভোট মাধ্যমে মীমাংসিত কোন প্রশ্ন কোন দিন পুনর্বিবেচনা করতে হলে সেই পূর্ণ বিবেচনার মাধ্যম হবে আবার গণভোট।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক, কেউ কেউ হয়তো বলবেন অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠিত করা কি সম্ভব হবে? আবার কেউ কেউ হয়তো বলবেন, গণভোটের সিদ্ধান্ত কি জনগণ মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত জাতি আজ যে অধঃপতনে নিপতিত হয়েছে, এই সময় জাতিটাকে বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, সে গণভোট জাতির মধ্যে এক দুর্বার গণজোয়ার সৃষ্টি করবে। সেই গণজোয়ারে বাধা প্রদান করার মত দুঃসাহস কোন স্বার্থান্বেসী মহলেরই হবেনা। তদুপরি, গণভোটে তো ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের কোন সুযোগ থাকবেনা। এই সত্যটুকু বোঝার ক্ষমতা আমাদের জনগণের আছে। জনগণ অবশ্যই বুঝবে গণভোটের রায়ের উপর ভিত্তি করে দেশের সংবিধান চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হবে, এবং এটা হবে জাতিটাকে কোন্দল মুক্ত করে একটা শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চরম পদক্ষেপ।

এখন প্রশ্ন হলো, এই গণভোট বা রেফারেন্ডামের উদ্যোগ নেবেন কে? উদ্যোগ নেয়া উচিত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সরকারের, উদ্যোগ নেয়া উচিত এমন সব রাজনৈতিক দলের যাদের পিছনে জনসমর্থন আছে। আমি বিশ্বাস করি, প্রস্তাবিত গণভোটের বিরোধীতায় কোন রাজনৈতিক দল, বা কোন সংগঠিত গোষ্ঠি, এমন কি কোন ব্যক্তিও অভিমত রাখবেন না, কারণ দেশের বর্তমান জঘন্য পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার জন্য গণভোটের আর কোন বিকল্প নেই।

পরবর্তী প্রশ্ন হলো, প্রস্তাবিত গণভোট পরিচালনা করবে কোন্ প্রতিষ্ঠান? এইখানেই ক্ষমতাসীন সরকারের সদিচ্ছার অগ্নি পরীক্ষা। ক্ষমতাসীন সরকার যদি দেশটাকে বাঁচাতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহলে তাঁরা অন্ততঃ এই একটি ইস্যুর উপরে জনসমর্থন লাভ করবেন। আমি বিশ্বাস করি, সরকার কলাকৌশল পরিহার করে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে গেলে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এই একটি ইস্যুর উপর হাত মেলাবেন।

www.pathagar.com

যদি ক্ষমতাসীন সরকার প্রস্তাবিত গণভোট অনুষ্ঠানে আগ্রহী না হন, তাহলে প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই ইস্যুর উপর আন্দোলন শুরু করবে। তখন তারা দেশব্যাপী জনসমর্থন লাভ করবে। তখন খুব বেশী দিন লাগবে না যখন ক্ষমতাসীন সরকার গণভোটে এগিয়ে আসতে বাধ্য হবে। আমি মনে করি, ক্ষমতাসীন সরকারী দল শক্তি অর্জনের স্বার্থেই গণভোটে আগ্রহী হবেন।

প্রস্তাবিত গণভোট পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যাস্ত করতে হবে? আমার সুচিন্তিত অভিমত এরূপ একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি উচ্চতম পর্যায়ের আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করতে হবে। এই কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকার ও প্রধান বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটা সমঝোতা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি। বিশ্ববরেণ্য ৪/৫ জন নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের ২/৩ জন নির্দলীয় নিরপেক্ষ এবং বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হতে পারে। এই আন্তর্জাতিক কমিশনের সার্বিক কর্তৃত্বাধীনে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত গণভোট অনুষ্ঠিত করলে এই গণভোটে কোনরূপ অবাঞ্ছিত কর্মকান্ড ঘটবেনা।

ইতিহাসে কোথাও কোন দিন এই রূপ ব্যাপক ভিত্তিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি জানি না। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশ আজ যে পরস্পর বিরোধী শত শত সমস্যায় জর্জরিত এর উদাহরণও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। রোগ যতো কঠিন হয় চিকিৎসাও ততো জটিল হয়। আমাদের ক্ষেত্রে রোগ তো আর একটা দু'টো নয়। শত শত রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশ নামক রোগীটার অবস্থাতো মুমূর্ষ। এই মূমূর্ষ রোগীর চিকিৎসা প্রচলিত সনাতনী পন্থায় সম্ভব নয়। তাই মূমূর্ষ রোগীটাকে বাঁচাবার জন্য এই চূড়ান্ত চিকিৎসার সুপারিশ।

www.pathagar.com

৫ ঃ প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান

প্রশাসনিক সমস্যাবলী রাজনৈতিক সমস্যাবলী থেকে উদ্ভূত। রাজনৈতিক সমস্যাবলী জাতির জীবনে অস্থিরতা, বিশৃংখলা, অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, গণজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অশুভ প্রভাব বিস্তার করে জাতিকে পঙ্গু করে ফেলেছে। এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

রাজনৈতিক সমস্যাবলী কলুষিত করেছে প্রশাসনকে, ভেঙ্গে ফেলেছে সমাজ ব্যবস্থাকে, লন্ডভন্ড করে ফেলেছে অর্থনীতিকে, যার জন্য কোটি কোটি লোক দারিদ্রের নিম্নতম পরিসীমারও নীচের অবস্থানে নর্দমার কীটের মতো কিলবিল করে মানবেতর অবস্থায় বেঁচে আছে। রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান শুরু হয়ে গেলে প্রশাসনিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে বিশ্বে এমন সব দেশও আছে যে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতা সত্বেও প্রশাসন নিরপেক্ষ, স্থিতিশীল, গতিশীল। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র থাইল্যান্ড এর নাম উল্লেখ করা যায়। ঐ সব দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতা এখনো বিরাজ করছে। কিন্তু ঐসব দেশের রাজনীতি প্রশাসনকে প্রভাবান্বিত করে না। মন্ত্রী সভা ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে, পার্লামেন্ট কিছুদিন পর পর ভেঙ্গে দিতে হচ্ছে, নুতন সরকার গঠনের জন্য কিছুদিন পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশাসন নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিরপেক্ষ ও সুদক্ষ ভূমিকা পালন করছে। বিচারকগণ কোন রকম প্রভাবের বশবর্তী না হয়ে স্বাধীন ভাবে ন্যায় বিচার করে যাচ্ছেন। এক কথায়, আইনের শাসন সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতাসীন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, এমনকি প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, সামান্যতম অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট মহলে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা সৃষ্টি হয়; ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন; তবু প্রশাসনকে প্রভাবান্বিত করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দোষ ত্রুটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা হয় না। আর প্রশাসনের, বিশেষ করে বিচার বিভাগের, ভীত এতোই শক্ত যে ঐ রূপ অবৈধ চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই জন্যই ঐসব দেশে কোন কর্তা ব্যক্তির বিরুদ্ধে চরিত্র স্খলনের অভিযোগ প্রকাশিত হয়ে গেলে প্রায়শই দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তি দোষ স্বীকার করে ক্ষমতাসীন পদ থেকে ইস্তেফা দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে চলে যান। অভিযোগ যদি ক্ষমতা অপব্যবহার জনিত দুর্নীতির কোন ঘটনা হয়, তাহলে তো কথাই নেই। এমনকি যেখানে অভিযোগ বহুদিন পূর্বে কোন এক নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের, সেখানে ও বলা হয়না, "এটাতো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো জাতির স্বার্থের ক্ষয়-ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।" অভিযোগ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা কেউ করতে সাহসই পায় না। স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়ে অনুতপ্ত জীবন যাপনই তারা শ্রেয় মনে করে। এই উচ্চ আদর্শ ঐসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটি কারণে। একটি হচ্ছে প্রভাবমুক্ত প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা। আর একটি হচ্ছে উন্নতমানের চরিত্র। সত্য অভিযোগকে মিথ্যা বানানোর প্রচেষ্টা ঐসব দেশে অচল।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের প্রশাসন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়, এমন দাবী কেউই করতে পারবেন না। কিন্তু প্রশাসনের সকল দোষই যে রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য, এটাও অবশ্যই ঠিক নয়। আমাদের দেশের প্রশাসনের সবচেয়ে জঘন্য দোষ হলো সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী দুর্নীতি। এই দুর্নীতি সার্বজনীন হতে পারতো না, যদি এর পেছনে রাজনৈতিক সমর্থন একে বারেই থাকতো না। সেই সমর্থন প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, অথবা দেখে না দেখার ভানই হোক, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ এই সুযোগে তাদের নিজের স্বার্থে দুর্নীতিকে প্রায় সার্বজনীন করে ফেলেছেন।

প্রশাসনিক সমস্যাবলীর সমাধান রাজনৈতিক সমস্যার মতো জটিল নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক যেসব সমস্যা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে এগুলোর সমাধান ততো কঠিন নয়। প্রশাসন তো বিধিবদ্ধ আইন কানুন ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলার কথা। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহির বিধি বিধান আছে। এতদ্বসত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রশাসন আজ মানুষের উপর এক দুর্বিষহ বোঝা হিসাবে চেপে আছে। তার বহুবিদ কারণের মধ্যে একটি হলো জবাবদিহির বিধিবিধান উপেক্ষা করা। তাই বিধিবদ্ধ আইন এবং প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন অবজ্ঞার সাথে পদদলিত করে অন্যায় অবিচার চলছে তো চলছেই। এর প্রতিবিধান নেই।

এর আশু প্রতিবিধান অবশ্যই সম্ভব। তবে পূর্বশর্ত হলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও দৃঢ় সংকল্প। যদি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও দৃঢ় সংকল্প নেয়া হয় যে বর্তমানের অচল প্রশাসনকে সচল করতে হবে, গণ বিমুখী কর্মকর্তাগণের মনোবৃত্তি পরিবর্তন করে গণকল্যাণ মুখি করতে হবে, মানুষের দুঃখ বেদনার আশু প্রতিকার করতে হবে, অভিযোগের ত্বরিৎ ফয়সালা করতে হবে, আর সাথে সাথে সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে, তা হলে সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, এইরূপ দৃঢ় সিদ্ধান্তের ও দৃঢ় সংকল্পের সুদৃঢ় ঘোষণা। এইরূপ ঘোষণা কার্যকরী করার একটা পূর্ণাঙ্গ নীল নক্শা তৈরী করার অযাচিত দায়িত্ব অনিবার্য কারণে আমি নিজ হাতে তুলে নিচ্ছি না। কেবল এটুকুই বলছি, এমন একটি নীল নক্সা তৈরী করা সম্ভব, যা প্রশাসনকে হঠাৎ লন্ড ভন্ড করে দেবেনা, অথচ ক্রমে ক্রমে সবল গতিশীল ও গণমুখী করতে থাকবে, আর সেই সাথে দুর্নীতির মাত্রা কমতে থাকবে।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যদি যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকে, তাহলে উপরোক্ত কর্তব্য পালনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত করে দিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সচিবকে তার মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বস্তরে সচলতা, গতিশীলতা, গণকল্যাণমুখী কর্মতৎপরতা ও দুর্নীতিমুক্তি নিশ্চিত করণের দায়িত্ব দিতে হবে। তাছাড়া যুগ্ম সচিব ও তদুর্দ্ধ পদমর্যাদার সকল কর্মকর্তাকে, সকল পরিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, এবং জেলা পর্যায়ের প্রত্যেকটি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার উপর দায়িত্ব দেয়া উচিত স্ব-স্ব পরিসীমার মধ্যে প্রশাসনকে সচল, গতিশীল, জনকল্যাণমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত করে তুলতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য।

www.pathagar.com

এইটুকু পদক্ষেপ নেয়ার সাথে সাথে মানুষের বর্তমান ভোগান্তির কিছুটা লাঘব হতে থাকবে। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে সরকারের এমন এক দৃঢ় সিদ্ধান্তকে, দৃঢ় সংকল্পকে অবজ্ঞা করে সরকারী কর্মকর্তাগণ মানুষকে হয়রানি করে ঘুষ প্রদানে বাধ্য করতে থাকবেন, যেমন এখন হচ্ছে।

এরূপ সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণকে অভিযোগ গ্রহণের এবং অভিযোগের উপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব দিয়ে দিলে প্রচলিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও প্রশাসনিক শৃংখলা ফিরে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

আমি পুনরোল্লেখ করতে চাই যে একটি কঠিন সমস্যার এই সহজ সমাধানের সাফল্য নির্ভর করবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের আন্তরিকতার উপর, তাদের দৃঢ় সংকল্পের উপর, তাদের দৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর। সংকল্পে ও সিদ্ধান্তে যদি দ্বিধাদ্বন্দ্ব, শিথিলতা থাকে, তা হলে, যে দুর্নীতিকে এক নম্বর শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো সেই দুর্নীতি এক নম্বর শক্তি হিসাবেই বিরাজ করবে।

রাষ্ট্রীয় নীতি নিধারণী পর্যায়ে এই পরামর্শকে যদি কোন গুরুত্বই দেয়া না হয়, তথাপি অনেক ভুক্তভোগী কিছুটা রেহাই পাবেন, যদি বিবেকবান উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপরোক্ত পরামর্শে কিছুটা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় পবিত্র দায়িত্ব পালনে একটুখানি অগ্রণী ভূমিকা নেন। যেকোন একটি অফিসের প্রধান কর্মকর্তা যদি শিথিলতা, সিদ্ধান্তহীনতা, অন্যায়, অবিচারকে প্রশ্রয় না দেন, তাহলে তার অধীনস্ত কর্মচারীগণ, কয়েক ডজনই হোক আর কয়েক শতই হোক, নির্বিকারে এখনকার মতো লুটপাট তো করতে পারবেননা। এই লুটপাটটুকু বন্ধ করতে পারলেই নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষ অন্তত একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলবে।

রাহুগ্রস্ত, অভিশপ্ত বাংলাদেশে যে রাহু, যে অভিশাপ সারাটি জনগোষ্ঠিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হতাশা-নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করেছে, সেটা হলো প্রশাসনিক দুর্নীতি। দুর্নীতি কি ভাবে সমগ্র প্রশাসনকে গ্রাস করে ফেলেছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছি 'বাংলাদেশ-১৯৮৯' অধ্যায়ে। সেই চিত্রে আমি কেবল দুর্নীতির ভয়াবহতার ইংগিত দিয়েছি, বিশদ বিবরণ দেইনি। বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই, এই জন্য যে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই দুর্নীতির দৌরাত্ম ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে অবহিত ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দুর্নীতির শিকার।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ঠিক যে রকম বাংলাদেশে দারিদ্র মোচনের কোন কর্মসূচী আদৌ গৃহীত হয়নি সেইভাবেই দুর্নীতি দমনেরও কোন কর্মসূচী, এমনকি কোন বলিষ্ট পদক্ষেপও নেয়া হয়নি।

১৯৫০ সালে তৎকালীন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার (সন্দ্বীপসহ) পুলিশ প্রধান হিসাবে আমি এক দুর্নীতিদমন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলাম এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ এবং তৎকালীন গণ-পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এক দুর্নীতি দমন সপ্তাহ পালন করেছিলাম। এর ফল হয়েছিলো উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালে উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা, তৎকালীন ময়মনসিংহের (বর্তমানে ছয় জেলা), পুলিশ

www.pathagar.com

প্রধান থাকাকালে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অনুপ্রেরণায় আমি সারা পাকিস্তানের জন্য একটি দুর্নীতিদমন কর্মসূচী তৈরী করেছিলাম। ১৯৫৭ সালে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন সময় মাওলানা সাহেব সেই কর্মসূচীটি প্রধান মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। অচিরেই কর্মসূচীটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। তার কিছুদিন পর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যান। তারপর ঐ কর্মসূচীর আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না।

১৯৮২ সালে মরহুম বিচারপতি আবদুস সাত্তার যখন রাষ্ট্রপতি, তখন আমি জাতীয় সংসদের নির্দলীয় সদস্য। রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা দেই এই শর্তে যে তিনি দেশের দুর্নীতি দমন করতে সচেষ্ট হবেন। তার আশ্বাসে আমি তৃতীয় বারের মতো একটি দুর্নীতি দমন কর্মসূচী প্রণয়ন করি। তিনি এই কর্মসূচী পছন্দ করেন। তাঁর পরামর্শে আমি এই কর্মসূচীর অনুলিপি তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সহ কয়েকজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে দেই। যারা সেই কর্মসূচীটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব (বর্তমান বি, ডি, আর প্রধান) মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরী অন্যতম। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে কয়েক দফা আমার সাথে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ শুরু করার পূর্বেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। আর সেই সাথেই কর্মসূচীটির অপমৃত্যু ঘটে।

আজ দেশে দুর্নীতি শিকড় গেড়ে শক্ত ভাবে অবস্থান নিয়েছে। আজ দুর্নীতি কেবল ঘুষ দেয়া-নেয়ার ব্যাপারই নয়। দুর্নীতি আজ বাংলাদেশে অর্থ উপার্জনের সর্বোত্তম এবং সহজতম ব্যবসা। দুর্নীতি আজ ঘৃণিত কোন সামাজিক অপরাধ নয়। দুর্নীতি সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করে ফেলেছে। আজ যেখানে যার হাতেই কিছু ক্ষমতা আছে, তিনিই এক দুর্নীতি চক্রের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান নিয়েছেন। ক্ষমতা কোটি কোটি টাকা লাভ করার মতো ব্যবসা প্রদানের ক্ষমতাই হোক, আর দু'চার টাকা করে অবৈধ আয় করার সুযোগ দানের ক্ষমতাই হোক। দুর্নীতি চক্রের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্তত কিছু সংখ্যক সৎ ব্যক্তি যে নেই তা হলফ করে বলা যাবেনা। কিন্তু ক্ষমতাধর সেই সৎ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেও দুর্নীতি চক্র গড়ে উঠেছে। তিনি হয়তো জানেনই না, কিভাবে তার নাম ভেঙ্গে তারই সহচরেরা দুর্নীতি করে টুপাইস কামাচ্ছে। আর এমনও ব্যক্তি আছেন, যিনি অবহিত আছেন যে তাকে কেন্দ্র করে, তার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে, তারই সাঙ্গপাঙ্গরা অবিরাম দুর্নীতি চালাচ্ছেন। তিনি কিন্তু সরাসরি কোন সুযোগ নেন না এবং সেজন্যই বিশ্বাস করেন আল্লাহর কাছে তিনি নির্দোষ।

এমনো রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন, হয়তো বা বিশ্বের কোথাও এখনো আছেন, যিনি স্বয়ং দুর্নীতিবাজ ছিলেন না এবং তার পরিবারবর্গ ও ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনকে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন অবৈধ ভাবে, অবৈধ পথে, অবৈধ উদ্দেশ্যে।

তিনি তার পারিষদ বর্গের পুকুরচুরি, এমনকি সাগর চুরির দিকেও দৃষ্টি দিতেন না। তাঁরা তাঁর পার্টি ফান্ডে অবিরাম লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করে দিতেন।

www.pathagar.com

এর প্রতিদানে চাঁদা দানকারীরা যে দেশটাকে লুটপাট করলো সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। কিন্তু তিনি স্বয়ং ঘুষ গ্রহণ করেননি। জনগণ তাকে সৎ ব্যক্তি হিসাবে জানে। ইতিহাসও হয়তো তাকে একজন সৎ রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করবে। এমনো ক্ষমতাধর আমলা আছেন যাদের সততা সম্বন্ধে জনমনে সন্দেহ নেই, কারণ সেই আমলা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঘুষের নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে যান। এরা ঘুষ আদায় করেন তাদের অধীনস্ত বিশ্বস্থ কর্মকর্তার মাধ্যমে সেই বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ছাড়া তার অন্য সহযোগীরা ঘুণাক্ষরেও জানেনা যে তাদের প্রধান কর্মকর্তা ঘুষের এক মোটা অংকের পাওনাদার। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই মোটা অংশ উপরওয়ালাদের প্রাপ্য বলে চালিয়ে দেয়া হয়। উপরওয়ালাদের পরিচিতি অজ্ঞাতই থেকে যায়।

পক্ষান্তরে এমনো সরকারী কর্মকর্তা আছেন যারা প্রকৃত অর্থেই সৎ। একজন বিচারক দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন; প্রশ্রয় ও দেন না, কিন্তু তার অধীনস্থ ব্যক্তিরা দর কষাকষি করে চুপিসারে মামলার উভয় পক্ষের সাথে চুক্তি করে নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির টাকা যাতে মারা না যায় সেজন্য জামানত পর্যন্ত রাখা হয়। মামলায় এক পক্ষতো জিতবেই; যে পক্ষ জিতলো সেই পক্ষের টাকা পুরো আদায় করা হলো, যে পক্ষ হারলো সেই পক্ষের জামানত ফেরৎ দেয়া হলো। সৎ বিচারক জানতেই পারেন না, তার নাকের ডগা দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে অহরহ।

আজকাল দুর্নীতি কেবল ঘুষ প্রদান এবং গ্রহণের মধ্যেই সীমিত নয়। বহু সরকারী কর্মকর্তা–নিয়োজিত এজেন্টরা মামলার বাদী বিবাদীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে মামলায় জিতিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। শুনা যায়, কিছু সংখ্যক মক্কেলহীন উকিল আজ কাল এই পন্থায় ভাল আয় শুরু করেছেন। আরো শোনা যায়, কিছু বিচারক নূতন কর্মস্থলে যোগ দিয়ে তাড়াতাড়ি এজেন্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে উল্টা–পাল্টা, অন্যায়, এমন কি সম্পূর্ণ বেআইনী রায় দিয়ে চমক লাগিয়ে ঘাঘু এজেন্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাথে সাথে এজেন্টরা হাজির। তারপর শুরু হয়ে যায় ব্যবসা।

দলিলের অথবা সার্টিফিকেটের অনুলিপি সত্যায়িত করণ, চারিত্রিক প্রত্যয়নপত্র,ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অন্যান্য প্রথমশ্রেণীর কর্মকর্তার সীল স্বাক্ষর সস্তা মূল্যে বিক্রয় হয় কোর্ট কাছারীর প্রাঙ্গণে। এফিডেফিট নিতে এখন আর স্বয়ং হাকিমের সামনে উপস্থিত না হলেও চলে। বিদেশ যাত্রীদের স্বাস্থ্য প্রত্যায়নপত্র যথারীতি সীলসহিসহ অগ্রিম কিনে নিয়ে এসে পাসপোর্ট নম্বর নাম বসিয়ে দেয়া প্রচলিত প্রথা হয়ে গেছে।

প্রশাসনিক দুর্নীতিরই আর এক নাম ঘুষ। প্রশাসনিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাবে ক্ষমতাধর ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন স্বার্থ আদায় করাও ঘুষের পর্যায়ই পড়ে। ঘুষখোরী আজ দেশের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। মূলধন লাগেনা মোটেই। কোন ঝুঁকি নেই, যদি সংশ্লিষ্ট উপরওয়ালাকে খুশি রাখা যায়। তবে ঘুষখোরীর জন্য কতগুলো বিশেষ যোগ্যতা অত্যাবশ্যক। সেই যোগ্যতা হলোঃ

www.pathagar.com

৫ঃ১ঃ১ আল্লাহতায়া'লা মানুষকে বিবেক নামক শুদ্ধ পথ প্রদর্শনকারী যে পবিত্র অনুভূতি দান করেছেন সেই পবিত্র অনুভূতিকে দুশমন মনে করে নির্বাসন দেয়া, যাতে এই দুশমন ঘুষের বিনিময়ে জঘন্য অন্যায় করতে ও বাঁধা না দেয়।

৫ঃ১ঃ২ লজ্জা শরম বলে যে অনুভূতি মনুষ্যত্বরই অঙ্গ, সেই অনুভূতিকেও নির্বাসন দিয়ে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাকে একটা মূলধন হিসাবে গণ্য করে নেয়া।

৫ঃ১ঃ৩ ন্যায় অন্যায়, বৈধ অবৈধ ইত্যাদির সংজ্ঞা পরিবর্তন করে এগুলোকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে বিক্রি করার মনোবৃত্তি গড়ে তোলা।

৫ঃ১ঃ৪ ঘুষখোরীর পথ সুগম করার জন্য সদা সর্বদা সততার ভান করা, কথায় কথায় আল্লাহ রসূলের নামে সততার শপথ ঘোষণা করা।

৫ঃ১ঃ৫ সুযোগ মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ঘুষখোরী বন্ধ করার জন্য জান কোরবান দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া।

৫ঃ১ঃ৬ ধর্মের ছত্রছায়ায় থেকে অবাধে ঘুষখোরী চালিয়ে যাবার জন্য 'সুরৎ' ও 'সিরৎ' পরিবর্তন করে মসজিদের প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে বেরিয়ে এসেই আল্লাহর নামে ঘুষ গ্রহণ করা।

৫ঃ১ঃ৭ সদা সর্বদা আর্থিক অনটনের বুলি প্রচার করা, যাতে লোকে চিন্তাই করতে পারেনা যে এই ব্যক্তির অবৈধ আয় আছে।

উপরোক্ত যোগ্যতাগুলোকে ঘুষখোরীর স্নাতক পর্যায়ের যোগ্যতা বলা যেতে পারে। স্নাতকোত্তর যোগ্যতা আরো অনেক জটিল কলাকৌশলের সমন্বয়। দুর্নীতি দমন আপাতদৃষ্টিতে যতো কঠিন মনে হয়, আসলে কিন্তু ততো কঠিন নয়। কিন্তু দুর্নীতি দমন করার আন্তরিক সিদ্ধান্ত বা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। দুর্নীতি দমন শুরু করতে হয় উপরের তলা থেকে। দুর্নীতি দমনের সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী শক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়ে। রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায়ে যদি দুর্নীতি দমনের আন্তরিক দৃঢ়সংকল্প নেয়া হয়, আর যদি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার দৃঢ়সংকল্প সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং যদি সেই সিদ্ধান্ত উচ্চতম পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়, তাহলে সাথে সাথে ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা যাবে, কারণ শীর্ষস্থানীয় দুর্নীতিবাজ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান না থাকলেও আত্মগরিমা অবশ্যই আছে। যদি নাই বা থাকে, তবু সমাজে প্রকাশ্যে ঘৃণিত হয়ে যাবার, মুখোশ খুলে পড়ার ভয়তো অবশ্যই আছে। এইসব কারণেই যখনই কোন দেশে সামরিক শাসন জারী হয়, তখনই উপরের তলায় দুর্নীতি হঠাৎ করে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ উপরের তলায় তখন ধরা পড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু সামরিক শাসনে এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সামরিক শাসকবর্গ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায়ে দুর্নীতি দমনের আন্তরিক দৃঢ়সংকল্প গৃহীত হলে এবং সেটাকে রাষ্ট্রীয় কার্যসূচী হিসাবে গ্রহণ করলে সর্বোপরি উপরতলার কাউকেই বাস্তবে দুর্নীতির প্রশ্রয় না দিলে, উপরের তলার ঘুষ গ্রহণ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দুর্নীতি দমনের বিভিন্ন মুখী কার্য্যসূচী বাস্তবায়ন করলে জাতি দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় উচ্চতম পর্যায়ে এই শুভবুদ্ধি ও দৃঢ়সংকল্প জাগ্রত হোক এটাই জাতির প্রত্যাশা। কিন্তু এই প্রত্যাশা নিয়ে চুপ করে বসে থাকার জন্যই দুর্নীতি ঘুষখোরী আজ সারা জাতিকে এক অসহায় বলীর পাঠায় পরিণত করেছে।

দুর্নীতি দমনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী কেবল মাত্র ক্ষমতাসীন সরকারই বাস্তবায়ন করতে পারেন। জাতি এখন দুর্নীতির কষাঘাতে যেভাবে জর্জরিত হচ্ছে, এই অবস্থা বেশীদিন চলতে পারেনা, চলবে না। ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে দুর্নীতি দমনের কোন একটি কার্যক্রম গ্রহণ করতেই হবে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য জাতি প্রস্তুত হয়ে গেলে দুর্নীতি দমনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যাবে।

দুর্নীতি দমনে যথাসময়ে বলিষ্ঠ অবদান রাখার প্রস্তুতির জন্য আমি নিম্নলিখিত কার্যক্রম জাতির কাছে পেশ করছিঃ-

৫ঃ২ঃ১ দুর্নীতির উৎস, বিস্তার ও প্রসারতার সূত্র লিপিবদ্ধ করা এবং এসব প্রতিকারের পথও পদ্ধতির উপর গবেষণামূলক রেকর্ড তৈরী করা।

৫ঃ২ঃ২ দুর্নীতির প্রধান প্রধান ঘাটিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর কার্যক্রমের বিস্তারিত রেকর্ড তৈরী করা।

৫ঃ২ঃ৩ দলিল পত্র ও সাক্ষী প্রমাণ সহ কুখ্যাত দুর্নীতিবাজগণের প্রত্যেকটি দুর্নীতি ঘুষখোরী ঘটনার তালিকা তৈরী করে রাখা।

৫ঃ২ঃ৪ কুখ্যাত দুর্নীতিবাজদের স্বনামে বেনামে আহরিত স্থাবর অস্থাবর সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৫ঃ২ঃ৫ কুখ্যাত দুর্নীতিবাজগণের বৈধ আয়ের চেয়ে বহু বেশী ব্যয়, যথা আড়ম্বর পূর্ণ জীবন-যাপন, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অপচয়ের তালিকা তৈরী করা।

৫ঃ২ঃ৬ দুর্নীতিবাজগণের ব্যয়বহুল বদভ্যাস যথাঃ জুয়া খেলা, মদ্যপান ইত্যাদির তালিকা তৈরী করা।

দুর্নীতি দমনকল্পে ব্যবহার করার জন্য এইসব রেকর্ড যেমন গোপনে প্রস্তুত করতে হবে, তেমনি গোপনে সংরক্ষণ ও করতে হবে। গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেলে এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে; আর প্রতিশোধমূলক আঘাত ও আসতে পারে।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল, সুসংগঠিত ধর্মীয় ও সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রবীণ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, ধৈর্য্যশীল, ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে দুর্নীতি দমন সেল গঠন করে এই প্রক্রিয়া চালু করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে, এই রেকর্ড তৈরী হচ্ছে যথাসময়ে দুর্নীতি দমনে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে কুখ্যাত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তদন্ত করলে আদালতে প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্য ও দলিল পাওয়াই যায় না। কয়েক বছর পূর্বে কোন স্থানে কোন্ মামলায় কোন্ আদেশ বা কোন্ কন্ট্যাকটে কার মাধ্যমে কার কাছ থেকে কোনদিন কত টাকা আদায় করা হয়েছিলো, এইসব তথ্য পাওয়াই মুস্কিল হয়। এই কার্যক্রমটি সংগোপনে চালু করে গোপন রেকর্ড তৈরী করলে দুর্নীতি দমনে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হবে।

www.pathagar.com

জেলা উপজেলা পর্যায়েও কুখ্যাত দুর্নীতিবাজদের রেকর্ড তৈরী করা প্রয়োজন। সুসংগত ধর্মীয় ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব আদায় করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে চুনোপুটির পরিবর্তে রাঘব বোয়ালদের দুর্নীতি-ঘুষখোরীর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের তালিকা তৈরী করাই হবে এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। কিন্তু তালিকার গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারলে এই প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যাবে। দুর্নীতিবাজরা তখন সতর্ক হয়ে যাবে। আর সুযোগ পেলে তালিকা প্রণয়নকারীদের উপর প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঘুষ দুর্নীতির ঘটনা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করলেও কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে বড় আকারের দুর্নীতির প্রস্তুতি চলার সময় ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলে জঘন্য দুর্নীতি করাও কঠিন হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে আদালতে দোষী সাব্যস্থ না হওয়া পর্যন্ত দুর্নীতিবাজদের নাম প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

৬ ঃ সামাজিক সমস্যার সমাধান

৬·১ ঃ ভূমিকা

সামাজিক সমস্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে দিয়েছি তার উপর একটু গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেই দেখা যাবে, সামাজিক সমস্যাবলী জন্মলাভ করেছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনেতিক সমস্যাবলীরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তাই সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের উপর নির্ভরশীল। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান কতো কঠিন। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের যে প্রস্তাব আমি দিয়েছি তা একটি অন্তিম, কিন্তু মোক্ষম সমাধান। তবে ঐ মোক্ষম সমাধানের জন্য যে জাতীয় ঐক্যমত দরকার তা অর্জন করতে বেশ কিছুটা সময় লাগা অবশ্যই স্বাভাবিক। রাহুগ্রস্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব দুষ্ট এবং অশুভ শক্তি কাজ করছে সেগুলো রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত এবং সৎ ও শুভ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের সেই মোক্ষম প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। যদি রাজনৈতিক অশুভ শক্তির শুভবুদ্ধি না জাগে এবং যদি সেই অশুভ শক্তি তাদের সংকীর্ণ মানসিকতা পরিবর্তন না করে, তাহলে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বিলম্বিত হতে থাকবে। সাথে সাথে প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানও বিলম্বিত হতে থাকবে; আর ঐ দুইটি মৌলিক সমস্যা প্রসূত সামাজিক সমস্যার সমাধান অনিবার্য কারণেই বিলম্বিত হবে।

সামাজিক সমস্যা হিসাবে আমরা যেসব কার্যকলাপকে চিহ্নিত করেছি সে সব কার্যকলাপ জাতির ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে; জাতির মেরুদন্ডকে দুর্বল করে ফেলেছে। এই অনিশ্চয়তার অনিবার্য বিষক্রিয়া থেকে জাতির কোন একটি ব্যক্তিরও রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই। কেউ কেউ পথের সন্ধানে ইতিমধ্যে মনোনিবেশ করেছেন, কেউ কেউ দেশত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়। অনেকেই এখন সেই পথের পথিক। কেউ কেউ প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। পরে সুবিধামত সময়ে নিজে পাড়ি দেবেন। কিন্তু কত লোক দেশত্যাগ করবেন? কত লক্ষ লোক? দেশটাকে যে রসাতলে নিপতিত করা হয়েছে, তার ভুক্তভোগী তো দু'চার লক্ষ লোক নন, কোটি কোটি নিরীহ লোক। এতো সব লোক পালিয়ে যাবে কোথায়? কোন্ দেশ স্থান দেবে তাদেরকে? আর যে কয়জন দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশের ভিসা লাভ করে নেবেন, তাদের ভবিষ্যতইবা কি? তারা কি সেই দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন? তাদের অবস্থা তো হবে ছিন্নমূলের মতো। অথচ দেশের সার্বিক পরিবেশ এতোই জঘন্য, এতোই বিপদজনক, এতোই অনিশ্চিত হয়ে গেছে যে, এই দেশের নাগরিকত্ব এখন যেন এক অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অনিবার্যতা রোধ করার জন্য আমি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশের সর্বস্তরের সকল কর্তাব্যক্তির, সকল নেতানেত্রীর, সকল সমাজ সচেতন ও দেশপ্রেমিকের কাছে আবেদন রাখছিঃ আসুন আমরা দেশটাকে অনিবার্য বহুমুখী সংঘাত-সংঘর্ষ ও চরম নৈরাজ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য অন্তত কয়েকটি পদক্ষেপ নেই, যে পদক্ষেপগুলো নিলে দেশের জনগণ সর্বব্যাপী নৈরাশ্য-হতাশার মধ্যেও কিছুটা আশার আলো দেখবে, আর দারিদ্র প্রপীড়িত মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এখন আমার প্রস্তাবগুলো পেশকরছি।

www.pathagar.com

৬·২ ঃ শিক্ষা সমস্যা

দেশের ধ্বংস প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্নগঠিত করার লক্ষ্যে অতিশীঘ্র একটি শিক্ষা মহাসম্মেলন আহবান করা হোক। এই মহাসম্মেলনে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রীবর্গ, বাংলাদেশের জাতীয় পরিষদের বর্তমান ও সাবেক সদস্যবর্গ, সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ পরিদপ্তর- অধিদপ্তরের প্রধানগণ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যবর্গ, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরগণ, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ডিভিশনাল কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল পদস্থ কর্মচারী, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের, দেশের সাংবাদিকগণের প্রতিনিধিবর্গ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধিবর্গ, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র/ছাত্রী সংসদের প্রতিনিধিবর্গ, জাতীয় অধ্যাপকবৃন্দ এবং দেশের অন্যান্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণকে আহবান করা হোক। এই মহা সম্মেলনের উদ্দেশ্য, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, সেশন জটের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা এবং ভবিষ্যতে যাতে আর শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানার্জন বাধা প্রাপ্ত না হয় তার সার্বিক ব্যবস্থা করা।

এই মহাসম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে সর্বজন-স্বীকৃত একটি শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন শুভযাত্রার সূচনা করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। জাতীয় শিক্ষা মহাসম্মেলনের পর দেশের ১০/১২ টি বৃহৎ শহরে আঞ্চলিক শিক্ষা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করলে ভাল হবে।

শিক্ষা মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি প্রতি তিন মাসে একবার বৈঠকে মিলিত হয়ে অবস্থার পর্যালোচনা করবেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করবেন। শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোন জটিল সমস্যায় এই কমিটির পরামর্শ নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

www.pathagar.com

৬.৩ ঃ স্বাস্থ্য সমস্যা

চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলা বিরাজ করছে, চিকিৎসার মানের যে চরম অবনতি ঘটেছে তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে চিকিৎসার মান উন্নয়ন কল্পে অতিশীঘ্র একটি চিকিৎসা মহাসম্মেলন আহবান করা হোক। এই মহাসম্মেলনে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রীবর্গ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বর্তমান ও সাবেক সদস্যবর্গ, সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সকল পরিদপ্তর, অধিদপ্তর এবং জেলা পর্যায় পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সকল মেডিকেল কলেজের প্রফেসারবৃন্দ, প্রাক্তন প্রফেসারবৃন্দ, প্রাইভেট নার্সিংহোম বা ক্লিনিকের প্রতিনিধি, আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানী, ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিনিধিবর্গকে আহবান করা হোক।

এই মহা সম্মেলনে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাবলীর আশু সমাধানের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মহাসম্মেলনের পর দেশের ১০/১২টি বৃহৎ শহরে আঞ্চলিক স্বাস্থ্য মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সব আঞ্চলিক মহাসম্মেলনেও চিকিৎসা-সমস্যার উপর সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। সর্বশেষে জাতীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশ বিবেচনা করে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, তথা জাতির সার্বিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় মহাসম্মেলন ও আঞ্চলিক মহাসম্মেলন যে শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি, চিকিৎসা সমস্যার প্রতি যে শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তা থেকে সর্বস্তরের চিকিৎসকগণ তাদের দায়িত্বের পেশাগত মান এবং প্রচলিত ভুলত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হবেন। সর্বোপরি প্রস্তাবিত পদক্ষেপ জনগণের মধ্যে একটা নতুন চিন্তা চেতনার জন্ম দেবে। যে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেই সরকার জনগণের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা অর্জন করবেন।

চিকিৎসাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগমুক্তির প্রয়াস। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অধিকাংশ রোগেরই প্রতিষেধক উদ্ভাবন করে বহু মারাত্মক রোগকে অঙ্কুরেই দমন করতে অত্যাশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছে। জাতিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করতে হবে যে, এই একটি ক্ষেত্রে আমাদের হতভাগা দেশেও অত্যন্ত প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই প্রশংসার দাবীদার আর্ন্তজাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দেশের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী, তথা দেশের সরকার। এটা অবশ্যই এক গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও প্লেগ, কালাজ্বর ইত্যাদি মহামারীর যখন কোথাও প্রাদুর্ভাব হতো তখন সেই এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়তো। বিজ্ঞান এই সব মহামারীর প্রতিষেধক আবিষ্কার করে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময়েই আমাদের এই উপমহাদেশটাকে

www.pathagar.com

প্লেগ ও কালাজ্বর মুক্ত করে। কিন্তু ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক মহামারী অংকুরে বিনষ্ট করতে সময় লাগে অনেক। বাংলাদেশের জনগণ কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন যে, আর্ন্তজাতিক সংস্থা সমূহের সাহায্য নিয়ে এই দেশেরই স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকগণ কৃতিত্বের সাথে এই সব সংক্রামক মহামারী নির্মূল করতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের দেশ এখন যে কলেরা এবং বসন্তের মতো জঘন্য মহামারীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বাসই করা যেত না। এই সুকঠিন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতো না, যদি না দেশের জনগণ কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধক গ্রহণ করতে আগ্রহী হতেন।

কিন্তু প্রতিষেধক ব্যবহার করে, প্রত্যেকটি মানুষের শরীরে রোগের ইমিউনিটি বা অনাক্রমণ্যতা সৃষ্টি করে একটা জাতিকে রোগমুক্ত রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হোক যে ব্যক্তি প্রতিষেধক ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে, তারই কলেরা বসন্ত বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

রোগের জীবাণূ ধ্বংস করে জীবাণুর প্রবৃদ্ধি বন্ধ করার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এখনো এদেশে নেয়া হয়নি। রোগ জীবাণুর জন্ম-ক্ষেত্র হলো স্যাঁতস্যাতে নোংরা স্থান, জঙ্গলাকীর্ণ বদ্ধ জলাশয়, পশু-পাখীর নোংরা পচা লাশ ইত্যাদি। এখনো জনসাধারণ যে পানি পান করেন তা রোগের জীবাণূ ভর্তি। দেশের অধিকাংশ লোকই এখন পর্যন্ত পানি পান করেন নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর দীঘি, এমন কি ছোট ছোট ডোবা থেকে। এসব কোনটির পানিই জীবাণু মুক্ত নয়। তাই জনগণকে পরামর্শ দেয়া হয়, ঐ সব পানি সিদ্ধ করে পান করার জন্য। কিন্তু স্রেফ অজ্ঞতার জন্যই হোক, বা গাফিলতির জন্যই হোক, অথবা জ্বালানী দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই হোক, গ্রামাঞ্চলের খুব কম পরিবারই সিদ্ধ পানি পান করেন। নলকূপের পানি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত, কিন্তু সারা দেশে পানীয় জল সরবরাহকারী নলকূপের সংখ্যা এখনো নগণ্য।

আর্ন্তজাতিক সংস্থা ইউনিসেফ এর সহায়তায় সারা দেশে পানীয় জলের জন্য ছোট অগভীর নলকূপ বসানো এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই কার্যক্রমের গতি যথেষ্ট বেগবান নয়; বর্তমান গতিতে কাজ চললে আগামী দশ বছরেও সারা দেশের সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নলকূপের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আমার সুপারিশ, তিন বছরের মধ্যে সারা দেশের সর্বত্র টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি প্রত্যেক পরিবারের সহজ নাগালে পৌছার জরুরী ব্যবস্থা করা হোক। প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় নেয়া যতটা আবশ্যক, শত গুণ বেশী আবশ্যক বিশুদ্ধ পানি জনগণের দোর গোড়ায় পৌছানো। নলকূপ স্থাপনের এই কার্যক্রমের একটা পার্শ্ব সুফল হবে। এতে নলকূপের যন্ত্রাংশ তৈরী ও নলকূপ স্থাপনে অর্থনৈতিক কার্যক্রম অনেকটা সম্প্রসারিত হবে। এতে বহু লোকের কর্মসংস্থানও হবে।

দেশে প্রতিস্থাপিত নলকূপের এক বিরাট অংশ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিকল হয়ে পড়ে থাকে। বিকল নলকূপ মেরামত করা এমন কঠিন কারিগরী কাজ নয়। যে কোন শিক্ষিত বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে, আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ন্যায্যমূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে এরূপ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা বিকল নলকূপগুলো সহজেই

www.pathagar.com

সচল করতে পারবে। তাই আমার পরামর্শ, প্রাথমিক পর্যায়ে দেশে অন্তত ৭৫ হাজার শিক্ষিত বেকার যুবককে নলকূপ মেরামতের প্রশিক্ষণ ও আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি দেয়া হোক। দেশের প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে কমপক্ষে একজন এমন যুবক বাছাই করা হোক যে উৎসাহী, কর্মঠ এবং যার ছোট ওয়ার্কশপ স্থাপনের মত একটি কামরা আছে। নলকূপ মেরামতের সাথে সাথে এই যুবককে বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল, পাওয়ার পাম্প, পাওয়ার টিলার, চাউলের কল ইত্যাদিও মেরামত করার প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত হবে। ঐ যুবককেই গ্রামীণ বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজও শিক্ষা দেয়া তেমন কঠিন হবে না। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে এইসব ওয়ার্কশপ স্থাপনের স্বল্প মূলধন সরবরাহ করা হলে একদিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে জনগণের নিকট সমাদৃত ও গ্রহণীয় হবে। জাতির জন্য এই প্রকল্প বিরাট সুফল বয়ে আনবে।

দেশে যতো বদ্ধ জলাশয় আছে তার প্রায় সবই মশামাছি ও কীটপোকার জন্ম স্থান। এই সত্য উপলব্ধি করতে হলে ঢাকা মহানগরীর বাইরে যেতে হবেনা। মহানগরীর শত শত বদ্ধ জলাশয়ের মাত্র কয়েক ডজন জলাশয়ে মাছ চাষ হয়, আর যে জলাশয়েই মাছের চাষ হয়, সেখানে মশামাছি, কীটপোকা ইত্যাদি জন্মাতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জলাশয়ে প্রচুর মাছ নেই, সেই জলাশয়েই পানির কিনার দিয়ে কচুরীপানা ও লতাপাতাকে অবলম্বন করে মশামাছি, কীটপোকা অবাধে জন্মাতে থাকে।

এইসব কীটপোকার মধ্যে একমাত্র মশাই মানুষকে সরাসরি জ্বালাতন করে। সেই জন্যেই মশার জ্বালাতনে অতিষ্ট হয়ে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। কেবল তাই নয়, মহানগরীতে মশার উপদ্রব বেড়ে গেলে হৈ চৈ পড়ে যায়। তখনই মশার বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নামার জন্য আহবান আসে পৌর সভার প্রতি। পৌর সভার মশক নিধন সংস্থা তখন সক্রিয় হয়ে উঠে। এতদসত্ত্বেও যখন মশার উপদ্রবে নগরজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন পৌরসভা সদর্পে মশার বিরুদ্ধে আকাশ যুদ্ধ ঘোষণা করেন; উড়োজাহাজ থেকে মশক-নিধনকারী রাসায়নিক ছিটিয়ে মশক কুলকে দমন করে জনগণের প্রশংসা লাভ করেন।

কিন্তু কেউ কি চিন্তা করে দেখেছেন, যে মশার বিরুদ্ধে আমাদের এতো ক্ষোভ, এতো অভিযোগ, এতো ব্যয় বহুল অভিযান, সেই মশাই কি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু। আমার তো মনে হয় মশার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর, বেশী নোংরা ও ঘৃণ্য মানবশত্রু হলো মাছি। মশা জন্ম নেয় পানির কিনারায়, ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে। আর মশার আশ্রয়স্থল হলো অন্ধকার কুঠুরী বা ঘরের জিনিষপত্রের ফাঁকের মধ্যে। মশার লক্ষ্য হলো মানুষ বা গবাদি পশুর দেহ। তার খাদ্য হলো রক্ত। তাই সে মানুষ ও গবাদি পশুর শত্রু। কিন্তু মশা তো উন্মুক্ত পায়খানায়, নর্দমায় বা দুর্গন্ধযুক্ত মৃত পশু পাখির গলিত লাশের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করেনা; আর সেখানে বিচরণও করেনা। তাই মশার পায়ে এবং সারা গায়ে মানুষের সবচেয়ে ঘৃণিত মলমূত্র, সবচেয়ে অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত পচা ময়লা লেগে থাকেনা। তথাপি আমরা সারাক্ষণই মশা থেকে রেহাই পাবার চিন্তায় মগ্ন। কারণ মশা কামড় দেয়, মশার উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিদেশ থেকে

www.pathagar.com

আমদানী হচ্ছে মশা বিধ্বংসী কীটনাশক; দেশে তৈরী হচ্ছে এরোসল ইত্যাদি ঔষধ আর চায়নীজ কয়েল। এগুলোর বেশ বড় বড় শিল্পও গড়ে উঠেছে এবং সেখানে উৎপাদিত মশা-বিধ্বংসী কীটনাশকের জম-জমাট ব্যবসা চলছে সারা দেশে।

এই মশক নিধনে যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে তা কেবল মশাকেই মারছে না, মানুষের নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে মানুষের দেহে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, আমাদের অজান্তে। মশার প্রজনন বন্ধ করতে পারলে মশা জন্মাতো না, আর সারাদেশে কোটি কোটি টাকার মশক নিধনকারী ঔষধ প্রয়োগ করে মানুষের স্বাস্থ্যের অনিবার্য্য ক্ষতি করা হতো না, পরিবেশও দূষিত করা হতো না।

আসল যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, তা হলো মশাকে আমরা বড় শত্রু বলে মনে করি এই জন্য যে, মশা সরাসরি মানুষকে জ্বালাতন করে। কিন্তু মশার চেয়ে বহু বেশী জঘন্য ক্ষতিকর ও নোংরা ময়লা বহনকারী মাছির সঙ্গে আমরা নির্বিঘ্নে সহ অবস্থান করি। কারণ মাছি আমাদের শরীরের পেছনে ধাওয়া করে না, ধাওয়া করে আমাদের সুগন্ধি খাদ্যের প্রতি। ঘরের পেছনে উন্মুক্ত পায়খানার পচা দুর্গন্ধ মুক্ত বিষ্ঠার উপরে শত শত মাছি বসে সেই বিষ্ঠা খাচ্ছে, আর সংলগ্ন ঘরের ভেতর থেকে কাঁঠাল, আম বা যে কোন খাদ্যের সুগন্ধ পাবার সাথে সাথে পায়ে ময়লা লাগানো সেই মাছি উড়ে এসে বসছে আমাদের খাদ্যের উপর। বসে যাবার পর হয়তো মাছিকে তাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু মাছির পা এবং পেটের তলায় লেগে থাকা পচা ময়লা বিষ্ঠাজনিত রোগ জীবাণু খাদ্যের সাথে মিশে আমাদের উদরে প্রবেশ করছে। নোংরা ময়লায় ভর্তি ড্রেন বা নর্দমা, অসহনীয় দুর্গন্ধময় ডাষ্টবিন, যার পচা আর্বজনা ও গলিত কুকুর-বিড়ালের লাশের উপর কীট-পোকা মাছির বংশ বিস্তার ঘটছে, যেদিকে তাকাতেই বমি আসে; সেই বিষাক্ত পরিবেশের জীবাণুবাহক মাছি অবাধে বিচরণ করছে পার্শ্ববর্তী বাসগৃহে; জীবাণু দ্বারা দূষিত করছে মানুষের খাদ্যদ্রব্য। রাস্তার পাশে খাবারের দোকান থেকে শুরু করে সকল প্রকার পণ্যসামগ্রীর উপর রয়েছে ঐ মাছির অবাধ বিচরণ, যার ফলশ্রুতিতে প্রায় সর্বক্ষণই মাছির মাধ্যমে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটছে।

সর্বোপরি, মশা আর মাছিই যে আমাদের একমাত্র শত্রু তা নয়। সর্বপ্রকার পোকা-মাকড়, তেলাপোকা, উইইদুর এগুলো সবই রোগ জীবাণুর বাহক, মানুষের চরম শত্রু। প্রসঙ্গত, আরশোলা বা তেলাপোকার কথাই ধরা যাক। এদের জন্মস্থান ময়লা নিষ্কাশনের পাইপ বা নোংরা অন্ধকার যে কোন কুঠুরী। রোগ জীবাণুর সাথে সাথে জন্মলাভ করে এইসব কীট পোকা এদের সার্বক্ষণিক লক্ষ্য হলো মানুষের খাদ্য। মানুষের খাবারের প্রতি এদের আসক্তিহেতু এরা মানুষের সকল প্রকার খাবারকেই দূষিত করে তুলছে, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ নানা প্রকার ব্যাধির শিকার হচ্ছে। উই পোকা ও ইঁদুর আমাদের যে কি ক্ষতি করে তা ভাবতে অবাক লাগে। উই পোকা কাপড় , কাগজ, কাঠ কেটে স্থায়ী সম্পদে একটি বিরাট ঘাটতির সৃষ্টি করে। সে মানুষের খাদ্যের এক বিরাট অংশ ভক্ষণ করে ফেলে। ধান-ক্ষেতে ইঁদুর প্রতিবছর ধ্বংস করে মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের শতকরা ৫ অংশ, যার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন এবং মূল্য ১৯৮৯ সালের বাজার দরে নয়শত

www.pathagar.com

কোটি টাকা। তথাপি ইঁদুর নিধনের স্থায়ী কোন পরিকল্পনা এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান অধ্যায়ে আমাদের পরামর্শ পেশ করবো।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মাছি মশা এবং সর্বপ্রকার কীট পোকার প্রজনন বন্ধ করার পন্থা কি। আমাদের চোখের সামনে উদাহরণ রয়ে গেছে, এই কাজটি সাফল্যজনকভাবে অর্জন করার। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর নামক ছোট্ট দেশটি বাংলাদেশী নাগরিকদের কাছে সুপরিচিত। একটি মৎস্যজীবী গ্রাম থেকে মাত্র ৪/৫ দশকের মধ্যে বিশ্বের সেরা এক নগররাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠেছে সিঙ্গাপুর। সারা বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে পর্যটক আসছেন সিঙ্গাপুরে, এই চমৎকার নগররাষ্ট্রের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া আর উৎফুল্ল মুখর পরিবেশ উপভোগ করার জন্য। সিঙ্গাপুরে যদি পূর্বের মতো মশামাছি কীটপোকা ভোঁ ভোঁ আর ভ্যাঁন ভ্যাঁন করতো, তাহলে সারা ইউরোপ, আমেরিকা ও দূর প্রাচ্যের শীত প্রধান দেশ, যেসব দেশে শীতের জন্যই মাছি মশা কীটপোকা জন্মায় না, সেই সব দেশের লোক কি সিঙ্গাপুরে এসে স্বস্তি পেতেন? নিশ্চয়ই না।

আমাদের দেশে স্বল্পকালীন হলেও একটা শীতকাল আছে। আবার আমাদের শীতকালই শুকনাকাল। শীতকালে মাছি মশা কীট-পোকা জন্মায় না। শুকনায় এদের প্রজনন হয় না। সিঙ্গাপুরে কোন শীতকালই নেই। শুকনাকালও নেই। বারো মাসই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বারো মাসই অল্প অল্প করে বৃষ্টি হয়। তাই সিঙ্গাপুরের আবহাওয়া মাছি মশা-কীট পোকা প্রজননের জন্য আমাদের দেশের চেয়েও অনেক বেশী অনুকূল।

অথচ অনেকটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও অকাট্য সত্য যে, সিঙ্গাপুর নামক রাষ্ট্রটিতে মাছি-মশা-কীট-পোকা নেই। আমি প্রথম যখন ১৯৫৬ সালে সিঙ্গাপুর যাই, তখন কিন্তু সিঙ্গাপুরে মাছি-মশা-কীট-পোকার কোন অভাব ছিলনা। আর ১৯৭২ সালে দুর প্রাচ্যের পথে দ্বিতীয় বার যখন সিঙ্গাপুর যাই, তখন আমার সুপরিচিত স্থানে যে সব মাছি-মশা-কীট-পোকার সাথে বোল বছর পূর্বে সহ অবস্থান করেছিলাম, সেই মাছি-মশা-কীট-পোকা উধাও। তারপর থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই সিঙ্গাপুরে যেতে হচ্ছে। প্রতিবারই দেখছি, সবকিছুরই প্রবৃদ্ধি; কিন্তু মাছি-মশা-কীট-পোকা-ইঁদুর আর উইপোকার পাত্তাই নেই। আমি বছরের পর বছর এই বিষয়টি নিয়ে সিঙ্গাপুরে রীতিমত গবেষণা চালিয়েছি। সর্বশ্রেণীর বহুলোকের সাথে কথা বলেছি। কাঁচা বাজার মাছ মাংসের বাজারে গিয়েছি। যেসব বস্তি ভেঙ্গে আধুনিক আকাশচুম্বি ভবন নির্মাণ এখনও শুরু হয়নি, সেসব বস্তির ছোট ছোট গলি দিয়ে হেটেছি, জীর্ণ শীর্ণ রেস্তোরায় চা পান করতে বসেছি, কিন্তু মাছি, মশা, কীট, পোকা-আরশোলার পাত্তা পাইনি। সিঙ্গাপুর সরকার মাছি-মশা-কীট-পোকা নিধন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় যে কাজটি করেছেন, সেটি হলো, কোথাও ভেঁজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটি, আবদ্ধ ময়লা পানি, আবর্জনার স্তুপ নেই। সারাটি দেশে বৃষ্টির পানি তরতর করে গড়িয়ে নালা দিয়ে নদীতে এবং নদী থেকে সাগরে চলে যাবার সুব্যবস্থা চমৎকার ভাবে করা হয়েছে। তারপরও সপ্তাহে একদিন করে সমস্ত পাকা কাঁচা ড্রেন ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে তরল কীটনাশক ঔষধ এমন ভাবে ছড়ানো হয়,

www.pathagar.com

যাতে এর গন্ধ ছড়িয়ে না পড়ে, অর্থাৎ পরিবেশ যাতে কীট নাশকের কারণে দুষিত না হয়। মানুষের বাসস্থানের ভিতরে কীট নাশক প্রয়োগের প্রথা সে দেশে নেই, দরকারও নেই। যেখানে আবদ্ধ পানি আছে সেখানেই মাছের চাষ, মাছের সাথে মাছি মশা পোকা মাকড়ের সহ অবস্থান অসম্ভব, প্রজননের প্রশ্নই উঠেনা, কারণ মাছ ওদের ডিম সহ সবকিছুই খেয়ে ফেলে।

কেবল সিঙ্গাপুর নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই নয়, বিরাট আয়তনের দেশ মালয়েশিয়া, যেখানে আমাদেরই মতো ভাত খাওয়া মুসলমান মানুষের সংখ্যাই বেশী, সেই দেশেও ১৯৫৬ সালে দেখেছিলাম প্রচুর মাছি, মশা, কীট, পোকা। আর এখন সেই বিশাল দেশের শহরাঞ্চলে মাছি-মশা-কীট-পোকা প্রায় নেই বললেই চলে। জঙ্গলাকীর্ণ ছোট ছোট গ্রামে কিছু কিছু মাছি মশা থাকলেও ওদের উপদ্রব লক্ষ্যণীয় নয়। আমাদের আরো নিকটে থাইল্যান্ড নামক যে বিরাট আয়তনের দেশটি রয়েছে, ১৯৫৬ সালে সেখানকার পরিবেশ ছিলো আমাদেরই দেশের মতো; এই নাতিশীতোষ্ণ দেশেও এখন আর মশা মাছি নেই। প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। সেখানে আমাদেরই মতো ভাত খাওয়া মানুষ। ঐ দেশেরও আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সেখানে আমি গিয়েছি মাত্র একবার, ১৯৭৭ সালে। জার্কাতা মহানগীরতে তখনো দু'চারটি মাছি মশা দেখা যেতো। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র বালী দ্বীপে সাতদিন অবস্থানকালে সারাটি দ্বীপের কোথাও মাছি মশার পাত্তা পেলাম না।

বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, এই সব কটি দেশের আবহাওয়াই মাছি মশা, কীট পোকা প্রজননের অনুকূল। তথাপি সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড-ইন্দোনেশিয়া মানুষের এই সব শত্রুকে দমন করে নিতে পারলো, আর বাংলাদেশ পারলো না, এটা মেনে নিই কি করে? ওদের সাফল্যের কারণ অতি সহজ। চারটি দেশের সরকার ও জনগণ এক সাথে কাজ করে মানুষের ঘোর শত্রু মাছি-মশা-কীট-পোকার প্রজনন বন্ধ করার ব্যবস্থা করছে আর বাংলাদেশে প্রজনন বন্ধ করার স্থায়ী পন্থার পরিবর্তে মানুষের বাসস্থানে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক কীট নাশক ছড়ানো হচ্ছে। ফলে ওদের সাথে সাথে মানুষও এইসব ক্ষতিকর রসায়নিকের বিষক্রিয়া নাক মুখ দিয়ে টেনেনিচ্ছে।

এই আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে এবার সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি, কি কি প্রক্রিয়ায় মাছি-মশা-কীট-পোকার প্রজনন বন্ধ করা যাবেঃ-

৬·৩·০১ঃ দেশের সমস্ত কাঁচা পাকা নর্দমায় যাতে ময়লা ও পানি জমে না থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৬·৩·০২ঃ দেশের সমস্ত উন্মুক্ত পায়খানা ও প্রস্রাবখানার স্থলে 'ওয়াটার-সিলড' অর্থাৎ পানি বদ্ধ কংক্রিটের পায়খানা স্থাপন করা; অর্থাৎ স্যানিটারী ল্যাট্রিনের প্রবর্তন করা, যাতে মানুষের মলমূত্র কোথাও মাটির উপরে স্থান না পায়।

৬·৩·০৩ঃ মরা পশু পাখী, সাপ-ব্যাঙ ইত্যাদি সমস্ত মরাপ্রাণীর লাশ মাটির নীচে পুতে ফেলা, অর্থাৎ এখনকার মতো মরা গরু উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রেখে প্রায়

www.pathagar.com

সপ্তাহখানেক পর্যন্ত পরিবেশ দুষিত করা এবং মাছি মশার প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার প্রচলিত প্রথা বন্ধ করা।

৬·৩·০৪ঃ খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশটুকু হয় মোরগ, হাঁস, মাছকে খাওয়ানো, আর না হয় মাটির নীচে পুঁতে ফেলা।

৬·৩·০৫ঃ গবাদি পশুর গোবর যত্রতত্র ছড়িয়ে না রেখে গর্তের মধ্যে পুঁতে খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রাখা, যাতে ওর মধ্যে মাছি মশা কীট পোকার প্রজনন না হতে পারে। আর ঐ গোবর, খড়কুটো সহ পচে যাওয়ার পর যাতে অতিমূল্যবান সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৬·৩·০৬ঃ শহরে প্রচলিত ডাষ্টবিন বা আবর্জনাগার রীতিমত পরিষ্কার না করায় তা প্রচুর মাছি মশার প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। উন্নত দেশের মত আচ্ছাদিত ডাষ্টবিন প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তোরে প্রত্যেকটি ডাষ্টবিনের আবর্জনা উঠিয়ে সেখানে কিছু ব্লিচিং পাউডার বা অন্যকোন কীটনাশক একটুখানি ছিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে মাছি মশার প্রজনন বন্ধ হয়।

৬·৩·০৭ঃ জনবসতির কাছাকাছি, বৃষ্টির পানি আটকে থেকে মাটি স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে থাকা ঝোপ ঝাড় জঙ্গল এসব মাছি মশা কীট–পোকার প্রজনন স্থল। এইগুলো পরিষ্কার করে মশা মাছির প্রজনন বন্ধ করা।

৬·৩·০৮ঃ বন্ধ জলাশয়ে, বেশী পানি বা কম পানি যাই হোক, মৎস্য চাষ করলেই আর মাছি–মশা–কীট–পোকা জন্মাতে পারে না। অতিঅল্প পানির মধ্যে, এমন কি মাত্র ছয় ইঞ্চি গভীর পানিতে নাইলোটিকা, তেলাপিয়া সর পুটি মাছ সহজেই উৎপাদিত হতে পারে।

৬·৩·০৯ঃ যেখানেই পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তূপ, সেখানেই মাছি মশার জন্ম স্থান। কাঁচা বাজারে অপরিচ্ছন্ন স্থানে এদের প্রজনন হয় প্রচুর। ডাব নারিকেলের খোল, কলার ছাল, সবজির পরিত্যক্ত অংশ ইত্যাদি পরিষ্কার না করলে মাছি মশার প্রজনন হবেই।

৬·৩·১০ঃ এই সবের পরও মাছি মশা প্রজনন বন্ধ করার পন্থা হলো প্রজননের সম্ভাব্য সকল স্থানে সপ্তাহে একদিন কীটনাশক প্রয়োগ করা।

সারা দেশকে মাছি মশা মুক্ত করতে অবশ্যই বেশ কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু এই বিষয়টি এতোই অত্যাবশ্যকীয় যে, এর জন্য একটা পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরী করে মাত্র কয়েক শত কোটি টাকা খরচ করলে গোটা দেশটাকে মাছি–মশা–কীট–পোকা মুক্ত করা সম্ভব হবে। ফলতঃ চিকিৎসা খরচ কমবে এবং মানুষের জীবনীশক্তি ও কর্মশক্তি বাড়বে। আর তার সঙ্গে বাড়বে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

এই কার্যক্রমের 'সাথী ফসল' হবে পরিবেশের অভাবনীয় উন্নয়ন। বস্তুত মাছি–মশা, কীট–পোকা তো দুষিত পরিবেশেরই বিষাক্ত ফসল। পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বনায়ন

www.pathagar.com

যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি মাছি-মশা কীটপোকার প্রজনন বন্ধ করাও অত্যাবশ্যক। তাই দেশকে দুর্গন্ধ ময়লা-আবর্জনা মুক্ত করার উপরোল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আমি জাতির কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

সরকারের পক্ষে এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে আনুষ্ঠানিকতার কারণে কিছু না কিছু বিলম্ব ঘটবেই। কিন্তু দেশের সচেতন নাগরিকদের পক্ষে নিজেদের স্বার্থেই এই কার্যক্রম শুরু করে দেয়া উচিত।

www.pathagar.com

৬·৪ঃ নিরাপত্তা সমস্যা

মানুষ আদিকালেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো যে কয়েকটি প্রয়োজনে, তার মধ্যে সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল জানমালের নিরাপত্তা। সমাজব্যবস্থার প্রথম লক্ষ্য ছিলো মানুষকে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা বিধান করা। মানুষ নিজেই যখন একে অন্যের প্রতি অন্যায় করতে শুরু করে, আঘাত হানতে শুরু করে, তখন থেকে সমাজের মূল দায়িত্ব হয়ে যায় মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান, অথাৎ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিরীহ মানুষের নিরাপত্তা বিধান। গ্রামীণ সমাজ শতাব্দির পর শতাব্দি এই দায়িত্ব পালন করে আসছিলো অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে, অত্যন্ত সাফল্যের সাথে।

ক্রমে ক্রমে সমাজেরই বৃহত্তর সংস্করণ হিসাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং ধীরে ধীরে নিরাপত্তার দায়িত্ব সমাজের হাত থেকে চলে যায় রাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু আইনত এই দায়িত্ব হস্তান্তর হলেও কার্যত গ্রামীণ সমাজ মানুষের নিরাপত্তা বিধানে বিরাট ভূমিকা পালন করতে থাকে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ তাদের স্বার্থে এই সমাজ ব্যবস্থাকে কেবল অটুট রাখেনি, বরং আরো শক্তিশালী করেছিলো। ফলতঃ গ্রামাঞ্চলে কেবল শান্তিই বিরাজ করছিল না, মানুষের জানমাল যে কতো নিরাপদ ছিলো তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবেন না। গ্রামের এক নিভৃত বাড়ীতে একটি বিধবা দু'চারটি বাচ্চাকে নিয়ে, এবং সেই কালের হিসাবে যথেষ্ট মালামাল নিয়ে নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে বসবাস করতেন। রাতের অন্ধকারে সেই বিধবার বাড়ী লুট করা মোটেই কঠিন ছিল না, কারণ পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়ী পর্যন্ত তার চিৎকারই গিয়ে পৌছতে পারতো না। তথাপি কখনো সে বিধবার বাড়ী আক্রান্ত হতো না। বস্তুতঃ অর্থ বা মালামালের লোভে অপরাধ গ্রামাঞ্চলে প্রায় অজানাই ছিলো। অপরাধ যা ঘটতো তা ছিলো ছোটখাট বিষয় নিয়ে। কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া ও পরে মারামারি। কিন্তু সেই মারামারি বেশীদূর গড়াবার আগেই সমাজপতিগণ ছুটেআসতেন।

মারামারি বন্ধ হয়ে যেতো। সালিসী বিচারে ঘটনার ফায়সালা করার সিদ্ধান্ত করা হতো এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে যেতো। অন্যায়কারীকে হয়তো ক্ষতিপূরণ দিতে হতো, আর দু'দলের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতো। এই অবস্থা বিরাজ করছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তৃতি পর্যন্ত।

তাপরপর ক্রমে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। আর পরিণতি হিসাবে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ বাড়তে থাকে, আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় অশান্তির। ক্রমে ক্রমে অবস্থার অবনতি ঘটতেই থাকে। আর আজ সমাজব্যবস্থা বলতে পারস্পরিক রক্তের সম্পর্ক, সৌজন্যের সম্পর্ক, প্রকাশ্যে অল্পবিস্তর অবশিষ্ট থাকলেও মানুষের অন্তর থেকে সামাজিক সৌহার্দ্য লোপ পেয়ে গেছে। এখন পরিস্থিতি কি ভয়াবহ তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি "বাংলাদেশ ১৯৮৯" অধ্যায়ে।

এখন আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষের নিরাপত্তা। নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছে আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের উপর, যার সাথে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত দেশের বিচার ব্যবস্থা। বৃহত্তর অর্থে দেশের প্রশাসনই মানুষের নিরাপত্তার জন্য দায়ী। এই বিষয় আলোচনা করেছি 'প্রশাসনিক সমস্যা সমাধান' অধ্যায়ে। সেই আলোচনার পুনরুক্তি করার কোন যুক্তি নেই। তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, রাষ্ট্র তথা প্রশাসন, সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা এতদূর গড়াতো না। প্রশাসন এই দায়িত্ব পালন করতে পারতো দুইভাবে। যে কোন অপরাধ ঘটলেই প্রকৃত অপরাধীকে ধরে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, আর বিচারক তার বিবেক বুদ্ধিমত ন্যায়বিচার অর্থাৎ অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে। অর্থাৎ সুষ্ঠু তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচার এই দুটো কাজই যদি রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারতো তাহলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা এতোটা বিঘ্নিত হতো না, যা এখন হচ্ছে।

এই সাথে প্রশাসন যদি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি অনুসরণ করে সমাজের সৎব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত এবং অসৎ ব্যক্তিদের নিরুৎসাহিত করার ব্যবস্থা করতো, তাহলে অপরাধ প্রবণতা নিঃসন্দেহে বাধাপ্রাপ্ত হতো। আজ সমাজে অপরাধীকে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, অপরাধের প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও বিলুপ্ত। এখনো বাংলাদেশের এই সর্বনাশী, সর্বগ্রাসী দুর্দিনেও এমন উদাহরণ আছে যেখানে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটু বিবেকবান হলে, তার এলাকায় সার্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা তার পক্ষে অসম্ভব জেনে শুনেও, এমন কি তার সহকর্মীদের পরোক্ষ অসহযোগিতা সত্ত্বেও, সেই পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধীদের সীমাহীন প্রশ্রয় দিতে নারাজ। তার এই মনোবৃত্তিটুকু, তার সহকর্মী, এলাকার নেতৃবর্গ, টাউটবাটপার, মাস্তান গুন্ডারা জেনে ফেলার পর সেই থানায় অন্ততঃ অন্তিম নৈরাজ্য বিরাজ করছে না। দেশের অন্য অনেক এলাকার তুলনায় সে থানা এলাকার অপরাধীরা অন্ততঃ কিছুটা সংযত এবং তার ফলে সেই এলাকার কয়েক লক্ষ লোক অন্ততঃ কিছুটা নিরাপত্তার স্বাদ উপভোগ করছেন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে গ্রামের নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য একটু সৎসাহসী, আগ্রহী এবং কিছুটা নির্লোভ সেই গ্রামের আইন শৃংখলা ব্যবস্থা তথা জননিরাপত্তা পরিস্থিতি, পাশের গ্রামের চেয়ে অনেক উন্নত। কারণ পাশের গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হয় অকর্মণ্য, না হয় দুর্নীতিবাজ। অনুরূপভাবে যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্মঠ, সৎসাহসী কিন্তু অতিলোভী নন, সেই ইউনিয়ন এলাকায়– আইন পরিস্থিতি, তথা নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনা– মূলকভাবে ভাল। ঠিক এমনিভাবে থানা–কর্তৃপক্ষের সার্বিক চরিত্রের প্রভাব কাজ করে সম্পূর্ণ থানা এলাকায়।

এই প্রেক্ষিতেই এটা অবধারিত যে, জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, বিবেক বুদ্ধিমত অবাধে করতে পারলে তার সুফল জনগণই ভোগ করতো। আর পুলিশ প্রশাসন যদি থানা পুলিশকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন তা হলে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতোটা খারাপ হতো না।

'প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান' অধ্যায়ে কারাগার সংস্কার সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছি, তার প্রতিফলন ঘটতে পারে সমাজে। ১৯৭৯ সালে কারাগার সংস্কার কমিশনের কাছে আমি এই কথাগুলোই বলেছিলাম। আমাদের কারাগার ব্যবস্থা এতোই জঘন্য যে, দোষী হোক আর নির্দোষ হোক, একবার যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তার

www.pathagar.com

মনুষ্যত্ব, তার বিবেক, তার মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, থাকতে পারে না। অথচ হওয়া উচিত ছিলো ঠিক তার বিপরীত। প্রত্যেকটি কারাগার হওয়া উচিত এক একটি চরিত্র সংশোধনাগার। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে কারাগারগুলো সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীকে বিবেকবান কর্মী বানাতে প্রয়াস পাচ্ছে। মাদকাসক্ত অপরাধী ব্যক্তিদের সৎ, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিতে পরিণত করছে। আমাদের মতো দরিদ্রতম দেশের কারাগারগুলোর, চরিত্রবান কর্মী সৃষ্টির এক একটি কারখানায় পরিণত হওয়া উচিত ছিলো। এতে কারাগার থেকে মুক্তি প্রাপ্তির পর এক সময়ের অপরাধী পরিণত হতো একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী হিসাবে। এর সুফল লাভ করতো সেই ব্যক্তি ও তার সমাজ। এখন ঘটছে কিন্তু তার ঠিক বিপরীত।

আমাদের সমাজে একদল লোক আছে যাদের পেশাই হলো কোর্ট-কাচারীতে টাউটগিরি। গ্রামে এরা মাতব্বরী করে, আর সুযোগ পেলেই দু'দলের মধ্যে মামলা বাধিয়ে দেয়। ফৌজদারী মামলার চেয়ে দেওয়ানী মামলা তাদের জন্য বেশী লাভজনক ও কম ঝুকিপূর্ণ। ভূমি প্রশাসনের জঘন্য গাফিলতির কারণে যখন তখন দেওয়ানী মামলা বাধিয়ে দেয়া অতিসহজ। আর একবার দেওয়ানী মামলা বাধিয়ে দিলে এটা দীর্ঘস্থায়ী এক আয়ের সূত্র হয়ে দাঁড়ায় ঐ টাউটদের জন্য এবং তাদের মুরুব্বী একশ্রেণীর অসৎ উকিলের জন্য। এ সমস্যার সমাধান কল্পে দেওয়ানী আইন পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। দেওয়ানী আদালত, যেখানে মৌখিক সাক্ষ্যের চেয়ে দলিল পত্রের সাক্ষ্য আইনত ও কার্যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা এতো কঠিন নয়। সামাজিক সৌহার্দ্য স্থাপনের বৃহত্তর স্বার্থে দেওয়ানী আইন পরিবর্তন করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করতে আমি জোর সুপারিশ করছি।

www.pathagar.com

৬·৫ঃ নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশব্যাপী কিছুসংখ্যক পুরুষ বিভিন্ন অজুহাতে নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। দৈহিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ ও মানসিক নির্যাতনে আত্মহত্যা, এ দেশের নারী জাতির একাংশের উপর এক ঝুলন্ত খড়গ। সেই জন্যই শুরু হয়েছে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

কিন্তু এই আন্দোলনে কি আশাপ্রদ কোন ফল পাওয়া গেছে? না ঐ রূপ ফল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে? আন্দোলন চলছে শহরে বন্দরে, সভা সমিতিতে, আর নির্যাতন চলছে গৃহের অভ্যন্তরে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, নির্যাতন তো আর এক তরফা ব্যাপার নয়। শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন হলেও, শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ ক্ষেত্রে নারী কর্তৃক পুরুষকে জ্বালাতন থেকে নারী নির্যাতন শুরু হয়। কেবল তাই নয়, নারীর স্রেফ খিট খিটে মেজাজই পরিবারের অশান্তির কারণ এমন উদাহরণও বিরল নয়। নারীর পরকীয়া প্রেমের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমার মতে নারী নির্যাতন নয়, পুরুষ জ্বালাতন নয়, আসল সমস্যা হচ্ছে 'পারিবারিক সৌহার্দ্যের' অভাব।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়ে কি সমাজ পারিবারিক সৌহার্দ্য স্থাপনের দিকে এগুচ্ছে? নারী নির্যাতন একটি প্রতিবাদমূলক স্লোগান। যে কোন অন্যায়েরই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিকার স্বাভাবিক পদক্ষেপ। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের এটাই হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু নারী পুরুষের সম্পর্ক, প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কতো রেষারেষির সম্পর্ক নয় ; মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বাদানুবাদের সম্পর্ক নয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এক পূত পবিত্র সম্পর্ক, যার মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রতিকারের আবশ্যকতা দেখা দিলে তার পথ ও পদ্ধতি নির্যাতন বা জ্বালাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। সেই পথ সৌহার্দ্য স্থাপনের, সমঝোতা সৃষ্টির, সম্প্রতি স্থাপনের এবং সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার।

কমনীয়, সূক্ষ্ম ও পূত পবিত্র অনুভূতির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে পারিবারিক সৌহার্দ্য প্রতিস্থাপিত করে মধুর দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলাই সমাজের লক্ষ্য। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ধ্বনি তুললে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হবেনা- আমার এই অভিমত বিবেচনার জন্য আমি নারী নির্যাতন প্রতিরোধের প্রবক্তাগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। তারা যদি সাড়া দেন তা হলে আমি তাদের সক্রিয় সাহায্য করতে এগিয়ে যাব।

www.pathagar.com

৬৬ঃ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এখন সরকারের স্বঘোষিত সর্বপ্রধান কর্মসূচী। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সরকার যে সচেতন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ নেই। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন বাৎসরিক ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এই ব্যয়ের অধিকাংশ অর্থ আসছে অনুদান হিসাবে ; অর্থাৎ ভিক্ষা হিসাবে, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশের জন্য যে অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা খুব সম্ভব এগারো কোটিতে পৌঁছে গেছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বলেছেন, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির বাৎসরিক হার নেমে ২৬ শতাংশে এসেছে বলে সরকারী পরিসংখ্যানে যে দাবী করা হয়েছে এই পরিসংখ্যানটাই মনে হয় ভুল। প্রেসিডেন্টের এই স্বীকারোক্তি প্রশংসার যোগ্য। বাস্তবে জনসংখ্যা লাগামহীন হারে বেড়েই চলেছে। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন দম্পতির ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৮/১০ জন পর্যন্ত এখনো পরিলক্ষিত হয়। আমার মনে হয়, গড়পড়তা প্রত্যেক দম্পতির ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৫-এর কম হবে না। অবস্থা দৃষ্টে এটাও মনে হয়, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের মন-মানসিকতা মোটেই সৃষ্টি হয়নি।

আমার প্রথম সুপারিশ, দেশের চারটি বিভাগের ৪টি উপজেলায় একটি জরুরী ভিত্তিক বিশেষ আদম শুমারী করে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির প্রকৃত হার নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। তিন মাসের মধ্যে এই বিশেষ আদম শুমারী সমাপ্ত করা মোটেই কঠিন হবে না। এই বিশেষ শুমারীর মাধ্যমে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির এমন প্রচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরতে হবে যার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম আবশ্যক মতো পরিশোধন-পরিবর্ধন করা যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কোন গলদ রয়ে গেছে, যে জন্য এই কার্যক্রমের অপরিহার্যতা দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ লোক এখনো উপলব্ধি করতে পারেনি। আমার ধারণা, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি রোধ করার প্রচারণার মধ্যেই গলদ নিহিত রয়েছে। প্রত্যেকদিন রেডিওতে দীর্ঘক্ষণ ধরে যে প্রচারণা চালানো হয় তা দম্পতিদের মনে বিশেষ কোন রেখাপত করতে পারে বলে আমি মনে করি না। প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু হলো গোটা জাতি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ না করলে জাতির অবস্থা যে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে তা, অশিক্ষিত দম্পতিদের মনে কোনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। জাতি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তাদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা সব কিছুই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পরিবার কেন্দ্রিক। তাদের সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পরিবারকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনাও দীর্ঘমেয়াদী নয়, বরং স্বল্পমেয়াদী। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের চিন্তাধারা আগামী ২/১ দিনের মধ্যেই সীমিত। আগামীকালের কর্মসংস্থান হয়ে গেছে- এটা তাদের জন্য বিরাট সন্তুষ্টির বিষয়। আগামী কয়েক দিনের কর্ম সংস্থান তো তাদের কাছে মহা আনন্দের বিষয়। এই জনগোষ্ঠি, যার সংখ্যা দুই কোটির কম হবে না, এরা কেবল বেঁচে থাকার জন্য আগামী

www.pathagar.com

দিনের খাদ্য চিন্তা ছাড়া অন্যকোন চিন্তাই করে না, করতে পারেনা। এদের এমন চিন্তা শক্তি বিকাশ লাভই করেনি। তারা ভাবে, বছর বছর স্ত্রী যে একটি করে বাচ্চা প্রসব করছে, এটাতো স্বাভাবিক, এটাতো আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে। মোল্লা সাহেব, ইমাম সাহেব তো অহরহ বলছেন, রিযেকের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য রিযেকের বরাদ্দ করে রেখেছেন, তাই বাচ্চা প্রসব নিয়ে তাদের মাথা ঘামানো অবান্তর।

এই উচ্চতর অর্থনৈতিক অবস্থানের আরো দুই কোটি লোকের কিছুটা সম্পদ, না হয় চাকুরী আছে। এরা স্বহস্তে কাজ করে, মাঠে-প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে। এদের অবস্থাও প্রায় ঐরূপ। এরা দিনমজুর না হলেও এদের সীমিত আয় পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এদেরও প্রধান ধান্দা, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা। এরা কেউ মাসের পর বেতন পায়, কেউ কয়েক মাস পর পর নিজের ক্ষেত থেকে কিছুটা শস্য পায়, কেউ হাট বাজারে বিকিকিনি করে কিছুটা উপার্জন করে। এরা তাকিয়ে থাকে হাট বাজারের দিকে, না হয় মাস শেষে বেতনের দিকে, না হয় মৌসুম শেষে ফসলের দিকে। এদেরও চিন্তার দৌড় দীর্ঘ নয়। এরা ও বছর বছর একটি করে বাচ্চার আগমন আল্লাহর দান হিসাবেই ধরে নেয়।

এই মনোবৃত্তি পরিবর্তনের পদক্ষেপ যাই নেয়া হয়ে থাক না কেন, এটা গণমানুষের মনে এখনো দাগ কাটতে পারেনি। তাই পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সাফল্য লাভ করতে পারছে না। আমার ধারণা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের পুরো কার্যক্রমটি জাতিকেন্দ্রিক নয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক করতে হবে, পরিবারকেন্দ্রিক করতে হবে। অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণ সমস্যা, এদের সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সমস্যা, এদের রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক সমস্যা এদের শিক্ষা সমস্যা ; এককথায় এদেরকে সুযোগ্য কর্মঠ মানুষ করে গড়ে তোলার দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে দম্পতিকে জ্ঞানদান করে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ হলো, গোটা সমাজে ছেলে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত সময় বা বয়স সম্বন্ধে একটা চিন্তা-ভাবনা চালু করা। ছেলেদের স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করা উচিত নয়- এই যুক্তি অকাট্য। প্রচারণার মাধ্যমে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। ২৫ বছর বয়সের পূর্বে খুব কম ছেলেই স্বাবলম্বী হয়। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত ছেলেরা ২৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে জীবনে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ছেলেদের বেলায় ২৮ বছরের পূর্বে বিয়ে না করার পরামর্শ যুক্তি সঙ্গত।

এই পরামর্শের বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া হবে বলে মনে হয় না। মেয়েদের বেলা সমস্যাটা একটু কঠিন। তবে এখন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে তাতে মেয়েদের মধ্যেও প্রচার একথা করা অযৌক্তিক হবে না যে, ২০ বছরের পূর্বে কোন মেয়েই স্ত্রী হওয়ার জন্য মানসিক যোগ্যতা ও দায়দায়িত্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনা। মেয়েদের উপার্জনের, উৎপাদনের যোগ্যতা থাকলে শ্বশুর বাড়ীতে তারা আদুরে বউ বলে গণ্য হবে, আর বিপদে আপদে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে- এই বাস্তব কথাটি গণ মাধ্যমের প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানলাভ করা উচিত। মেয়েদের উৎপাদনশীল

www.pathagar.com

কাজ শিক্ষাদান সম্বন্ধে অর্থনৈতিক সমস্যা অধ্যায়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রস্তাবনা রাখবো। উচ্চ শিক্ষার দিকে মেয়েদের যতোই আকৃষ্ট করা যাবে ততোই অল্প বয়সে বিয়ের সম্ভাবনা কমবে। ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স যদি একবছর করে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা দেবে। তাছাড়া সরকার সমর্থিত বয়সে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক বিয়েতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি সুন্দর আকর্ষণীয় উপহার দেয়া যেতে পারে। এটা হতে পারে একটি সুন্দর ব্যাগ। এর মধ্যে থাকবে ছোট পরিবার ও বড় পরিবারের তুলনামূলক স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের আকর্ষণীয় কার্টুন ছবি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় সামগ্রী ও কিছু প্রসাধনী সামগ্রী এবং একটি সুন্দর ছোট রেডিও। এসব উপহার হিসাবে পেলে নব দম্পতির মনে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে রেডিও শুনে শুনে ছোট পরিবারের সুবিধা বুঝে উঠতে তাদের বেশী বিলম্ব হবে না।

সর্বোপরি আলিম সমাজ এই ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে পারেন। কোরআন–হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা মানুষকে বুঝাতে পারেন বিয়ের উপযুক্ত বয়স কি? শিশুদের যত্ন করে মানুষ তৈরী করতে তাদের দায়িত্ব কি? তাই এক্ষেত্রে আলিম সমাজের সহযোগিতা অপরিহার্য। আলিমগণ প্রত্যেক ওয়াজ মাহফিলে যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স সম্বন্ধে এবং ছেলেমেয়েদের সুযোগ্য মানুষ গড়ে তোলার দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন তবে সমাজে অবশ্যই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগবে।

এই সম্পর্কে–সুচিন্তিত পরামর্শ সম্বলিত সুন্দর সুন্দর কোটি কোটি পুস্তিকা সারাদেশে বিতরণ করলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাবে। এই পুস্তিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা প্রত্যক্ষভাবে না বলে পরোক্ষভাবে বললে ভাল হবে। সুদৃশ্য কার্টুন ছবির মাধ্যমে ছোট পরিবার ও বড় পরিবারের স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের দৃশ্য তুলে ধরলে মানুষের মনে সহজে রেখাপাত করবে। এই সব কার্টুন ছবির রঙ্গিন পোষ্টার দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সারাদেশের সকল শিক্ষাঙ্গন– বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সকল মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজকে এইসব সুন্দর পোষ্টার দিয়ে সুশোভিত করে তুলতেহবে।

সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার ও অজ্ঞতার প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ অভিযানের চেয়ে পরোক্ষ অভিযানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পরোক্ষ অভিযানের আকর্ষণীয় ও অভিনব নতুন নতুন কার্যক্রম উদ্ভাবন করতে হবে।

www.pathagar.com

৬·৭ঃ মাদকাসক্তি সমস্যা

মাদকাসক্তি বিশ্বব্যাপী যুব সমাজের একাংশকে অকর্মণ্য, চেতনাহীন করে ফেলেছে। ইউরোপ–আমেরিকার প্রাচুর্য্যের দেশসমূহে মাদকাসক্তি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাদকাসক্ত যুবকেরা আইন শৃংখলার প্রতি হুমকি স্বরূপ বিচরণ করছে। কিছুকাল থেকে মাদকদ্রব্য তৃতীয় বিশ্বে চোরাই পথে প্রবেশ করছে। বিগত ৮/১০ বছরে বাংলাদেশও মাদকদ্রব্যের জমজমাট বাজারে পরিণত হয়েছে। জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত, হতাশাগ্রস্ত যুবকেরা ক্রমেই মাদকদ্রব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

আশার কথা এই যে বাংলাদেশ সরকার এই সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফার্ষ্টলেডির নেতৃত্বে 'নারকোটিকস্ কন্ট্রোল বোর্ড' গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে একটি 'নারকোটিকস্ কন্ট্রোল সেল' স্থাপিত হয়েছে। আশা করা যায়, সরকার অনতিবিলম্বে মাদকাসক্তি সমস্যার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলবেন। তবে জনগণের সহযোগীতা ছাড়া সামাজিক কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। আমাদের দেশের জনসাধারণ এখানো মাদকাসক্তি সমস্যা সম্বন্ধে অবহিতই হননি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সমাজের উচ্চস্তরের ভদ্র পরিবারের একটি মেধাবী যুবক মাদকাসক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো ; তার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন বুঝতেই পারলেন না যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারই ছেলেটিকে শারীরিক মানসিক ভাবে ধ্বংস করছে। যখন তারা বুঝলেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এখন পিতা মাতাও হতাশ হয়ে প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছেন। এইরূপ শত শত সম্ভাবনাময় যুবক ঢাকা শহরেই তাদের পিতামাতার উপর অবাঞ্ছিত বোঝা হয়ে গেছে।

কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ বাংলা যুব কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১ জানুয়ারী (১৯৯০ ইং) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে "মাদকাসক্তিঃ সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালের সাবেক ডিরেক্টার এবং প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সামাজিক চিন্তাবিদ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা (আমার কন্যা) ফারহানা হক রহমানের লিখিত ভাষণে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, চোরাচালান ও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির এমন সব তথ্য স্থান পেয়েছে যা আমাদের অনেকেরই জানা ছিলনা। তাই তার সুদীর্ঘ ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম ঃ

> "মাদকদ্রব্যের অবৈধ উৎপাদন, অবৈধ ব্যবসা এবং বিশ্বব্যাপী অবৈধ পাচার আন্তর্জাতিক ব্যবসা ; কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা, যা মানুষের জন্য বয়ে নিয়ে আসে অকল্পনীয় অপচয়, অচিন্তনীয় দুঃখ–বেদনা, অসহনীয় ভোগান্তি ও তিলে তিলে মৃত্যুবরণ। কোকেন, ক্রেক, হিরোইন, এল এস ডি ওপিয়াম, স্পীড, এসব মারাত্মক মাদকদ্রব্য। মানুষ এই সব মারাত্মক মাদক দ্রব্যের ফাঁদে একবার পা

www.pathagar.com

দিলে আর রক্ষা নেই। কারাগার থেকে অপরাধীরা পালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু মাদকাসক্তির এই জঘন্য কারাগারে একবার পা দিলে পালিয়ে যাবার ইচ্ছাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আসক্তি দিন দিন বাড়তেই থাকে। চিন্তাশক্তি নেশার বেড়াজালে পাক খেয়ে খেয়ে বিকৃত হয়ে যায়; সমস্ত শরীরটাই অবশ হতে থাকে। কর্মশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি জীবনীশক্তি খর্ব হয়ে যায়।"

তার প্রদত্ত ভাষণে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ "মাদকাসক্তির ক্ষণিকের মজা একবার উপভোগ করলে, সেই উপভোগকারীর আর নিস্তার নেই। একটুখানি মাদকদ্রব্য সেবনের জন্য, একটি বার সূচাগ্রের খোঁচার মজা অনুভব করার জন্য, একটিবার দম নেবার জন্য তার তারা শরীর তখন আহাজারী করতে থাকে। সে তখন আর অন্য কোন চিন্তাই করতে পারে না। অভ্যাসের দাস হয়ে সে তখন তার কাংখিত মাদকদ্রব্যের জন্য পাগল হয়ে যায়।"

"এতদিন মাদকাসক্তি সমস্যা বিশ্বের শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোর মধ্যেই অনেকটা সীমিত ছিলো। কিন্তু এখন "ড্রাগ লর্ড" বা "মাদক সামন্তদের" অর্থ লিপ্সার জন্য এটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বব্যাপী। প্রভাবশালী, প্রতাপশালী মাদক–সামন্তরা কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করেছে তাদের ব্যবসার ফাঁদ। দেশে দেশে নিযুক্ত করেছে প্রতাপশালী এজেন্ট।"

"এতদিন তারা ধরে নিয়েছিলো, অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলোতে তাদের ব্যবসার বিশেষ সুযোগ নেই। ঐ সব দরিদ্র দেশের মানুষ মাদক দ্রব্যের আস্বাদ নেয়ার মত অর্থ পাবে কোথায়? কিন্তু এখন তাদের ভুল ভেঙ্গে গেছে। এখন তারা দেখছে, দারিদ্র প্রপীড়িত দেশেও এক শ্রেণীর যথেষ্ট যুবক রয়ে গেছে যাদের অর্থ আছে, আর না থাকলেও তারা নির্বিঘ্নে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে, বল প্রয়োগ করে অর্থ যোগাড় করে নিতে পারে। তাই মাদক সামন্তরা এখন তাদের ব্যবসা প্রসারের জন্য দরিদ্র দেশগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তারা অগ্রাধিকার দেয় সেই সব দেশকে যেসব দেশের প্রশাসনকে তারা বশে নিয়ে আসতে পারে। অফুরন্ত পুরস্কার প্রলোভন দিয়ে তারা তাদের ব্যবসা চালাবেই। যে কোন ঝুঁকি নিয়ে, এমনকি বল প্রয়োগ করেও তারা ব্যবসা চালিয়ে যাবে।"

"স্মরণ করা যেতে পারে, উনিশ শতাব্দীর সেই "ওপিয়াম ওয়ার" বা আফিম মহাযুদ্ধের" কথা। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা চীনদেশের সাথে আফিম ব্যবসায় বাধাপ্রাপ্ত হলে বৃটিশ সম্রাট যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উদ্দেশ্য "আফিম ব্যবসা বন্ধ করা যাবে না।"

"অধুনা কলম্বিয়ায় যে গেরিলা যুদ্ধ চলছে তারও সূত্র ঐ একই। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার "গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গল" সদর্পে ব্যবসা সম্প্রসারিত করেছে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত।"

"কলম্বিয়া, বলিভিয়া এবং পেরু রাষ্ট্র সমূহে মাদকদ্রব্য উৎপাদন একটি প্রধান শিল্প। পানামাতে মাদক ব্যবসা রাজনৈতিক শক্তিকেই দুর্নীতি পরায়ণ করে তুলেছে। আমাদের সোনার বাংলায় আপাতঃদৃষ্টিতে মাদকাসক্তি কোন সামাজিক সংকটে পরিণত হয়নি। কিন্তু সংকট ঘনিয়ে আসছে। পরম পরাক্রমশালী মাদক সামন্তরা বাংলাদেশকে তাদের মাদক সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করে নিয়েছে"

www.pathagar.com

মাদকাসক্তি এমন একটা ভয়াবহ নেশা যা প্রতিরোধ করতে না পারলে বিশ্বব্যাপী এর প্রতিক্রিয়া গোটা মানবজাতিকেই মনুষ্যত্বহীন করে ফেলবে। আশার কথা, জাতিসংঘ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং বাংলাদেশ সরকার মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ফারহানার প্রদত্ত ভাষণে মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণের একটি সুস্পষ্ট পরামর্শ রয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে শুধু বাংলাদেশের মতো দরিদ্রতম দেশই নয়, গোটা বিশ্বকে মাদকমুক্ত করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আশার বাণীটি হলোঃ

"উন্নত বিশ্বের অনেকে হয়তো বলবেন, দূর দূরান্তের দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, লাওস, পেরু, এদের দরিদ্র জনগণের জন্য আমাদের দুঃখ হয় অবশ্যই। কিন্তু তারাতো দূরে, বহুদূরে। আমাদের কাছেও তো সমস্যা আছে। কিন্তু মাদকাসক্তি একটা যোগসূত্র বের করে দিলো। দরিদ্র দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য প্রাচুর্য্যের দেশে গিয়ে তাদের তরুণদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। মাদকাসক্তির আসল ভুক্তভোগী প্রাচুর্য্যের দেশগুলো তাদের তরুণদের রক্ষা করার জন্য যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছেন, তার একাংশ ব্যয় করলে মাদকদ্রব্য উৎপাদনের উৎস বন্ধ করে দেয়া সম্ভব। প্রাচুর্য্যের দেশগুলো এগিয়ে আসলে দরিদ্র দেশগুলো অবশ্যই সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিবে। মাদক–ভীতি উন্নত বিশ্বে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার পরিবেশ সৃষ্টি করলে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের উন্মোচন হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই, দরিদ্র দেশ আর প্রাচুর্য্যের দেশতো একই পৃথিবীর অধিবাসী। তবে কেন আমরা একযোগে কাজ করে পৃথিবীটাকে সকলের বসবাসের উপযোগী করে তোলতে পারবো না?"

www.pathagar.com

৬.৮ঃ সামাজিক সমস্যা পরিক্রমা

এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক সমস্যার তালিকায় আমরা শাখা প্রশাখা সহ ২২টি সমস্যা চিহ্নিত করেছি। এই অধ্যায়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনায় আমরা ৭টি জরুরী সমস্যার উপর আলোচনা করেছি এবং এসব সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব রেখেছি। যে কোন পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমাদেরই চিহ্নিত করা বাদ বাকী ১৫টি সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোন সুপারিশ তো পুস্তকে নেই। প্রশ্নটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। এই প্রশ্নের উত্তর হলো, সামাজিক প্রত্যেকটি সমস্যাই দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই, দুর্নীতি এখন সামাজিক সমস্যাবলীর অন্যতম শীর্ষস্থান পাবার যোগ্য। দুর্নীতি গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করে ফেলেছে। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী। কিন্তু দুর্নীতির সামাজিক সমাধান তো নেই বললেই চলে। দুর্নীতি সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল রাজনৈতিক সংকল্পের উপর, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর। ঠিক তেমনি ভাবে ভিক্ষাবৃত্তি, বিশেষ করে ভিক্ষার মনোবৃত্তি, একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিরও সামাজিক সমাধান অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক সংকল্প, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম তথা দারিদ্র বিমোচনের প্রয়োজন।

বস্তুতঃ দেশের গণমানুষের সার্বিক সমস্যা, যে গুলোকে আমরা চারটি মৌলিক ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির শাখা প্রশাখা চিহ্নিত করেছি, সেই সব মৌলিক কোন একটি সমস্যার সমাধানই একক ভাবে, বিচ্ছিন্ন ভাবে সম্ভব নয়। কারণ গণমানুষের সকল সমস্যাই একটার সঙ্গে আর একটা অল্প বিস্তর অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত।

দেশ-বিদেশের পুঁথি-পুস্তকে, পরিকল্পনা প্রকল্পে কোন একটা জাতির সার্বিক সমস্যা এবং তার সমাধান সম্বন্ধে 'রেডিমেড ফর্মূলা' খুঁজে পাইনি। অথচ বিশ্বের বহুদেশে গণ মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে, সাফল্য অর্জনও হয়েছে। মানুষের সার্বিক সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক সংকল্প, সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক অবকাঠামো, গণমুখী কার্যক্রম, সামাজিক সহযোগিতা আর অর্থনৈতিক সুবিন্যস্ত উৎপাদনশীল পরিকল্পনা প্রকল্প, এই সবের যুগপৎ সমন্বয় ঘটাতে পারলে অধিকাংশ সমস্যার, বিশেষ করে সামাজিক সমস্যার সমাধান স্বয়ংক্রিয় ভাবেই হতে থাকবে।

এই সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো এই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে।

www.pathagar.com

৭ ঃ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

৭.১ ঃ ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরা খুবই কঠিন। সরকার যথেষ্ট প্রশংসাজনক পরিসংখ্যান প্রকাশ করছেন। কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যান থেকে যে চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে সেটি কিছু ক্ষেত্রে সঠিক চিত্র নয়। এর অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। পরিসংখ্যান-বিদরা তো আর সারাদেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে স্বচক্ষে দেখে পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেন না। এটা সম্ভবও নয়। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তো আদম শুমারীর মত বা গবাদি পশু শুমারীর মত মাথা গুণতির বিষয় নয়। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান একটি বিরতিহীন প্রক্রিয়া। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোকের জীবন-জীবিকা মাটি ও পানির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। মাটি ও পানি থেকে উৎপাদন-প্রক্রিয়া আবার মৌসুমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৌসুম পরিবর্তনের সাথে মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমও পরিবর্তন হতে থাকে। একই মৌসুমে বিভিন্ন প্রকারও বহুমূখী কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়। এমনকি, একই মৌসুমে প্রাকৃতিক কারণে প্রায়শঃ কার্যক্রম পরিবর্তন করতে হয়। পরিবর্তন না করে উপায়ও থাকে না। যেমন শুক্‌নো মৌসুমে যখন চাষীরা কেবল সেচের পানি সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করছে, তখনি হঠাৎ একফসলা বৃষ্টি হয়ে গেলো। সাথে সাথে চাষীদের কার্যক্রমে আসলো পরিবর্তন। দূর থেকে বা ভূ-গর্ভ থেকে পানি সংগ্রহের অভিযান ছেড়ে দিয়ে চাষী তখন পানি সংগ্রহের সংগ্রামে লিপ্ত হলো। এই সংগ্রামও সহজ নয়। চাষাবাদের সকল ভূমিতো আর সমতল নয়। অসমতল জমিতে পানিতো আর বসে থাকেনা; পানিকে ধরে রাখতে হয়। না হলে তা গড়িয়ে চলে যায়। ছোট্ট ছোট্ট খন্ড-জমিতেও একজন চাষীকে পানি সংরক্ষণের জন্যে সুদীর্ঘ বাঁধ দিতে হয়; কারণ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় যৌথ বাঁধ দেয়ার পরিবেশ বা মনোবৃত্তি সেখানে অনুপস্থিত। তাছাড়া চাষীর তো দুশমন অনেক। কাকঁড়া বাঁধের মধ্যে একটি ফুটো করলে একরাতেই পানি শেষ। প্রতিবেশী চাষীরাও অনেক সময় কাকঁড়ার ভূমিকা পালন করতে দ্বিধা বোধ করে না। আর সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হলো, দু-চারটি টাকিমাছ বা পুটিমাছ ধরার জন্যে চাষীর বাঁধ কেটে দেবার মত লোকের অভাব হয় না। এই জঘন্য অপরাধের জন্যও যে সারাদেশে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তার বিবরণ একটু পরেই দিচ্ছি।

এই প্রেক্ষিতেই দেশের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তৈরী হয় সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক। আর সেই অনুমানের কাজ করেন অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। তাই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে এমন সব মারাত্মক ভুল থেকে যায় যা প্রমাণ করার জন্য মাঠে ঘাটে যেতে হবে না, টেবিলের উপরই তা নির্ঘাত প্রমাণ করা যাবে।

www.pathagar.com

৭·২ ঃ দারিদ্রের দুষ্টচক্র

বাংলাদেশের অর্থনেতিক সমস্যাবলীর যে তালিকা এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি সেই তালিকাটি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে দেশের চরম করুণ দারিদ্র, ক্রমবর্ধমান অন্তিম দারিদ্র এবং এই চরম দারিদ্রের অনিবার্য সহচর প্রকট বেকারত্ব, শিক্ষিত দক্ষ লোকের বেকারত্ব, অশিক্ষিত অদক্ষ লোকের বেকারত্ব, কর্মক্ষম লক্ষ লক্ষ পুরুষের সার্বক্ষণিক বেকারত্ব, কোটি কোটি লোকের খন্ডকালীন বেকারত্ব, কোটি কোটি নারীর সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন বেকারত্ব, যাকে আমরা সার্বজনীন বেকারত্ব বলতে পারি এই বেকারত্ব সমকালীন চরম করুণ দারিদ্রকে দিন দিন দ্রুতগতিতে আরো বেশী প্রকট, আরো বেশী করুণ করে ফেলেছে। বাজারে যেমন কোন দ্রব্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে হুড় হুড় করে তার মূল্য বাড়তে থাকে, আবার মূল্য বাড়তে শুরু হলে বাজার থেকে ঐ দ্রব্য অদৃশ্য পথে উধাও হয়ে ঘাটতিকে আরো ঘনীভূত করে তুলে, যার প্রতিক্রিয়ায় মূল্য আরো বেশী বাড়তে থাকে; অর্থনৈতিক এই 'দুষ্টচক্র' দারিদ্র–বেকারত্বের বেলায় সমভাবে আঘাত হানে। কিন্তু এটাকে তখন আর দুষ্টচক্র বলা উচিত নয়। কারণ এটা তখন দুষ্টলোভী মানুষ কর্তৃক সৃষ্টি হয় না; এটা তখন স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এক ভয়াবহ 'জঘন্য চক্র' সৃষ্টি করে। দারিদ্র থেকে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়, বেকারত্ব থেকে দারিদ্র ঘনীভূত হতে থাকে, ঘনীভূত দারিদ্র থেকে বেকারত্ব প্রকটতর হয়, প্রকটতর বেকারত্ব থেকে দারিদ্র প্রকটতম হতে থাকে; আর এই দারিদ্র–বেকারত্বের 'জঘন্য চক্র' একটি জাতিকে, একটি দেশকে রসাতলে নিয়ে যায়। আজকের বাংলাদেশ এই দারিদ্র বেকারত্বের জঘন্য চক্রের শিকার হয়ে রসাতলে পৌঁছে গেছে; আর রসাতলের তলাহীন অতলের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে।

উপরের মন্তব্যগুলো কি অতিরঞ্জিত হয়ে গেলো? এই মন্তব্যগুলো কি বাস্তবতার একবিন্দুও অত্যুক্তি? দেশের ১১ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত ছয় কোটি মানুষ মানবেতর অবস্থায় কেবল কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ ছাড়া আর কোন চিন্তাই করতে পারে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা কি এই ছয় কোটি মানুষকে সোনার বাংলায় পাঠিয়েছিলেন কেবল বেঁচে থাকার ধান্দা নিয়ে দিনরাত সংগ্রাম করতে, বণ্য পশুর মত কেবল খাবার সংগ্রহের জন্যই ঘুরে বেড়াতে, ময়লা নর্দমার কীট পোকার মতো কিলবিল করে কেবল বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে? পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি এই জটিল প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে।

www.pathagar.com

৭·৩ ঃ দারিদ্রের করুণ চিত্র

আন্তর্জাতিক দারিদ্রের নিম্নতম সীমারেখারও বহু নীচে অবস্থানকারী আমাদের দেশের এই ছয় কোটি মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে কেবল প্রাণে বেঁচে থাকার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই করতে পারেনা; অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে, অস্থিসার, চিন্তাশক্তিহীন, কর্মশক্তিহীন, আগ্রহহীন, মেধাহীন, হিতাহিত জ্ঞানহীন, ন্যায়-অন্যায়, পাপপূণ্য, হালাল-হারাম- বৈধ-অবৈধ, এসবের চেতনাহীন, নিকৃষ্টতম পশুর চেয়েও নিম্নতর অবস্থানে বসবাস করছে। শহরাঞ্চলের সংলগ্ন রেলপথ-রাজপথ ঘেঁষে পরিত্যক্ত পলিথিনের আচ্ছাদনের নীচে আস্তানা গেড়েছে হাজার হাজার পরিবার। ভোর হবার সাথে সাথে এদের ছেলেমেয়েরা ছুটে যায় শহরের রাজপথ, অলিগলি, কাঁচাবাজার ইত্যাদিতে পরিত্যক্ত খাদ্যের স্তূপীকৃত আবর্জনার সন্ধানে। সেখানে তাদের প্রতিযোগিতা চলে নেড়ী কুকুরের সাথে, চিল-কাকের সাথে, এইসব আবর্জনা স্তুপ থেকে কিছুটা খাদ্য উদ্ধার করতে। এরূপ ভাবে পরিত্যক্ত খাদ্য সংগ্রহ করে এই সব ছেলে মেয়েরা ফিরে যায় তাদের পলিথিনের আস্তানায়। তারপর বেলা কিছুটা বাড়লে বুড়োবুড়ি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বের হয় ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে, আর বয়স্ক ছেলেরা ছুটে যায় কাজের সন্ধানে। যুবতী কিশোরী মেয়েরা দিনভর ঘুমায় ঐ আস্তানায়। কারণ রাতের বেলায়তো তাদের ঘুমানোর সুযোগ নেই। সন্ধ্যার পর যে যা পেয়েছে তা নিয়েই আস্তানায় ফিরে। আর পিতামাতা যুবতী-কিশোরীদের সাজিয়ে গুজিয়ে আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দেয় দেহ ব্যবসা করে দু'মুঠো খাদ্য সংগ্রহ করে আনতে। এই যুবতী-কিশোরীরা দালালদের ছত্র-ছায়ায় সারারাত ঘুরে বেড়ায় মক্কেলের সন্ধানে; আর ভোরের দিকে ফিরে যায় ঐ আস্তানায় সারারাতের পাপলব্ধ গোটা কয়েক টাকা নিয়ে।

দারিদ্রের কষাঘাতে, পেটের জ্বালায়, অপুষ্টিতে কংকালসার মানুষ স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে দুনিয়ার সকল সাধ, সকল আশা বিসর্জন দিয়ে কেবল বেঁচে থাকার জন্য দু-মুঠো খাদ্য সংগ্রহ করতেও যখন ব্যর্থ হয়, তখন বিসর্জন দেবার মতো একমাত্র বাকী থাকে "মনুষ্যত্ব"। একদিকে মনুষ্যত্ব, ধর্মীয় অনুভূতি, বিবেকের দংশন, আরেক দিকে নিজের পেটের জ্বালা, ক্ষুধার্ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যার আর্তনাদ- এই দুই পরস্পর বিরোধী অবস্থার সংঘাতে এক সময় "মনুষ্যত্ব" পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তখনই পিতামাতা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে পাপাচারের দিকে এগুতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আপন যুবতী কিশোরী মেয়েদের পাঠিয়ে দেয়, দেহ ব্যবসা করে দু'মুঠো খাবারের জন্য কিছু উপার্জন করে আনতে, আর ছেলেদের পাঠিয়ে দেয় চুরি করে হোক, প্রতারণা করে হোক, হাইজ্যাক করে হোক, যেমন করে হোক, কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে। একবার অবৈধ পথ ধরে নিলে আর মনুষ্যত্ব বা বিবেক অন্তরে উঁকিঝুঁকিও দেয় না। তখন অবৈধ পথই হয়ে যায় বেঁচে থাকার সহজ পথ। দারিদ্রের অভিশাপ এতোই নির্মম, এতোই নিষ্ঠুর।

www.pathagar.com

৭·৪ ঃ দারিদ্র–বেকারত্ব

দারিদ্রের চারপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে অশিক্ষিত, অদক্ষ, এমনকি শিক্ষিত দক্ষ বেকার যুবক–যুবতী, যারা রঙ্গিন স্বপ্ন নিয়ে বহু কষ্টে, বহু ব্যয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার বাস্তুভিটা বিক্রি করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলো, আর এখন বেকারত্বের অভিশাপে তারা জীবন সংগ্রামের রূঢ় বাস্তবতায় দাঁড়াবারই সুযোগ পাচ্ছেনা। হতাশার অন্ধকারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কেউ যাচ্ছে অপরাধের পথে, আবার অপরাধ–মাধ্যমে অর্জিত টাকা দিয়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা সেবন করে মনের জ্বালা নিভাতে গিয়ে চিরতরে মাদকাসক্ত হয়ে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই দৃশ্য এখন প্রায় সারা দেশেই বিস্তার লাভ করেছে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের সুযোগে কেবল জেলা সদরেই নয়, দেশের ৪৬০টি উপজেলা সদরেও এই অবস্থা বিস্তার লাভ করছে। এর শেষ কোথায়?

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধান লক্ষণ হলো দেশের অন্তত ৯০ শতাংশ লোকের আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতা। অর্থাৎ ১১ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি লোকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। উল্লেখ্য যে, এই ১০ কোটি লোক মোটামুটিভাবে বৈধ আয়ের উপর নির্ভরশীল। এদের অবৈধ আয়ের সুযোগ নেই, অথবা অবৈধ আয়ের মনোবৃত্তিও নেই। বাকী ১ কোটি লোকের বৃহদাংশ বৈধ অবৈধ আয় মিলিয়ে কোন মতে জীবন জীবিকার অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় সংকুলান করে থাকেন। এই জনগোষ্ঠিকেও স্বচ্ছল বলা যায় না। এরা যান্ত্রিক সভ্যতার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনা। এদের কিশোর কিশোরীরা আর্থিক অনটনে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এদের পরিবারের কোন ব্যক্তি একটুখানি কঠিন পীড়াগ্রস্থ হলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অপারগ। কারণ সুচিকিৎসা গ্রহণ করতে গেলে বিদেশে যেতে হবে, যা অবশ্যই ব্যয়বহুল। এদের সীমিত আয় দিয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া সম্ভব নয়। আর দেশের অভ্যন্তরে উন্নতমানের চিকিৎসার তো কথাই উঠেনা। মাত্র এক যুগ পূর্বেও মোটামুটি ভাল চিকিৎসা দেশের প্রায় সকল হাসপাতালে পাওয়া যেত, আজ সেটা আর নেই। এই জনগোষ্ঠির মেধাবী ছেলেমেয়েরাও উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কারণ দেশের অভ্যন্তরে একটু উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে গোটা কয়েক শহরভিত্তিক বিদ্যালয়ে। এগুলোতে ভর্তি হওয়া হিমালয় পর্বত আরোহণের মতই কঠিন, আর ব্যয়ও অত্যন্ত বেশী। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অচলই হয়ে আছে। উচ্চ মেধাবী হোক, আর স্বল্প মেধাবী হউক, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পার হবার পর উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হলে যেতে হবে বিদেশে। উপরে বর্ণিত মধ্যবিত্তরা তো বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যয় মিটাবার আর্থিক ক্ষমতা রাখেননা। তাই মেধার বিকাশ লাভও এখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে শহরাঞ্চলের অল্প সংখ্যক বিত্তশালী পরিবারের মধ্যে।

www.pathagar.com

৭·৫ ঃ দারিদ্র কবলিত দশ কোটি

দারিদ্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। কিন্তু এমন কোন সংজ্ঞা তো খুঁজে পাইনি যে সংজ্ঞায় আমার দেশের অন্তত ১০ কোটি লোককে দরিদ্র ছাড়া আর কোন আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায়। তাই আমরা বাংলাদেশের ১০ কোটি লোককে দরিদ্র হিসাবেই চিহ্নিত করে নিয়েছি। বাদ বাকী ১ কোটির বৃহদাংশকে মধ্যবিত্ত বলা যেতে পারে। আর ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করতে হবে। এক ভাগের নাম দেয়া যেতে পারে উচ্চ মধ্যবিত্ত, আর একভাগকে আখ্যা দেয়া যেতে পারে ধনকুবের, যারা রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছেন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখবো ঐ ১০ কোটি মানুষের সমস্যার মধ্যে, যাদেরকে আমরা দরিদ্র বলে চিহ্নিত করেছি।

দেশের এই ১০ কোটি মানুষই হলো সেই জনগোষ্ঠি যাদের জীবন-জীবিকার ভিত্তি হলো ভূমি, যার সাথে পানি সব সময়ই সম্পৃক্ত। এই দশ কোটি লোকের মধ্যে এক কোটি গৃহহীন, পাঁচ কোটি ভূমিহীন। এরা ভূমির মালিক নন, কিন্তু এদের জীবিকা অর্জন করতে হয় ভূমি ও পানি ভিত্তিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের দারিদ্র চরম প্রকট অন্তিম দারিদ্র সীমিত হয়ে আছে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে। খাদ্য উৎপাদন হয় ভূমি থেকে, পানি থেকে, যে পানি ভূমিরই একটি অঙ্গ। আর যারা খাদ্য উৎপাদন করেন তারাই দরিদ্র, যাদের উৎপাদিত খাদ্য দেশের অভ্যন্তরীণ আয়ের অধিকাংশ। সেই সার্বিক জনগোষ্ঠিই দারিদ্রের জন্য আপন আপন পরিবারের ভাগ্য উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমার এই মন্তব্যগুলো অপ্রিয় বটে, কিন্তু এগুলো কি অসত্য? আমার উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে কেউ হয়তো উস্কানির গন্ধ খুঁজে পাবেন। কিন্তু আমার বক্তব্যগুলো যদি অসত্য না হয়, তাহলে উস্কানির গন্ধ বিদূরিত করার কোন যাদুমন্ত্রতো আমার হাতে নেই। তবে এইটুকু ধরে নিতে পারি যে, আমার বক্তব্যের মধ্যে উস্কানির গন্ধ থাকলেও সেই গন্ধ ঐ ১০ কোটি লোকের কাছাকাছি গিয়েও পৌঁছবে না। কারণ এই পুস্তক ক্রয় করার ক্ষমতাও তাদের নেই। সর্বোপরি আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি নিজেতো সুনিশ্চিত। বাংলাদেশের দশ কোটি দারিদ্র জর্জরিত মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে তাদের মনুষ্যত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে জীবন-জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে ময়লা নর্দমার কীট পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট জীবন যাপন করুক, এটাতো আর সয়ে নিতে পারি না। দেশটা, জাতিটাতো রসাতলেই গিয়েছে। সেই রসাতল থেকে দেশ ও জাতিকে উত্থানমুখী পথের রূপরেখা দেয়াইতো আমার উদ্দেশ্য। এরমধ্যে যদি দোষনীয় কিছু থাকে তবে সে দোষের শাস্তি আমি মেনে নিতে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

৭৬ ঃ দারিদ্র বনাম কৃষি

সরকারী পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যায় বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের ৫০.১০% শতাংশই আসে কৃষিখাত থেকে। "কৃষি" কথাটার সনাতনী ও প্রচলিত অর্থ হলো "বছর বছর বা মৌসুমে মৌসুমে ভূমি চাষ করে ফসল উৎপাদন"। চা বাগানকে কৃষি খাতে গণ্য করা হয় না, কারণ চা গাছ একবার লাগালে বহু বছর পর্যন্ত পাতা–ফসল দিতে থাকে। আর সেই পাতাকে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় বলে চা বাগান হয়ে গেছে একটা শিল্প। কিন্তু পাট, আখ ইত্যাদিকে কৃষি খাতে গণ্য করা হয়; কারণ এগুলো উৎপাদনের জন্য বছর বছর বা মৌসুমে মৌসুমে চাষের প্রয়োজন হয়। অত্যন্ত লাভজনক ফলের গাছ যেমন, কাঁঠাল, আম, নারিকেল, পেয়ারা ইত্যাদিও আমাদের দেশের কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ এগুলো ঐ সনাতনী পন্থায় বছর বছর বা মৌসুমে মৌসুমে জমি চাষ করে চারা লাগাতে হয় না, আর বছরান্তে বা মৌসুমান্তে গাছ উপড়িয়ে ফসল ঘরে উঠানো হয় না। আমার মনে হয় "কৃষি" কথাটার সংকীর্ণ অর্থই হয়ে গেছে দেশের জন্য একটা অভিশাপ।

১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে ১৯৮৯ সালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষি উন্নয়নের যত সব পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার সবগুলোই সনাতনী প্রচলিত পন্থায় বছর বছর বা মৌসুমে মৌসুমে চাষাবাদের মধ্যেই সীমিত। ঐ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাই ছিল এদেশের মানুষের প্রধানতম খাদ্য, অর্থাৎ ধান চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সেই লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত না হলেও পরিকল্পনা প্রকল্প ব্যর্থ হয়নি। ধান চাউলের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিবিড় চাষাবাদের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিঘাপ্রতি বা একর প্রতি ফলন বাড়ানোর প্রক্রিয়া সাফল্যজনক ভাবে চালু করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের মাধ্যমে বহু অনাবাদী ভূমিকে আবাদযোগ্য করা হয়েছে, বহু অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করা হয়েছে।

ঐ সনাতনী প্রচলিত পন্থায় চাষাবাদের মাধ্যমে গমের উৎপাদন প্রায় শূন্য থেকে বাড়িয়ে বার্ষিক প্রায় দশ লক্ষ টনে উন্নীত করে গমকে মানুষের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয় করা হয়েছে। ঐ সনাতনী প্রচলিত পন্থায় চাষাবাদের মাধ্যমে ভূট্টা উৎপাদন শুরু হয়েছে, আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যান্য শাক সব্জির উৎপাদনও যথেষ্ট বেড়েছে। এই সবই কৃতিত্বের কথা।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এই যে সনাতনী কৃষি মাধ্যমে বছর বছর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হতে থাকলেও বছর বছর খাদ্য ঘাটতিও বৃদ্ধি হয়েছে অবিরাম ভাবে। তার কারণ খাদ্য বাড়তির হারকে ডিঙিয়ে বা ওভারটেক করে বছর বছর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে মাত্রাতিরিক্ত হারে। তাই এখন দেখা যাচ্ছে, কৃষি সম্প্রসারণের সুযোগ প্রায় সীমিত হয়ে আসছে, কিন্তু খাদ্য ঘাটতির হারতো কমানো যাচ্ছেনা। সরকার মনে হয় যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা একদিকে বলছেন এই তো আর দু'বছরের মধ্যে দেশকে

www.pathagar.com

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে নেয়া হবে। অর্থাৎ খাদ্যের ঘাটতি আর থাকবে না আবার অন্যদিকে বলছেন কৃষি সম্প্রসারণের সীমিত সুযোগে দেশের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন সম্ভব হবে না; তাই এখন শিল্পায়নের প্রতি ঝুঁকে পড়তে হবে। যেমন কথা, তেমন কাজ। উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনুপ্রেরণায় এক শিল্প বিপ্লবের সূচনা করা হয়েছে। শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী শিল্প বিভাগকে বিলুপ্ত করে পুঁজি বিনিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে মন্তব্য যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

www.pathagar.com

৭·৭ ঃ দারিদ্র বনাম ভূ-গর্ভের সম্পদ

অন্যদিকে বিশ্বখাদ্য সংস্থার এক কর্মকর্তা প্রদত্ত বিবৃতি থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের সুযোগ সীমিত; এখন ভূগর্ভ থেকে তৈল নামক তরল সোনা উত্তোলন ছাড়া দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের বিকল্প নেই। ঐ বক্তব্যের সাথে আমরা কোন মতেই একমত পোষণ করতে পারিনা। ভূ-গর্ভ থেকে তরল সোনা নিঃসৃত হয়ে দেশের নদী নালা দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকলে দেশের এই অনুপার্জিত আয়ের মাধ্যমে দেশের সর্বমোট অভ্যন্তরীণ আয় অনেক বেড়ে যেতে পারে, তা অস্বীকার করিনা। তার বদৌলতে গড়পড়তা মাথা পিছু আয়ও বেড়ে গিয়ে বিশ্ব সমাজকে হয়তো আমরা দেখাতে পারবো বাংলাদেশ এখন আর বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের তালিকায় নেই। আমরা হয়তো দাবী করতে পারবো, আমাদের গড়পড়তা মাথাপিছু আয় এখন দারিদ্রের নিম্ন পরিসীমার উর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু ভূগর্ভ থেকে নিঃসৃত তরল সোনা লব্ধ আয় আমাদের চিহ্নিত করা এক কোটি দরিদ্রতম মানুষ, যাদের গড় পড়তা দৈনিক আয় সাড়ে তিন টাকা আর বার্ষিক ১২৭৭ টাকা, তাদের নাগালে গিয়ে পৌঁছবে কি করে? আমাদের চিহ্নিত করা আরো ছয় কোটি মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়, যাদের গড় পড়তা মাথা পিছু আয় দৈনিক নয় টাকার উর্ধ্বে নয় বলে আমরা যুক্তি দিয়েছি, তারাই বা ভূ-গর্ভ থেকে নিঃসৃত সেই তরল সোনার অংশীদার হবে কি করে? আর বাংলাদেশের যে ছয় কোটি মানুষকে আমরা দারিদ্রের আর্ন্তজাতিক সীমারেখার নিম্নে স্থান দিয়েছি তারাইবা কোন পন্থায়, কি প্রক্রিয়ায় ঐ অনুপার্জিত তরল সোনার অংশীদার হয়ে দারিদ্রের অভিশাপকে ঝেড়ে ফেলে প্রাচুর্য্যের আয়েসে অবস্থান গেড়ে নেবে?

আমি মনে করি, মানুষের প্রচেষ্টায়ই হোক, আর অলৌকিক ভাবেই হোক, ভূ-গর্ভ থেকে তৈল নামক তরল সোনা নিঃসৃত হতে শুরু করলে, এটা অবশ্যই হবে দেশ ও জাতির জন্য এক আশীর্বাদ, এক নিয়ামত। কিন্তু এরূপ অনুপার্জিত নিয়ামতের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এই দেশের ১০ কোটি দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব হবে কি? দারিদ্রের আর্ন্তজাতিক সীমারেখার নিম্নে অবস্থানকারী ছয় কোটি লোকের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন করে এদেরকে স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে কি? বিদেশ থেকে আমদানীকৃত অনুদান বা ভিক্ষার পরিবর্তে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে হয়তোবা দেশে উপচে উঠা তরল সোনা লব্ধ আয়ের এক অংশ বিলিয়ে দিয়ে, অর্থাৎ ভিক্ষা দিয়ে, তাদের ক্ষুধার জ্বালা কিছুটা লাঘব করা যাবে, কিন্তু তাদেরকে উপার্জনশীল, উৎপাদনশীল করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিযোগিতায় স্থান দেয়া আদৌ সম্ভব হবে না। আমার নিশ্চিত অভিমত, ভূ-গর্ভের সম্পদ আহরণ, উত্তোলন দেশ ও জাতির জন্য এক আশীর্বাদ, এক নিয়ামত হলেও দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের ক্ষেত্রে এরূপ অনুপার্জিত অনিশ্চিত সম্পদের অবদান অতি, সীমিত, অতি অনিশ্চিত।

www.pathagar.com

৭.৮ ঃ দারিদ্র বনাম শিল্প

একটু আগেই বলছিলাম, বাংলাদেশ সরকার এখন শিল্পায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমি সরকারকে জানাই সাধুবাদ, আন্তরিক মোবারকবাদ। বিশ্ব যখন যান্ত্রিক সভ্যতার, কম্পিউটার সভ্যতার তুঙ্গে, তখনো আমরা শিল্পায়নের অভিযাত্রা শুরুই করবো না, এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই. শিল্পজাত দ্রব্য দেশে তৈরী করে বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ করা অবশ্যই অত্যাবশ্যক কিন্তু দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে এই ১১ কোটি লোকের ভূ খন্ডে কত লোককে শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হবে তার কোন পরিকল্পনা পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে কি? আমিতো কিছুতেই সংশয় সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

আমি অর্থনীতিবিদ নই, আমি কৃষি বিশারদও নই, আমি কোন কিছুরই বিশেষজ্ঞ নই; কিন্তু অর্ধ শতাব্দীরও দীর্ঘকাল ধরে আমার দেশের ও উপমহাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে, এবং সর্বোপরি বিশ্বের উন্নততম, স্বল্পোন্নত, উন্নয়নমুখী, এমনকি উন্নয়ন বিমুখী দেশ সমূহ বার বার ভ্রমণ করে নিবিড়ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছি, দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের বাস্তব ভিত্তিক প্রক্রিয়া। স্বচক্ষে দেখেছি উন্নয়নমুখী ও স্বল্পোন্নত দেশের নরনারী কিভাবে মাটি ও পানির সাথে তাদের চটপটে হাতের পরশে যাদুমন্ত্রের মতো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করছে। অবিশ্বাস্য নেত্রে বোকার মত চেয়ে দেখেছি "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর চিত্তার্কষক দৃশ্য। প্রত্যক্ষ করেছি, দরিদ্র মানুষ অনাহার অর্ধাহার অপুষ্টিকে নির্বাসন দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সুষম খাদ্য নিশ্চিত করেছে দেশের প্রত্যেক নরনারীর জন্য।

বিদেশে স্বচক্ষে দেখা ঐসব চিত্তার্কষক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে যখন আমার দেশের অপরিকল্পিত, এমনকি ভ্রান্ত অর্থনীতি প্রসূত ভূমির অপচয়, অপব্যবহার দেখি, যখন শুনি আমার দেশে কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি শেষ প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন স্তম্ভিত হয়ে যাই; চিন্তা করতে থাকি বিদেশে স্বচক্ষে যা দেখলাম সেটা সত্যি, না দেশে যেটা শুনছি এটা সত্যি। এই দুশ্চিন্তা আমাকে ঠেলে দেয় কূ-চিন্তার দিকে। ভাবতে থাকি আমরা হয়তো দারিদ্রকে লালন করে, মানুষের অনাহার অর্ধাহার অপুষ্টির সুযোগ নিয়ে আমাদের অবস্থান শক্ত করতে চাই, সম্পদের পাহাড় গড়তে চাই, আর সেই সুযোগে জীবনটাকে প্রাণভরে উপভোগ করতে চাই। আবার ভাবি,-না, আমরা যারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, অথবা আল্লাহর বিশেষ দান, একটুখানি মেধা ও উৎসাহের, সুযোগ নিয়ে, অথবা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে দারিদ্রের সীমারেখার উর্ধ্বে অবস্থান গেড়ে নিয়েছি, তারা নিশ্চয়ই এত সংকীর্ণমনা হতে পারিনা।

ইতিহাসের পাতা একটু আওড়িয়ে দেখি, আজকের শিল্পোন্নত দেশ; ইল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, এ সব দেশই তাদের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের অভিযাত্রা শুরু করেছিলো ভূমির সদ্ব্যবহার করে; ভূমি ভিত্তিক বহুমুখী উৎপাদন কর্মকান্ডের মাধ্যমে। অর্থাৎ, আমাদের দেশের মতো "কৃষি" কথাটার সংকীর্ণ

www.pathagar.com

সংজ্ঞার গন্ডির মধ্যে থেকে কেবল মৌসুমে মৌসুমেই নয়, ভূমি সম্পদকে তারা সদ্ব্যবহার করেছে সারা বছর ধরে, এমন সব উৎপাদনমূলক কাজে, যেগুলোকে "কৃষি"র সংকীর্ণ সংজ্ঞা কেন, সম্প্রসারিত সংজ্ঞায়ও স্থান দেয়া যায় না।

সারা পূর্ব ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশেই একই অবস্থা। বিশাল দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশ এখন কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের প্রায় সকল কর্মকান্ডেই সারা বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করে ভূমির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। শিল্পায়ন বিলম্বে শুরু করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতি সহজে ইউরোপের দেশগুলোকে শিল্পায়নে ওভারটেক করে নেয় অতি সহজে। এর অন্যতম কারণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত তার ভূমি সম্পদের সুপরিকল্পিত "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করে জাতির অর্থনৈতিক ভীত এতোই শক্ত করে নেয় যে, শিল্পায়নে যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন দেশে অফুরন্ত কাচামাল শিল্পে ব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করছে, আর শিল্পের উদ্যোক্তাগণ পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য আর্থিক ঝুকি নেবার মত যথেষ্ট পুঁজির অধিকারী।

বিশ্বের বিশালতম দেশ, সোভিয়েত রাশিয়া, শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রথম কাতারে পৌঁছে গেলেও এখনো তাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার।"

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ গণচীন, যে দেশ মাত্র চার দশক পূর্বেও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ছিলো, সেই দেশের ১১০ কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে ভূমির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। সেই গণচীন এখনো কৃষি প্রধান দেশ, শিল্প প্রধান দেশনয়।

ক্ষুদ্র দেশ জাপান, যে দেশ পাঁচ দশক পূর্বেও আমাদের দেশের চেয়ে আরো বেশী ভূমি ক্ষুধার্ত ছিলো, সেই দেশও তাদের অর্থনৈতিক ভীত সৃষ্টি করে ভূমির সুপরিকল্পিত "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" মাধ্যমে। তারপর শক্ত অর্থনৈতিক ভীতের উপরে বলিষ্ঠ অবস্থান গড়ে নিয়ে, জাপানীরা শুরু করে শিল্পায়নের অভিযাত্রা। অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে তারা শিল্পায়নে এমন চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করে যে ইউরোপ আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে যায় প্রতিযোগিতার আশংকায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতো শিল্পক্ষেত্রে জাপানের সাথে প্রতিযোগিতার চেয়ে সমঝোতার পথই বেছে নিয়েছে, নিজের দেশের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক উন্নয়নমুখী দেশ মালয়েশিয়া। শতকরা ৫৫ ভাগ মানুষ আমাদেরই মতো ভাত খায়, মসলা সহ। তিন দশক আগে দেখেছি, এই মালয়ে মুসলমানরা অলস, আরাম আয়েসী। প্রচুর ভূমি আর স্বল্প সংখ্যক মানুষ, মাটি ফেটে ফসল গজাচ্ছে, কোন পরিশ্রমের দরকার হয় না। সেই মালয়েশিয়া আজ পরিকল্পিতভাবে ভূমির সদ্ব্যবহার করে উন্নয়ন অর্জন করেছে অবিশ্বাস্য ভাবে। এখনো মালয়েশিয়ার উন্নয়ন কর্মসূচী ভূমি ভিত্তিক। কিন্তু অনাহার অর্ধাহার তো নেই। এমনকি বেকারত্ব ও নেই। মসজিদের সামনেও ভিখারী খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

আমাদের নিকটবর্তী দেশ থাইল্যান্ড, ভিন্ন বংশোদ্ভূত লোক, ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। সাড়ে তিন দশক পূর্বে সেখানেও দেখেছি আলস্য জড়তা। আর আজ মাটি ও পানি থেকে খাদ্য উৎপাদনে অবিশ্বাস্য অবদান রাখছে, ক্ষুদ্রাকৃতি হলুদ বর্ণের থাই নারী পুরুষেরা। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশী কর্মব্যস্ত। দেশের যেখানেই যাবেন স্বচক্ষে দেখবেন মাটি আর পানি নিয়ে নারী পুরুষের কর্ম চাঞ্চল্য। ভূমির সদ্ব্যবহার করে থাইল্যান্ড এতোই উন্নতি লাভ করেছে যে এখন সেই দেশ শিল্পায়নে অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু করেছে। আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক ম্যাগাজিন গুলোতো ভবিষ্যত বাণী করছে, অচিরেই থাইল্যান্ড এশিয়ার "ইন্ডাষ্ট্রিয়াল জায়েন্ট" হিসাবে আবির্ভূত হবে।

এদিকে, আমার দেশে অনেকটা অবিশ্বাস্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করছি, মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় ১১ কোটি মানব সন্তানের আবাসভূমি আমাদের এই সোনার বাংলার ভূমি সদ্ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা ছাড়াই, এমনকি যথেচ্ছভাবে তাবেও প্রচুর ভূমির অপচয় করা হচ্ছে, অপব্যবহার করা হচ্ছে। "কৃষিকে" সংকীর্ণ সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে "কৃষি" সম্প্রসারণের আর বিশেষ সুযোগ নেই ধরে নিয়ে, এখনো "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" চিন্তা ভাবনা না করেই এক লাফে চলে যাবার প্রচেষ্টা হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের দিকে, শিল্পের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বেকারত্ব লাঘবের লক্ষ্যে।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, শিল্পায়নের আবশ্যকতা অস্বীকার করা তো দূরের কথা,শিল্পায়নের অপরিহার্য্যতাও আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প, আমদানীর বিকল্প শিল্প এবং দেশী কাঁচামাল সদ্ব্যবহারের শিল্প, অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিষ্ঠিত শিল্প, যে গুলোতে অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, সেই আড়াই হাজার রুগ্ন শিল্পকে অচল ফেলে রেখে, অর্থাৎ ২৫০০ (আড়াই হাজার) কোটি টাকা অনুৎপাদিত অবস্থায় অলস ফেলে রেখে, হাজার হাজার কোটি টাকা নূতনভাবে বিনিয়োগ করে আমরা কেবল নূতন শিল্প স্থাপনই করতে থাকবো।

নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে আমাদের কি দেখা উচিত নয় যে, কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে লক্ষ্যহীনভাবে টিকিয়ে রাখার কি যুক্তি আছে? এসব রুগ্ন ও লোকসানমুখী শিল্প দীর্ঘদিন ধরে যেসব ভূমি দখল করে বসে আছে, যার পরিমাণ অবশ্যই কয়েক হাজার একর, সেই মূল্যবান ভূমিও তো পুরোপুরি অব্যবহৃত হচ্ছে। এটা অবশ্যই অমার্জনীয়। এরূপ ক্রমাগত লোকসানমুখী শিল্পকে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন পরিবর্তন করে লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত করা নূতন শিল্প স্থাপনের চেয়ে অগ্রগণ্যতার দাবীদার বলে আমি মনে করি।

আমার মনে হয়, আমাদের অকপটে স্বীকার করে নেয়া উচিত, বিগত ৪২ বছরে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে মারাত্মক ভুলত্রুটি হয়ে গেছে, যার জন্য অধিকাংশ শিল্পই সন্তোষজনক ভাবে চলছেনা। সাথে সাথে ভুল ত্রুটি সব চিহ্নিত করে এসবের প্রতিকার করা হোক, পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা হোক; আর নূতন শিল্প স্থাপন করতে কঠোর দৃষ্টি দেয়া হোক, সেই সব ভুলত্রুটির প্রতি, যে সব ভুল ত্রুটির জন্য আমাদের শিল্পখাত এ পর্যন্ত

www.pathagar.com

সাফল্য লাভ করতে পারেনি। একজন অবিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি রুগ্ন শিল্পখাতের চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ পরামর্শ দিতে পারবো না। কিন্তু আমার মতে কোন একটি শিল্পস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গভীর মনযোগ সহকারে চিন্তা করা উচিতঃ-

৭৮০১ঃ প্রস্তাবিত শিল্প স্থাপন করলে আগামী অন্তত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা থাকবে কিনা।

৭৮০২ঃ প্রস্তাবিত শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য দেশীয় প্রথায় উৎপাদিত বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত করবে না (যেমন বস্তা ভর্তি গুঁড়ো দুধ আমদানী করে দেশে কেবল মোড়কীকরণ করে বাজারে ছাড়লে দেশব্যাপী খাটি দুধ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে)।

৭৮০৩ঃ প্রস্তাবিত শিল্পের দেশীয় কাঁচামাল অন্তত ৫০ বছর পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা (যেমন কাগজ শিল্পের কাঁচা মালের জন্য সৃষ্ট সংকট)

৭৮০৪ঃ প্রস্তাবিত শিল্পের দেশীয় কাঁচামাল অপর্যাপ্ত থাকলেও ঐ কাঁচামাল উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়া অন্তত ৫০ বছর চালু রাখা যাবে কিনা।

৭৮০৫ঃ দেশে উৎপাদিত যেসব খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ও বিপণনের অসুবিধায় সম্প্রসারিত করা যাচ্ছে না, এই সবের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ অগ্রগণ্যতা পাচ্ছে কিনা (উদাহরণ আলু, টমেটো, তরমুজ, বাংগি, কাঁঠাল, আম, পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি।)

৭৮০৬ঃ প্রস্তাবিত অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের কাঁচামাল দেশে উৎপাদনের অথবা উৎপাদন বাড়ানোর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

৭৮০৭ঃ সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প বলে অনুমোদিত শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য চোরাই পথে দেশে বিস্তার লাভ করবে কিনা।

৭৮০৮ঃ আংশিক রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের যৌক্তিকতা কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয়েছে কিনা।

৭৮০৯ঃ কেবলমাত্র সংযোজন শিল্প (এ্যাসম্বলী প্ল্যান্ট) অনুমোদন করার যৌক্তিকতা কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয়েছে কিনা।

৭৮১০ঃ শিল্পের জন্য অনুমোদিত দেশী বিদেশী মূলধন স্থানান্তরিত করে অন্য খাতে ব্যবহারের সুযোগ আছে কিনা (শিল্প খাতের ব্যর্থতার জন্য এটাই সবচেয়ে দায়ী বলে জনগণ মনে করেন।)

www.pathagar.com

৭.৯ ঃ দারিদ্র বনাম জনসংখ্যা

পূর্বেই বলেছি, বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র। অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট মানুষের আহার্য উপার্জনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্ম সংস্থান না করা পর্যন্ত, এদেশের কোন সমস্যাই সমাধান করা যাবে না। আরো বলেছি দারিদ্র বিমোচনের পরিকল্পিত কোন প্রচেষ্টাই হয়নি এই দেশে। এমনকি প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনায় দারিদ্র বেকারত্বকে গুরুতই দেয়া হয়নি।

তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দেশে যে চরিত্র সংকট দেখা দিয়েছে সেই চরিত্র সংকটের প্রশমন না করে দারিদ্র বিমোচনের কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নই কঠিন। আবার এটাও ঠিক যে জনসংখ্যা লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকলে দারিদ্রও বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে দারিদ্র বিমোচনে সাফল্য অর্জন করা আরো কঠিন হয়ে যাবে। এই সব বাস্তবতার উপরে আরো বড় বাস্তবতা, যেটা আমাদের পরিকল্পনাবিদদের এবং ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গের মনোযোগ এড়িয়ে গেছে, সেটা হলো দারিদ্র বিমোচন না করে, অন্ততঃ দারিদ্র বিমোচনের বাস্তবধর্মী, সুষ্ঠু প্রক্রিয়া চালু না করা পর্যন্ত, চরিত্র সংশোধন অসম্ভব, অবাস্তব। এমনকি দারিদ্র বিমোচনের বাস্তব ধর্মী এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়া চালু না করা পর্যন্ত, দেশের দরিদ্রতম কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী না করা পর্যন্ত, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করতে পারলেও সমস্যা সমাধান হবেনা। দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্যই জাগবেনা। তারা আশার আলোক বর্তিকাও দেখতে পাবেনা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তো আসলে দারিদ্র বিমোচনের একটি পথ ও পদ্ধতি। এই পদ্ধতি কিছুতেই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ এটা কেউই দাবী করতে পারবেন না যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ফেললেই দেশের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, দারিদ্র বিমোচন হয়ে যাবে, এমনকি দারিদ্র বিমোচনে একটা উল্লেখযোগ্য ধাপ এগিয়ে যাওয়া হবে।

যুক্তিতর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, ১৯৯০ সালের মধ্যেই মানুষের প্রচেষ্টার ফলেই হোক, আর অলৌকিক ভাবেই হোক, দেশের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার শূন্যে নেমে এসে গেলো, অর্থাৎ জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে গেলো। তাতে কি দেশে যে চরম দারিদ্র বিরাজ করছে, তার সমাধান হয়ে যাবে? না, হবে না। তবে দারিদ্রের অধঃমুখী যাত্রার গতি হয়তো একটু মন্থর হবে, আর না হয় দারিদ্র স্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা তো আজকের বিরাজমান দারিদ্র নিয়েই আলোচনা করছি। এটা নিয়েই তো গোটা জাতি শংকিত, এমনকি আর্ন্তজাতিক সংস্থা সমূহ ও দাতাদেশগুলো ও শংকিত। আজকের অবস্থাই তো চলতে দেয়া যেতে পারেনা। এর প্রশমন প্রক্রিয়া তো আর বিলম্বিত করা যায় না।

এই প্রেক্ষাপটে দেশের এক নম্বর কর্মসূচী হওয়া উচিত "দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী" বাস্তবধর্মী, বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু কর্মসূচী। দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচীর সম্পূরক

www.pathagar.com

হিসাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে দ্বিতীয় স্থান দেয়া যায়। চরিত্র সংশোধন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প এবং অন্য সকল উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডও স্থান পাবে ঐ এক নম্বর কর্মসূচীর, অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সম্পূরক হিসাবে।

একবার দারিদ্র বিমোচনের প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেলে, দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠিকে কর্মমুখী করে তাদের বৈধ পথে অন্তত কিছুটা উপার্জন করার সুযোগ করে দিতে পারলে তখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ, চরিত্র সংশোধন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথা মানুষের সকল কর্মকান্ড দারিদ্র বিমোচনের সম্পূরক হিসাবে কাজ করতে থাকবে। ঠিক তেমনি দারিদ্র বিমোচনের সকল কর্মসূচী ও অন্যান্য সকল কর্মসুচীর বলিষ্ঠ সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দারিদ্র বিমোচনের বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ কর্মসূচী মানুষের অন্য সকল কর্মকান্ডের সহায়ক হতে পারে। এবং সেটাই হওয়া উচিত দেশ ও জাতির প্রধানতম লক্ষ্য।

www.pathagar.com

৭·১০ ঃ দারিদ্র বনাম পাঁচসালা পরিকল্পনা

দারিদ্র বিমোচন কথাটির মধ্যে বেকারত্ব প্রশমন কথাটি অন্তর্নিহিত। কিছু কিছু উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশে যেসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার অনেকগুলোই দারিদ্র বিমোচনে কিছু না কিছু অবদান রাখছে। কিন্তু আমাদের দেশে দারিদ্র এতোই প্রকট, এতোই ব্যাপক, এতোই সংকটজনক যে ক্রমে ক্রমে, পরোক্ষভাবে, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের এই অন্তিম দারিদ্র বিমোচন করা আদৌ সম্ভব নয়। বাংলাদেশের দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। অনাহার-অর্ধাহার-অপুষ্টির ভুক্তভোগীর সংখ্যা তাই দিন দিন কেবলই বাড়ছে। অথচ এটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের কোন সরাসরি পরিকল্পিত কার্যক্রম কোন দিনই গৃহিত হয়নি; এখনো হচ্ছেনা।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় "দারিদ্র প্রশমন"কে জাতির "আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" তালিকায় প্রথম স্থান দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সামরিক বাহিনী কতৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর যে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) তৈরী হয়, তাতে জাতির "আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" তালিকায় "দারিদ্র প্রশমন"কে প্রথম স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে "দারিদ্র রোধ" করার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হলো। অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনায় "দারিদ্র প্রশমন" করার যে সরাসরি ও ব্যাপক সংকল্প ব্যক্ত হয়েছিলো, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় সেই সংকল্পকে খর্ব করে একটা সীমিত কর্মসূচীতে পরিণত করা হলো। এবং তাও প্রথম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে নামিয়ে। এরপর দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) জাতির "আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" তালিকায় "দারিদ্র প্রশমন" কোন স্থানই পেলনা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকলাপনায় (১৯৮৫-১৯৯০) "দারিদ্র প্রশমন" কে জাতির "আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" র মধ্যে কোন স্থানই দেয়া হলো না। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া এখন প্রস্তুত হচ্ছে। মনে হয়, এই পুস্তক ছাপাখানা থেকে বের হবার পূর্বেই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রকাশ করা হয়ে যাবে।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলের ধ্যান ধারনার যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় দারিদ্রই যে বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সমস্যা, এবং এই সমস্যার সমাধানের প্রক্রিয়া চালু না করা পর্যন্ত অন্য কোন সমস্যা সমাধানই সম্ভব নয়, এই নির্ঘাত সত্যের প্রকাশ্য স্বীকৃতি হয়তো চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও স্থান পাবে না।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটিতে, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে, দারিদ্রের ভয়াবহতার স্বীকৃতি আছে। কিন্তু কেবলমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতির "উদ্দেশ্য আদর্শ ও লক্ষ্য" তালিকায় দারিদ্র প্রশমনকে প্রথম স্থান দিয়ে দারিদ্রই যে দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা এর

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তী পরিকল্পনা সমূহে দারিদ্র সমস্যাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই স্বীকৃতিই দেয়া হয়নি। অথচ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদগণের সাথে আলোচনা করে দেখেছি, দারিদ্রই যে সর্বগ্রাসী সর্বনাশী সমস্যা, এটা তারা অস্বীকার করেন না। এমনকি, দারিদ্র সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চালু না করা পর্যন্ত দেশের গণমানুষের মনে উৎসাহ আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে না, জাতিকে সঠিক অর্থে কর্মমুখী করা যাবেনা, এটাও অর্থনীতিবিদগণ অস্বীকার করেন না। মনে হয় তাদের ধারণা, দারিদ্র বিমোচন তো সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেরই যৌথ ফসল; অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারলে, জাতির মাথাপিছু উৎপাদনের হার বাড়াতে পারলে, স্বয়ংক্রিয় ভাবেই দারিদ্র বেকারত্ব প্রশমিত হতে থাকবে।

আমি উপরোক্ত চিন্তাধারা গ্রহণ করে নিতে পারলাম না। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে নেমে গেছে, এই পরিস্থিতিতে অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফলই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালে গিয়ে পৌঁছেনা। প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে, কিন্তু উৎপাদনমুখী কোন কর্মকান্ড তো জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টা হয়নি। বরং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের সাথে সাথে দুর্নীতিও মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু কর্মসংস্থান, এমনকি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন কর্ম পদ্ধতি তো মানুষের দোরগোড়ার কাছাকাছিও পৌঁছায়নি। এই কথাগুলো অবশ্যই অপ্রিয়; কিন্তু এগুলো কি আদৌ অসত্য?এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে স্বাধীনতা উত্তর যতগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, ঐ গুলির মধ্যে যে কয়টিতেই দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র বিমোচনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সমাধানের কোন বাস্তবমুখী কার্যক্রমের প্রস্তাব নেই, বরং দারিদ্রকে উপেক্ষা করে অন্যান্য সমস্যাগুলো সমাধানের এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নুতন নুতন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, দুর্নীতিও ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র প্রকট থেকে প্রকটতর আকার ধারণ করছে।

www.pathagar.com

৮ ঃ দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন

৮.১ ঃ ভূমিকা

বিচিত্র দেশ আমাদের এই সোনার বাংলা। সৃষ্টিকর্তা যেন বৈচিত্রের এক মহাসমারোহ একিভূত করে রেখেছেন বিরাট জনবহুল এই ক্ষুদ্র দেশটিতে। মানুষের আকারের বৈচিত্র, বর্ণের বৈচিত্র, চরিত্রের বৈচিত্র, মেধা কর্মতৎপরতা কর্মবিমুখতার বৈচিত্র, প্রকৃতির বৈচিত্র, প্রাচুর্য্য দারিদ্রের বৈচিত্রঃ সব মিলে দেশটি যেন বৈচিত্রের এক আশ্চর্য্য লীলাভূমি। বৈচিত্রের এই লীলাভূমিতে যে বৈচিত্র অন্য সব বৈচিত্রকে ম্লান করে দিয়েছে সেটি হলো সীমাহীন প্রাচুর্য্য ও অন্তিম দারিদ্রের সহ-অবস্থান। যেদিকেই তাকাবেন, সেদিকেই দেখবেন এই পরস্পর বিরোধী দুটি অবস্থান। স্বল্পসংখ্যক ধনকুবেরের শানশওকত ও জৌলুস, আর তার পাশাপাশি ক্ষুধার্ত অস্থিচর্মসার মানুষের একটুখানি খাবারের জন্য করুণ আহাজারি। অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রাচুর্য্যের ছড়াছড়ি, আর দেয়ালের বাহিরে ক্ষুধার্ত ভিখারীর সমাগম। সুশোভিত সামিয়ানার অভ্যন্তরে রাজভোগের অপচয়, আর সামিয়ানার বাইরে খাবারের উচ্ছিষ্টটুকু সংগ্রহের জন্য অপেক্ষমান জনতা।

এগারো কোটি জনগোষ্ঠির মধ্যে দশ কোটিই দরিদ্র। এরা আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এদের ছেলেমেয়েদের মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে অপারগতা, পরিবারের রোগাক্রান্ত সদস্যের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করারও সুযোগ নেই। এদের যুবক-যুবতীরা বেকার, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। এই দশ কোটি মানুষই দারিদ্রের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খেয়ে দিন দিন আরো বেশী দরিদ্র হচ্ছে। পারিবারিক উপার্জন বাড়ছে না, কিন্তু জনসংখ্যা বছর বছর বেড়েই চলেছে। দারিদ্রের সাথে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের যেন এক অশুভ আতাঁত। পরিবার যতোবেশী দরিদ্র, কচি শিশুর সংখ্যাও ততো বেশী। এই তো সেদিন স্বচক্ষে দেখে এলাম আমার নিজ গ্রামের আর্সিদ আলীর ছেলে আব্বাস আলীর ১২টি সন্তান। প্রথম সন্তানের বয়স ২০ বছরের নীচে। ১২ সন্তানের গর্বিত জননী নাকি আরো সন্তান লাভের আশা করছে। যেখানেই যাই, দেখি অন্তিম দারিদ্রের মধ্যে বিচরণ করছে অসংখ্য শিশু। খুব কম দম্পতিই আছে যাদের সন্তানের সংখ্যা পাঁচ এর কম।

দারিদ্রের যে পরিমার্জিত চিত্র সপ্তম অধ্যায়ে তুলে ধরেছি তার পুনরাবৃত্তি করার কোন যুক্তি নেই।

www.pathagar.com

৮·২ ঃ ভূমির অপচয়

মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্র এই দেশটিতে ঠেসাঠেসী করে বাস করছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি জাতি, যার বর্তমান সংখ্যা ১১ কোটি বলে অনুমান করা হচ্ছে; যদিও একেকটি পরিবারের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিশ্বাস করা মুশকিল যে এই অনুমিত পরিসংখ্যান সঠিক। দারিদ্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে জনসংখ্যা বাড়তেই আছে। দারিদ্র যতবেশী, জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধিও ততোবেশী।

এই চরম প্রকট অন্তিম দারিদ্রের পাশাপাশি আর একটি প্রতিযোগিতাও চলছে, অবিরাম গতিতে। সেই প্রতিযোগিতা হলো অপচয়ের প্রতিযোগিতা, শানশওকত প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা, সর্বস্ব বিক্রয় করেও ছেলেমেয়েদের বিয়ে উপলক্ষে আড়ম্বরতা ও স্বর্ণালংকারের ছড়াছড়ির প্রতিযোগিতা। সকল অপচয়ের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে ভূমির অপচয়। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ভূমি সম্পদের "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর পরিবর্তে ভূমির অমার্জনীয় অপচয় করা হচ্ছে সর্বত্র, অকল্পনীয়ভাবে।

ভূমির সবচেয়ে বেশী অপচয় হচ্ছে সরকারী কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে। তার একটি কারণ, ভূমি সম্পদ ব্যবহারের কোন পরিকল্পনাই কোনদিন হয়নি।

ভূমি সম্পদ অপচয়ের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করছিঃ-

৮·২·০১ঃ ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধীন পাকিস্তানে এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের কোন একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই ভূমি ভিত্তিক প্রস্তুত হয়নি। অর্থাৎ মানুষের সর্বপ্রধান মৌলিক সম্পদ "ভূমি", যাকে অর্থনীতিতে উৎপাদনের প্রথম উপাদান বলে স্বীকার করা হয়, সেই ভূমিকে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানই দেয়া হয়নি।

৮·২·০২ঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে, যেসব পঞ্চ বার্ষিকী, দ্বি-বার্ষিকী, অর্ন্তবর্তীকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তার কোন একটিতেও "ভূমির" সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের কোন রূপরেখা নেই।

৮·২·০৩ঃ সরকারী পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের আবাদযোগ্য মোট সোয়া দুই কোটি একর ভূমির মধ্যে এখনো মোট প্রায় ৩৫ লক্ষ একর ভূমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে।

৮·২·০৪ঃ আবাদী ভূমির তালিকা বহির্ভূত বন বিভাগের অধীনে মোট প্রায় ৩৫ লক্ষ একর ভূমির এক বৃহৎ অংশ "বৃক্ষহীন বন" অবস্থায় সদর্পে বিরাজ করছে।

৮·২·০৫ঃ চা বাগানের জন্য বরাদ্দকৃত মোট তিনলক্ষ একর ভূমির মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ একর ভূমি সুদীর্ঘকাল থেকে সম্প্রসারণের নামে অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। চা বাগানের উঁচু টিলার দক্ষিণ ঢালু ভূমি চা উৎপাদনের অনুপযুক্ত বিধায় প্রায় অনাবাদী পড়ে আছে।

www.pathagar.com

৮·২·০৬ঃ ছয়টি পরিত্যক্ত বিমান বন্দর (শমসের নগর, কুমিল্লা, চকোরিয়া, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, ফেনী) আওতাধীন বিরাট ভূমি অনাবাদী অবস্থায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী থেকে ফেলে রাখা হয়েছে।

৮·২·০৭ঃ আমনুড়া–গোদাগারী রেললাইনটি চল্লিশ বছর পূর্বে পরিত্যক্ত হয়ে গেলেও দশমাইল দীর্ঘ ও দুইশত গজ প্রস্থ অতিমূল্যবান ভূ–খন্ডটি অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।

৮·২·০৮ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, রেল বিভাগ ও সরকারী প্রায় সকল সংস্থার আওতাধীন খাল নালা সহ বহু জমি অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।

৮·২·০৯ঃ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের সৈকত ঘেষে জেগে উঠা বিরাট চরাঞ্চল জরীপহীন, পরিসংখ্যানহীন, নৈরাজ্যকর অবস্থায় ফেলে রেখে গায়ের জোরে চরদখলের লাঠিযুদ্ধ, লুটপাট, খুনখারাপী অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৮·২·১০ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা) সংলগ্ন ও ইহার জন্য বরাদ্ধকৃত ভূমির অপচয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর ভূমি।

৮·২·১১ঃ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীমালা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা ইত্যাদির শত শত বর্গমাইল চরাঞ্চল, যা ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাস থেকে পানির উপর ভেসে উঠে এবং পরবর্তী বৈশাখ মাস পর্যন্ত ধু ধু প্রান্তর হিসাবে বিরাজ করে, কেবল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে এর শতকরা ৭৫ ভাগ ভূমি অনাবাদী হিসাবে পড়ে থাকে।

৮·২·১২ঃ দেশের হাওর বাঁওড়ের লক্ষ লক্ষ একর নিম্ন ভূমি, যা বর্ষাকালে অথই পানির নীচে ডুবে থাকে, কিন্তু শুকনা মৌসুমে ভেসে উঠে, এই অতি উর্বর ভূমিতে চাষাবাদের জন্য অতি সহজ সেচ ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ ভূমিই অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে।

৮·২·১৩ঃ ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার জন্য বিশাল আদমজী পাটকল সহ প্রায় সকল পাট কল, অতিকায় মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী, বিরাট ষ্টিল মিলস ইত্যাদির লোকসানের বোঝা জনগণকে বইতে হচ্ছে।

৮·২·১৪ঃ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এমন সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে যা কাঁচা মালের অভাবে রুগ্ন হয়ে অচল হতে যাচ্ছে, যেমন, ছাতক পেপার মিল ইত্যাদি।

৮·২·১৫ঃ কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এমন সব শিল্প স্থাপন করা হয়েছে যার উৎপাদিত পণ্যের পর্যাপ্ত চাহিদা নেই, যেমন, জুট কার্পেট মিল ইত্যাদি।

৮·২·১৬ঃ ছোট বড় প্রায় আড়াই হাজার শিল্প, পাঁচ/দশ বছর থেকে অচল ফেলে রেখে নতুন নুতন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৮·২·১৭ঃ বনায়ন কর্মসূচীতে দেশী ফলের গাছ, (যেমন কাঁঠাল, আম, জাম, নারিকেল, তাল, খেজুর, পেয়ারা, লেবু) ইত্যাদির পরিবর্তে কেবলমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য

www.pathagar.com

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত এবং দেশী ফলহীন বৃক্ষ রোপনের প্রবণতা, যার জন্য বনায়নের সাথে সাথে ফল উৎপাদনের সুযোগ বিনষ্ট হচ্ছে।

৮·২·১৮ঃ নগর শ্রীবৃদ্ধি কার্যক্রমে দেশী ফলের গাছকে হেলায় ফেলে দিয়ে বিদেশী ফলহীন পামজাতীয়, ঝাউ জাতীয় গাছ লাগিয়ে দেশী নগরকে বিদেশী রূপ দেবার অপচেষ্টা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৮·২·১৯ঃ রাজধানী ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ১৭,৬৯,০০০ পুকুর দীঘিসহ বদ্ধজলাশয়ে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে মৎস্য উৎপাদনের বিরাট সুযোগ প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হচ্ছে।

৮·২·২০ঃ দেশের পশু সম্পদ উন্নয়ন করে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন প্রচেষ্টার পরিবর্তে গুঁড়ো দুধ আমদানীকে ক্রমাগত উৎসাহদানের মাধ্যমে দেশে খাঁটি দুগ্ধ উৎপাদনের পরিবেশ ও উৎসাহ বিনষ্ট করা হচ্ছে।

৮·২·২১ঃ মাটি ও পানিতে গাছ ও মাছ (উদ্ভিদ ও মৎস্য) ছাড়াও যে আরও অনেক লাভজনক উৎপাদন সম্ভব সেরূপ কোন চিন্তা–ভাবনা–পরিকল্পনার সন্ধান নেই।

অপচয় অবহেলার শিকার বাংলাদেশে এরূপ শত শত উদাহরণ আমার হাতেই আছে। সুযোগ হলে সেগুলোও জাতির হাতে অর্পণ করবো।

www.pathagar.com

৮-৩ঃ ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার

"ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার," কথাটা আমি প্রথম বলেছিলাম ১৯৮৪ সালে, বাংলাদেশের তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় (বর্তমান ভূমি মন্ত্রণালয়) এর দায়ীত্বে থাকাকালীন সময়ে। তবে এই কথাটা আমার মনে উকি ঝুকি দিচ্ছিলো প্রায় পাঁচ যুগ ধরে, আমাদের দেশে ভূমি অপচয়ের দৃশ্য দেখে দেখে। ঐ সুদীর্ঘ কাল সময়ে গণচীন সহ বিশ্বের বহু দেশে ভূমির সদ্ব্যবহারের দৃশ্য দেখে আমার মনে যে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা বিভিন্ন সময়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিলো, আমার লেখা "বিদেশে যা দেখে এলাম" সিরিজে। সেই সিরিজ এখন ছয়খন্ড পুস্তক আকারে প্রকাশনার অপেক্ষায় আছে।

আমার সৌভাগ্য, যা কোন কোন সময় দুর্ভাগ্য বলেও মনে হয়, এই যে অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে বর্তমান বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে যে বাস্তবতা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার কোন উপলক্ষ আমার হাতের মুঠোয় না আসলেও, যুগ যুগ ধরে আমি বিশ্বব্যাপী মানুষের হাতের স্পর্শে মাটিও পানির সমন্বয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেখেছি। এবং যখনই যা দেখেছি তখনই আমার দেশের প্রায় সমতুল্য ভূমির অবহেলিত অপচয়ের স্মৃতি আমাকে পীড়া দিয়েছে।

১৯৮৪ সালের প্রারম্ভে যখন অযাচিত ভাবে, এমনকি আমার অনিচ্ছা স্বত্বেও, বর্তমান রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আমাকে মন্ত্রিত্বের শপথ পাঠ করিয়ে নেন, এবং ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পন করেন, তখন আমার মনে হলো, সারা জীবন যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশী চিন্তা করেছি, অর্থাৎ বাংলাদেশের দারিদ্র , চরম প্রকট অন্তিম দারিদ্র, সেই বিষয়টির আরো গভীরে যাবার এবং সমাধানের বস্তুনিষ্ঠ কার্যক্রম প্রণয়ন করার এক অগ্নি পরীক্ষায় এখন আমি নিপতিত। এই মনোবৃত্তি নিয়েই আমি ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের দায়িত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমার সাফল্য-ব্যর্থতার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে অকপটে স্বীকার করবো, ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে না গেলে এই পুস্তক লেখার সম্পূর্ণ উপাদানই আমার গোচরে আসতো না।

দেশে বিদেশে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ মাত্র পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলে এগারো কোটি জনগোষ্ঠিকে বুকে ধারণ করেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যদি আমরা এই ৫৫ হাজার বর্গমাইল "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করতে পারি।

একবার দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে গেলে, অনাহারে-অর্ধাহারে অপুষ্টিতে জর্জরিত মানুষ একবার যথেষ্ট পরিমাণ সুষম খাদ্যের অধিকারী হয়ে যেতে পারলে, মানুষের শারীরিক মানসিক কর্মশক্তি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে। মানুষ তখন কঠোর পরিশ্রম করে নিজ নিজ পরিবারের ভাগ্য উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে; নৈরাশ্য হতাশা

www.pathagar.com

ঝেড়ে ফেলে আগ্রহ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হবে, বিশ্বের উন্নীত মানুষের মতোই যান্ত্রিক/কম্পিউটার সভ্যতা উপভোগের অনুপ্রেরণা লাভ করবে। তখন আর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক সমস্যাবলী তাকে ঠেকাতে পারবে না ; বরং মানুষ তখন ঐ সব সমস্যাকে পদদলিত করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে।

এই পুস্তকের অন্যত্র বলেছি দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে, "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" উপর। আমি অবশ্য সাথে সাথে এটাও বলেছি, শিল্পায়ন কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক হিসাবে কাজ করবে, করতেই হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" কথাটার বিশ্লেষণ দেয়া হয়নি। এখন সেই বিশ্লেষণ দেয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে।

"ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" বলতে আমি দেশবাসীকে যা বুঝাতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছি , তার সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করলামঃ

৮·৩·০১ঃ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের বিশ্বাস করে নিতে হবে যে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত যে সম্পদটি ব্যবহার করে আমাদের জীবন জীবিকা, আশা আকাংখা পূর্ণ করতে হবে, সেটা হলো "ভূমি সম্পদ"। আর এই ভূমি সম্পদ অত্যন্ত সীমিত, গড়পড়তা জন প্রতি মাত্র··· পৌনে এক বিঘা এর মধ্যে পাহাড় জঙ্গল, নদনদী, হাওর বাঁওড়, খাল বিল, রাস্তা ঘাট, অফিস আদালত, দালান কোঠা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, এমনকি কবরস্থান অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তি মালিকানা বহির্ভূত এই সব ভূমি বাদ দিলে মাথা পিছু গড়পড়তা ভূমি দাঁড়ায় আধা বিঘার মত।

৮·৩·০২ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা প্রদত্ত এই "ভূমি সম্পদ" সম্প্রসারণের সুযোগ নেই বললেই চলে, কিন্তু একদিকে উন্নয়ন কাজ সম্প্রসারণের জন্য, আর অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়তির জন্য, বছর বছর মাথা পিছু ভূমি সম্পদ কেবল কমেই আসছে।

৮·৩·০৩ঃ মানুষের জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে হবে, অর্থাৎ উন্নয়নের জন্যেই হোক, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপেই হোক, বছর বছর খাদ্য উৎপাদনের জন্য আবাদযোগ্য ভূমি কেবল সংকোচিতই হচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে নাঃ সমুদ্রমুখী সম্প্রসারণের সীমিত সুযোগ সু-কঠিন ও অনিশ্চিত।

৮·৩·০৪ঃ এই প্রেক্ষিতেই ধরে নিতে হবে যে মানুষের বসবাসের জন্য, চলাফেরার জন্য দৈনন্দিন নিজ নিজ দায়িত্ব আদায়ের জন্য যেটুকু ভূমিতে উৎপাদনকারী উদ্ভিদ লাগানো আদৌ সম্ভব নয়, কেবল সেই ভূমিটুকু ছাড়া দেশের বাদবাকী সাকুল্য ভূমি খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ এক বর্গফুট ভূমিও অব্যবহৃত থাকবে না, কারণ এক বর্গফুট ভূমিতেই যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন সম্ভব।

৮·৩·০৫ঃ প্রাচীন কাল থেকে সনাতনী প্রথায় ভূমি থেকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য 'কৃষি' নামক যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই 'কৃষি' কথাটার অর্থ হলো, বছরে বা

www.pathagar.com

মৌসুমে মৌসুমে ভূমি চাষ করে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন; অর্থাৎ কৃষি কথাটা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে বাৎসরিক বা মৌসুমী চাষাবাদ লব্ধ খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে।

৮·৩·০৬ঃ কৃষির এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ সংজ্ঞার জন্যই যুগ যুগ ধরে কৃষি সম্প্রসারণের সমস্ত প্রযুক্তি প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকছে ঐ সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে, অর্থাৎ বাৎসরিক বা মৌসুমী চাষাবাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে।

৮·৩·০৭ঃ দেশের সার্বিক ভূমির এক বৃহৎ অংশ কৃষির ঐ সংকীর্ণ সংজ্ঞার বহির্ভূত বলেই, অর্থাৎ বছরে বছরে, মৌসুমে মৌসুমে ঐ ভূমি চাষাবাদের অসুবিধার জন্যই, কৃষি সম্প্রসারণের আওতায় ঐ বিশাল ভূখন্ডকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। এরমধ্যে রয়ে গেছে সমতল, অসমতল বা উঁচু ভূমি, পাহাড় জঙ্গল, মানুষের বসত বাড়ী, অফিস আদালত, ছোট বড় হাজার হাজার শিল্প ও তৎসংলগ্ন সকল ভূমি, হাওর বাঁওড়ের নিচু ভূমি, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীমালার বিরাট চরাঞ্চলে এবং বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠা দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি

৮·৩·০৮ঃ উপরোক্ত কারণেই কৃষি সম্প্রসারণ বহুলাংশে সীমিত হয়ে আছে, নিবিড় চাষ করে বিঘা প্রতি ফলন বাড়ানোর মধ্যে, চাষাবাদের এলাকা সম্প্রসারণের যথেষ্ট চিন্তা ভাবনাই হয়নি।

৮·৩·০৯ঃ সমতল ভূমিতে বছর বছর বা মৌসুমে মৌসুমে চাষাবাদ করে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, অসমতল ভূমিতে তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমে, এবং অনেক কম ব্যয়ে দীর্ঘ মেয়াদী খাদ্য উৎপাদন করার সে সুযোগ নেয়া হয়নি। তার আরেকটি কারণ ইংরেজী 'হর্টিকালচার' শব্দের বাংলা কোন প্রতিশব্দ না থাকায় ঐ হর্টিকালচার শব্দটিকে "উদ্যান উন্নয়ন" নাম দিয়ে শহরের শোভা বর্ধনের কাজে লাগানো হচ্ছে, খাদ্য উৎপাদনে হর্টিকালচার যে কত বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টিই যায়নি। আমরা ইংরেজি গর্টিকালচারের বাংলা দুটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করছি–আর সে দুটি হলো, "ফলের চাষ" আর "সব্জির চাষ।"

৮·৩·১০ঃ এক একটি গ্রামের পরিসীমার মধ্যে, যেখানে সনাতনী পন্থায় চাষাবাদ সম্ভব নয়, সেখানে পরিকল্পিত ভাবে ফলের চাষ ও সব্জির চাষ ব্যাপক ভাবে চালু করে কৃষি উন্নয়নের সাথে সাথে ফল ও সব্জি চাষ ব্যাপক দারিদ্র বিমোচনে বিরাট অবদান রাখতে পারতো।

৮·৩·১১ঃ উপরোক্ত কারণেই হোক বা স্রেফ গাফলতির জন্যই হোক, অর্থকরী ফলবান বৃক্ষ লাগানোর কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। একই কারণে সনাতনী কৃষি বর্হিভূত সব্জি চাষের ব্যাপক ভিত্তিক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হবিগঞ্জ সীমান্তে গ্রামের লোকজন এক "কাকরল বিপ্লব" সাধন করে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস্য দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

৮·৩·১২ঃ যেখানেই যে গাছ গজিয়ে উঠে সেই গাছকেই একটি সম্পদ গণ্য করে রেখে দেয়া হয়। যদিও যুগ যুগ ধরে কেবল মাটির ভাংগন রোধ করা এবং ছায়া

www.pathagar.com

দান করা ছাড়া ঐ আজে বাজে গাছের আর কোন অবদানই নেই। একটি বারও চিন্তা করা হয়না, ঐ অনর্থকরী বৃক্ষের স্থলে ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা হলে মাটির ভাংগন রোধ ও ছায়া দান তো হতোই , তদুপরি বছর বছর পাওয়া যেত মূল্যবান ফল, যা অবশ্যই উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য।

৮·৩·১৩ঃ বসত বাড়ী ও তৎসংলগ্ন এলাকায়, তথা গ্রামের পরিসীমার মধ্যে এখানে সেখানে কোন পূর্ব পুরুষ কোন কালে যে দু'চারটি ফল গাছের বীজ কষ্ট করে পুঁতে রেখেছিলেন, সেটি বৃহৎ বৃক্ষ হলেও পরিচর্যার অভাবে, অযত্ন অবহেলায় সেই গাছ ফল দেয়া, হয় একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে, না হয় ফলের আকার ও মান এতই নিচু হয়ে গেছে যে এগুলো এখন প্রায় মূল্যহীন; তবু সেই গাছের পরিচর্যা করা হয় না।

৮·৩·১৪ঃ সনাতনী পন্থার চাষাবাদ সরকারের উদ্দ্যোগে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়ে অনেক উন্নত হয়ে গেলেও দীর্ঘস্থায়ী ফলবান বৃক্ষ লাগানোর প্রযুক্তিগত কলাকৌশল এবং পরিচর্যার রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়েছে যার ফলে গ্রামাঞ্চলের লোক গাছের চারা লাগানোর প্রযুক্তি ও কলা কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

৮·৩·১৫ঃ সরকারী বনায়ন কার্যক্রমে ফলবান বৃক্ষের চারা লাগানোর প্রতি রহস্যজনক অমার্জনীয় অবহেলা এবং তৎপরিবর্তে উন্নতমানের কাঠ প্রদানকারী গাছের চারা লাগাবার উৎসাহ দেয়ার কারণে গ্রামাঞ্চলের লোক নিজ বসত বাড়ীতে, তথা নিজ গ্রামের পরিসীমার মধ্যে কাঁঠাল, আম, জাম, পেয়ারা, বাতাবী লেবু, নারিকেল, সুপারী ইত্যাদির পরিবর্তে সেগুন, মেহগণি, কড়ই ইত্যাদি গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়ে গেছে, অর্থাৎ বছর বছর মূল্যবান ফল পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে ৩০/৪০ পর বছর কাঠের মূল্য পাওয়াই শ্রেয় বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে নিচ্ছে।

৮·৩·১৬ঃ মানুষ চিন্তাই করতে পারেনা যে তার জন্য একটি কাঁঠাল গাছ বা একটি আমগাছ, একটি সেগুন বা মেহগণি গাছের চেয়ে কতোবেশী শ্রেয় ; মানুষ ধারণাই করতে পারে না। যে স্বল্প স্থানে ২০টি নারিকেল গাছ বা ৫০টি সুপারী গাছ লাগিয়ে বছরে মাত্র দু'চার দিন পরিচর্যা করলে তার সারা জীবন ধরে বছর বছর যে প্রতিদান পাবে সেটা ঐ মূল্যবান কাঠ কিছুতেই দিতে পারে না।

৮·৩·১৭ঃ মানুষ এটা বুঝে না যে নারিকেল সুপারী ইত্যাদি গাছের মাঝে মাঝে সাথী ফসল হিসাবে সে পেঁপে, আনারস, আদা, হলুদ ইত্যাদি লাগিয়ে দ্বিগুণ তিন গুণ লাভবান হতে পারে

৮·৩·১৮ঃ গ্রামের এক একটি জঙ্গলাকীর্ণ ছায়াঘেরা বাড়ীতে ফল গাছ লাগানোর সার্থকতা মানুষ বুঝে না এবং বুঝানো হয়নি।

৮·৩·১৯ঃ গ্রামের মসজিদ, স্কুল প্রাঙ্গণে, কবর স্থানে, মজা দীঘির পাড়ে, হাট–বাজারে শতাব্দী ধরে যে বটগাছ আস্তানা গেড়ে বসে আছে, মানুষ একটিবারও চিন্তা

www.pathagar.com

করে না সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ বা বট বৃক্ষের আবশ্যকতা চলে গেছে যান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাব থেকে। এখন সেই বটবৃক্ষ আর মানুষের বন্ধু নয়, মানুষের শত্রু; কারণ আধবিঘা ভূমিকে ছায়ায় ঘিরে এবং রসহীন করে সেখানে ফলের গাছ লাগানো অসম্ভব করে তুলেছে।

৮·৩·২০ঃ বার্ধক্য জনিত জরাজীর্ণ গাছ কেটে তার স্থলে একাধিক ফলবান গাছ লাগানোর যুক্তি মানুষ বুঝে না, কারণ বৃক্ষ রোপনের প্রচারণার সাথে সাথে বৃক্ষ কর্তন নির্বিচারে নিষেধ করা হচ্ছে, যার ফলে মূল্যবান কাঠের গাছটিও জরাজীর্ণ হয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

৮·৩·২১ঃ সারা দেশের রেললাইন, রাজপথ, ছোটবড় সরকারী সড়ক, জেলা বোর্ডের সড়ক, ইউনিয়ন পরিষদের সড়ক, বন্যা নিয়ন্ত্রের বিরাট বিরাট বাঁধ, নদীনালার তীরবর্তী ডাইক, বোরো খেতের বেরী বাঁধ, ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য এখানে সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দু'পাশে যে গাছের চারা লাগাচ্ছেন, তার মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে সেগুন, মেহগিনী, শিশু ইত্যাদি উন্নতমানের বৃক্ষের চারা। আর মাঝে মাঝে অনর্থকরী গাছের চারা। একটা হাস্যকর ব্যাপার হলো প্রায় ক্ষেত্রে একই স্থানে প্রতি বছরই নুতন চারা লাগাতে হচ্ছে। এই সব রেলপথ, রাজপথ, সড়ক বাঁধ ইত্যাদিতে ফলের গাছ ও এলাকা বিশেষে বাঁশ, বেত, মুর্তা ইত্যাদি অর্থকরী উদ্ভিদ লাগানো সহজতর ও বেশী লাভজনক হবে। কোন্ এলাকায় কোন গাছ লাগানো উচিত, কোথায় কোন্ গাছ কয়েক মাস পানির নীচে থাকবে এই সব বিবেচনা না করে গাছ লাগিয়ে যাওয়া হচ্ছে লোক দেখানোর জন্য। আর বরাদ্ধকৃত টাকা ব্যয় করার একটা প্রমাণ খাড়া করতে এই অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল কার্যক্রমের উপর এই পুস্তকেই একটি বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচী দেবার চেষ্টা করবো।

৮·৩·২২ঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের গ্রামাঞ্চলের সমস্যা হলো বসত বাড়ীতে ফলগাছ লাগানোর স্থানই আর নেই। আজেবাজে গাছে ভর্তি বাড়ীর অধিকাংশ এলাকা এতোই ছায়া ঘেরা যে সেখানে সূর্য্যের আলোক রশ্মি পৌঁছতেই পারে না। সূর্য্যের আলোক রশ্মির স্পর্শ ছাড়া, এমনকি অন্য বৃক্ষের ডালপালার সরাসরি ঠিক নীচে কোন গাছই ভাল জন্মায় না; পেঁপে, আনারস, আদা, হলুদের মতো গুল্মও না। আজেবাজে গাছ কেটে ফেলে ফলের গাছ লাগিয়ে গাছ তলা পরিষ্কার রেখে সাথীফল জন্মানো অত্যন্ত লাভজনক এই উপলব্ধিটুকুই আমাদের দেশের লোকের হয়নি।

৮·৩·২৩ঃ রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে মোটামুটি ভাবে পরিস্থিতি একটু ভিন্নরূপ, কম বৃষ্টিপাতের জন্য বহুগ্রামে গাছপালা কম। কিন্তু গাছপালা যে হয়না এমন নয়। সুপরিকল্পিতভাবে যেখানে যে ফলগাছ সহজে জন্মায় সেখানে সে ফলগাছ লাগালে সমস্যা হয় কম। এই পুস্তকেই এলাকা ভিত্তিক ফলের চাষ ও সব্জির চাষের যে রূপরেখা দেবো, সেটা অনুসরণ করলে সমগ্র জাতি, সংশ্লিষ্ট পরিবার অবশ্যই উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

৮·৩·২৪ঃ "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর তালিকা অফুরন্ত। তালিকা আর বাড়িয়ে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। কেবল এইটুকুই বলে রাখবো ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" মাধ্যমে কেবল দারিদ্র বিমোচনই নয়, চমকপ্রদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

www.pathagar.com

৯ ঃ বাংলাদেশের ভূমি সম্পদ

৯·১ ঃ ভূমিকা

ভূমি সম্পদই মানুষের প্রথম ও প্রধান মৌলিক সম্পদ। মানুষের সকল কর্মকান্ডই ভূমি ভিত্তিক। মানুষ বাস করে ভূমির উপর, বিচরণ করে ভূমির উপর, খাদ্য উৎপাদন করে, সংগ্রহ করে ভূমি থেকে। ভূমির সাথে সম্পর্কহীন মানব সমাজ এখনো অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়। হয়তো বা অচিরেই এই অচিন্তনীয়, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। মানুষ বর্হিবিশ্ব জয় করে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কোন না কোন গ্রহে অবস্থান গেড়ে নেয়া এখন আর অসম্ভব বলা যায় না। কিন্তু এই পৃথিবীতে যারা বাস করছেন ও বাস করতে থাকবেন, তাদের ভূমি নির্ভরশীলতা এড়ানো সম্ভব নয়।

মানুষের মতোই রাষ্ট্রও ভূমি ভিত্তিক, ভূমি নির্ভরশীল; রাষ্ট্রের পরিসীমা ভূমি ভিত্তিক, রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথচ, আমাদের এই সোনার বাংলায় অন্ততঃ এক কোটি মানুষ আছেন যারা গৃহহীন, ভূমিহীন। ভূমির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই। এরা কোন ভূমির মালিক নন, ইজারাদারও নন। এরা ঠিকানাহীন ভাসমান এক জনগোষ্ঠি। এই পুস্তকেরই তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এই এক কোটি লোককে চিহ্নিত করেছি, দেশের দরিদ্রতম মানুষ হিসাবে। আমাদের হিসাব মতে এই এক কোটি লোকের গড়পড়তা দৈনিক আয় সাড়ে তিন টাকা ; অর্থাৎ গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ১২৭৭ টাকা, বা ৩৮ মার্কিন ডলার।

অর্থনৈতিক বিবেচনায় এই এক কোটি দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির এক ধাপ উপরে অবস্থান করছে আরো পাঁচ কোটি লোক, যারা গৃহহীন নয়, তবে ভূমিহীনের সরকারী সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এদের মাথা গোজার মতো অন্তত একটা ঝুপরি আছে, আর আবাসিক ন্যূনতম ভূমি ছাড়াও হয়তো অল্পকিছু আবাদ যোগ্য ভূমি আছে। এই স্বল্পতম ভূমি তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে এদেরকেও ভূমিহীনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই দেশের সর্বমোট এগার কোটি মানুষের মধ্যে অন্ততঃ ছয় কোটি মানুষ যে ভূমিহীনের সংজ্ঞায় পড়ে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অষ্টম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ভূমির অকল্পনীয় অমার্জনীয় অপচয়। নিয়তির নির্মম পরিহাস, একদিকে ভূমির অমার্জনীয় অপচয়, আর অন্যদিকে গৃহহীন, ঠিকানাহীন, ভূমিহীন মানুষের অবস্থান, এই রাষ্ট্রের পরিসীমারই মধ্যে। অষ্টম অধ্যায়ে আমরা আরো দেখেছি, মানুষের মৌলিক সম্পদ ভূমির অপরিকল্পিত, যথেচ্ছ অপব্যবহারের নমুনা। আমরা দেখেছি, দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় "ভূমি সম্পদ" কোন স্থানই পায়নি। এই প্রেক্ষিতেই আমরা সারাটি দেশের ভূমি সম্পদের একটা হিসাব নিকাশ করতে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

৯·২ ঃ ভূমির পরিসংখ্যান

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিসীমার মধ্যে নদী-নালা, খাল-বিল সহ ভূমির সর্বমোট পরিমাপ হলো ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল, অর্থাৎ ৩,৫৫,৮২,৭২০ একর ভূমি। তার মধ্যে নদ-নদী ইত্যাদির পরিমাপ ৩৬২৩ বর্গ মাইল অর্থাৎ ২৩,১৮,৭২০ একর। বাদ বাকী, ৫১,৯৭৫ বর্গমাইল, অর্থাৎ ৩,৩২,৬৪,০০০ একর ভূমি জনগণের ব্যবহারযোগ্য। এর মধ্যে আবার ৬৭,১২,০০০ একর ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং জনস্বার্থে, অর্থাৎ রেলপথ-রাজপথ, অফিস-আদালত, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ইত্যাদির জন্য। বনবিভাগের আওতায় আছে, ৫৪,১৬,০০০ একর ভূমি। এই ভূমিও জনগণের ব্যবহার্য নয়। এই সব বাদ দিয়ে জনগণের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২,১১,৫৮,০০০ একর ভূমি, অর্থাৎ ৬,৩৩,৪৭,৪০০ বিঘা ভূমি। ১১ কোটি লোকের মধ্যে এই সাকুল্য ভূমি সমভাবে বন্টন করে দিলে মাথাপিছু পড়ে আধা বিঘার মতো।

এই আধা বিঘা ভূমির মালিক তাঁর পুরো ভূমি খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই ভূমিটুকুরই এক অংশ তাকে ব্যবহার করতে হবে বাসস্থানের জন্য, গো-শালার জন্য, প্রস্রাব পায়খানার জন্য এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজের জন্য। তাই খাদ্য উৎপাদনের জন্য জন প্রতি ভূমি পাওয়া যাচ্ছে আধ বিঘারও কম সনাতনী পন্থায় এত অল্প ভূমিতে একজন লোকের বাৎসরিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন অসম্ভব। মূলতঃ এই কারণেই দেশ দারিদ্র কবলিত এবং ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতির শিকার। এই সমস্যা সমাধানের কোন সরকারী পরিকল্পনা আমি খুঁজে পাইনি। সমাধান খুঁজে বের করাই এই পুস্তক লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সারা দেশের গ্রামীণ বসত বাড়ির আওতাধীন আছে প্রায় ২২ লক্ষ একর ভূমি; আর দেশের পৌরসভাধীন শহর এলাকা দখল করে আছে প্রায় ৫ লক্ষ একর ভূমি।

অন্যদিকে দেশের হাওর বাঁওড় বিল ঝিল জলাশয়ের অধীনে আছে ৭,২৪,০০০ একর ভূমি। দেশের ১৭,৬৯,০০০ পুকুর ও দীঘি মিলিয়ে ৩,৩৬,০০০ একর ভূমি, আর একমাত্র কাপ্তাই হ্রদের পানির এলাকা ২,২৪,০০০ একর ভূমি।

এই পরিসংখ্যান উপস্থাপন করার দুটি উদ্দেশ্য। একটি হলো, সীমিত ভূমির উৎপাদন দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো সমস্যার প্রতি জনগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, জনগণকে জানিয়ে দেয়া যে এই সীমিত ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" না করলে এবং সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ না করলে, ১১ কোটি মানুষের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতেই, দেশের জনগণের আন্তরিক সহযোগীতার উপর আস্থা স্থাপন করে। আমি ১১ কোটি মানুষকে দারিদ্রের কবল থেকে উদ্ধার করে স্বাবলম্বী করার বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা এই পুস্তক মাধ্যমে জনগণের খেদমতে পেশ করছি।

www.pathagar.com

৯.৩ ঃ চরাঞ্চল

বাংলাদেশে দুই প্রকার চরাঞ্চল আছে। প্রথমটি দেশের অভ্যন্তরীণ নদ–নদীর চর, আর দ্বিতীয়টি গভীর সামুদ্রিক চর বা দ্বীপ।

বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র আয়তনের একটি দেশকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দেশটাকে প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এই নদীমালার পূর্বে অবস্থিত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, আর পশ্চিমে অবস্থিত রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, এক একটি বিশাল নদ–নদী। এই নদ–নদীগুলো ২ থেকে ৮ মাইল প্রশস্ত, এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০০ মাইল। এই বিশাল অববাহিকার অধিকাংশই চরাঞ্চল। বিরাট বিরাট চরের ফাঁকে ফাঁকে স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে অপ্রশস্ত আঁকাবাঁকা খাল দিয়ে। চরগুলো স্থিতিশীল নয়। প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে যখন হিমালয় পর্বতমালা থেকে হুড়হুড় করে স্রোতধারা দ্রুত বেগে বঙ্গোপসাগর মুখী ধাবিত হয়, তখন প্রকৃতির খেয়াল খুশী মতো কোন চর হয়ে যায় বিলীন, আর কোন খাল পরিণত হয় নতুন চরে।

এই ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা অববাহিকার আয়তন প্রায় দেড় হাজার বর্গ মাইল। এই দেড় হাজার বর্গমাইলের মধ্যে চূড়ান্ত ৫০০ বর্গমাইল হলো স্রোতধারা প্রবাহিত ছোট বড় বাড়ীর খাল, আর আনুমানিক ১০০০ বর্গমাইল হলো দেশের অভ্যন্তরীণ চরাঞ্চল। এই সব চরের আয়তন আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ অনুমান ভিত্তিক। এই চরাঞ্চলের কোন সরকারী পরিসংখ্যান আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো কোথাও থাকতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সঠিক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা সম্ভবই নয়। কারণ প্রতি বছরই চরাঞ্চলের অবস্থানও অবস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটছে।

তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে উত্তরে দিনাজপুর, রংপুর জেলার উত্তর সীমান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণে নোয়াখালী, বরিশাল জেলা দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই চরাঞ্চলের পরিধি এক হাজার বর্গমাইলের কম হবে না। অর্থাৎ এই চরাঞ্চলের পরিমাপ প্রায় ৬,৪০,০০০ একর অতি উর্বর ভূমি। এই অতি মূল্যবান এবং প্রচুর সম্ভাবনাময় চর সমুহের বৃহদাংশ অদ্যাবধি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি বিভিন্ন কারণে। ঐ কারণ গুলো ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি। এখানে যে কথাটি জোর দিয়ে বলতে চাই, সেটা হলো এই সম্পূর্ণ চর এলাকায় শুক্‌নো মৌসুমে বোরো ধান ও রবিশস্যের চাষাবাদ করে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। এটা করতে হলে এক বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যার দায়িত্ব হবে দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত চর এলাকায় শুক্‌নো মৌসুমে চাষাবাদ নিশ্চিত করা।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান মতে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে যে সব নতুন চর বা দ্বীপ জেগে উঠেছে তার পরিমাপ ৩,০১,৭২০ একর ভূমি। এই হিসাব বেশ কয়েক বছরের পুরানো। ইতিমধ্যে ঐ সব নতুন জেগে ওঠা দ্বীপের পরিধি বেড়েই

www.pathagar.com

চলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব দ্বীপের সঠিক জরীপ সম্পন্ন হয়নি। এগুলো বন্দোবস্ত দেয়াও হয়নি; এবং সরকারী রেকর্ড মতে এগুলোতে চাষাবাদ শুরু হয়নি। অসীম সম্ভাবনাময় এই ভূমি সম্পদের সদ্ব্যবহার বিলম্বিত হয়ে গেছে। আর বিলম্ব করা অমার্জনীয়। কাজটা অবশ্যই সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয় বহুলও বটে, কিন্তু দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে এই সামুদ্রিক চরাঞ্চলে, তথা দ্বীপ সমূহে, চাষাবাদের কাজ শুরু করে দিলে খাদ্য উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব সাফল্য সুনিশ্চিত। এবং তার সাথে দারিদ্র্য বেকারত্ব বিমোচনে এক উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জিত হবে।

দেশের অভ্যন্তরীণ চরাঞ্চল ও সামুদ্রিক চরাঞ্চলকে চাষাবাদের আওতায় আনার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখবো এই পুস্তকের পরবর্তী এক অধ্যায়ে।

www.pathagar.com

৯·৪ ঃ হাওর বাঁওড়ের নিম্ন ভূমি

সরকারী পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের হাওর বাঁওড়ের মোট ভূমির পরিমাপ ৭,২৪,০০০ একর। এই হাওর বাঁওড়গুলোর মধ্যেই অবস্থিত আছে শত শত বিল। বর্ষাকালে হাওর বাঁওড়ের সম্পূর্ণ এলাকা গভীর পানির নিচে ডুবে যায়। সেই অথই পানির মধ্যে ধান জন্মানো সম্ভব হয় না। হাওর বাঁওড় সংলগ্ন যে সব এলাকায় বর্ষাকালেও ধান জন্মানো যায়, সেগুলো আর হাওর বাঁওড় এলাকাভুক্ত ভূমি বলে গণ্য হয় না। সেগুলো তখন সংযুক্ত হয়ে যায় আবাদি ভূমির তালিকায়। তাই হাওর বাঁওড়ের এলাকাভুক্ত ৭,২৪,০০০ একর ভূমি এখন চাষাবাদ বহির্ভূত বলে ধরে নেয়া যায়। তবে শুকনো মৌসুমে যখন পানি কমে যায়, তখন হাওর বাঁওড়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূমি পানির নীচ থেকে ভেসে উঠে। সেই সময় চাষীরা নিজ নিজ গ্রামের নিকটস্থ ভূমিতে বোরো ধান ও রবিশস্য ফলায়। কিন্তু পানির নীচে থেকে শুকনা মৌসুমে জেগে ওঠা অধিকাংশ ভূমিই অনাবাদি অবস্থায় পড়ে থাকে। এর কারণ সেচ ব্যবস্থার অভাব। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুমান করি, সারাদেশের হাওর বাঁওড়ের অন্ততঃ তিন লক্ষ একর ভূমিতে শুকনা মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে, এবং বোরো ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

এই উদ্দেশ্যে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পরবর্তীতে জাতির কাছে পেশ করছি।

www.pathagar.com

১০ ঃ ভূমি পূনরুদ্ধার

১০.১ ঃ ভূমিকা

এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর যে তালিকা দিয়েছি, তার মধ্যে ভূমির অপচয় ও অপব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আমরা ভূমির অপচয় অপব্যবহার বন্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। আমরা বারবার যুক্তি দিয়েছি, "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" প্রক্রিয়া চালু করার জন্য। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছি যে "ভূমির সবাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" মাধ্যমেই বাংলাদেশের দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর জন্য কোথায় কি পরিমাণ ভূমি পাওয়া যাবে। এ প্রশ্নের উত্তর "অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান" শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এই অধ্যায়ে একটুখানি গুছিয়ে "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর জন্য কোথায় কি পরিমান ভূমি পাওয়া যাবে তার একটি তালিকা প্রদান করছি।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, "ভূমি পূনরুদ্ধার" বা "ল্যান্ড রিক্ল্যামেশন" একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমির পূনরুদ্ধার বলতে বুঝায় দেশের সমুদ্র সীমার মধ্যে চর জেগে উঠার মাধ্যমে ভূমি সম্পদ সম্প্রসারন। তা ছাড়াও, নদীর ভাঙ্গনে যে সব ভূমি বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই বিলুপ্ত ভূমি পুনরুদ্ধার করাও আর্ন্তজাতিক ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই দুটি কার্যক্রম বিশ্বের বহু দেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও "ভূমি পূনরুদ্ধার" কার্যক্রম বেশ কিছুকাল পূর্বে গৃহিত হয়েছে এবং আর্ন্তজাতিক সাহায্য নিয়ে নদ-নদীর মোহনায় এই কার্যক্রমে অল্প কিছু সাফল্যও অর্জন করেছে।

নেদারল্যান্ড্স্ সরকারের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগীতায় নোয়াখালী জেলার চর বাগারদোনা এলাকায় যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছিল, ১৯৮৪ সালে দুইবার আমি সেই প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সাথে ছিলেন নেদারল্যান্ড্স্ সরকারের বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূত। তারপর, ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদের সাথে আমি তৃতীয়বার নোয়াখালীর চর এলাকায় যাই, ভূমি পূণরুদ্ধার কার্যক্রম সম্প্রসারনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করতে এই সম্বন্ধে এই অধ্যায়েই কিছুটা আলোকপাত করবো।

সনাতনী পন্থায় সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার ও নদীর ভাঙ্গনের ভূমি উদ্ধারের চেয়ে আমরা বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি, অপচয় কৃত অপব্যবহৃত ভূমিকে "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর আয়ত্তাভূক্ত করতে। এর তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, সমুদ্র ও নদীগর্ভ

www.pathagar.com

থেকে ভূমি উদ্ধার কার্যক্রম সরকারী ভাবে অনুমোদিত এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায় দায়িত্বে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। অর্থাৎ এই কাজতো চালু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, সমুদ্র ও নদীগর্ভ থেকে ভূমি উদ্ধার অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তৃতীয়ত, এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে আবাদযোগ্য ভূমির অপচয় অপব্যবহার চলতেই থাকবে, আর আমরা সমুদ্র ও নদীগর্ভ থেকে প্রচুর ব্যয়ে ও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে ভূমি উদ্ধার করতে থাকবো। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি এখন ভূমি পুনরুদ্ধারের, অর্থাৎ অপচয়কৃত অপব্যবহৃত ভূমিকে "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এ আনার সুপারিশ পেশ করছি।

www.pathagar.com

১০·২ ঃ অপচয়কৃত অপব্যবহৃত ভূমি উদ্ধার

ভূমির অপচয় অপব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করেছি; আলোচনার আর বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলে মনে করিনা। তাই সরাসরি "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর জন্য অপেক্ষমান যে সব ভূমি অপচয় অপব্যবহার হচ্ছে তার তালিকা নিম্নে পেশ করছি।

১০·২·০১ঃ দেশের সর্বত্র যেখানেই মানুষের শত্রু বলে চিহ্নিত বটবৃক্ষ অবস্থান করছে, সে সবগুলোর মূল উৎপাটন করে তড়িৎ গতিতে উদ্ধারকৃত ভূমি আবশ্যকীয় সংস্কার করে ব্যবহারে আনা। আর সাথে সাথে সারা দেশের যত দালানে বটের চারা গজিয়ে উঠেছে সেগুলোরও মূল উৎপাটন করে বটবৃক্ষের নাম নিশানা মুছে ফেলা। সারা দেশে মাত্র ১ লক্ষ বটবৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে ভূমি উদ্ধার হবে প্রায় ২০,০০০ একর।

১০·২·০২ঃ দেশের যেখানেই বিশাল বিশাল অনর্থকরী বৃক্ষ ছাতা বিস্তার করে যথেষ্ট ভূমির অপচয় করছে এই সমস্ত বৃক্ষের মূল উৎপাটন করে উদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কারের পর ব্যবহারে আনা। সারা দেশে এসব বৃক্ষের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ হলেও ভূমি উদ্ধার হবে প্রায় ২০,০০০ একর।

১০·২·০৩ঃ দেশের যেখানেই যতো বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ বৃক্ষ, কেবল প্রাণ রক্ষার জন্য মাটির রস চুষে নিচ্ছে, এই সব বৃক্ষের মূল উৎপাটন করে উদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কারের পর ব্যবহারে আনা। সারা দেশে এরূপ বৃক্ষের সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ হলেও ভূমি উদ্ধার হবে প্রায় ২০,০০০ একর।

১০·২·০৪ঃ দেশের যেখানেই যেসব বৃক্ষের আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে, ফলবান বৃক্ষই হোক, মূল্যবান কাঠ প্রদানকারী বৃক্ষই হোক, বা অনর্থকরী বৃক্ষই হোক, এই সমস্ত বৃক্ষ পর্যায়ক্রমে মূল উৎপাটিত করে উদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কারের পর ব্যবহারে আনা। এরূপ বৃক্ষের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ লক্ষ হবে। তাই ভূমি উদ্ধার হবে ১,০০,০০০ একর।

১০·২·০৫ঃ সারা দেশের সর্বত্র, বসতবাড়ীতেই হোক, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনেই হোক, ফল বাগানেই হোক, হাট বাজারেই হোক, যেসব অনর্থকরীবৃক্ষ ভূমি দখল করে আছে, সেই সব বৃক্ষ পরিবর্তনের একটা তিনসালা বা পাচঁসালা প্রকল্প গ্রহন করে পর্যায়ক্রমে এসবের মূল উৎপাটন করে উদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কার করে ব্যবহারে আনা। এরূপ বৃক্ষের সংখ্যা অগনিত। এসবের মূল উৎপাটন করে ভূমি পাওয়া যাবে ৩,০০,০০০ একর।

১০·২·০৬ঃ দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে বসত বাড়ীতে, গ্রামে গঞ্জে, আবাসিক এলাকায় যেসব অনর্থকরী আজে বাজে ঝোপঝাড় আছে এসবগুলোর মূল উৎপাটন

www.pathagar.com

করে ঐ উদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কার করে ব্যবহারে আনা। এই ভূমিতে ফলবান বা অর্থকরী বৃক্ষ হয়তো রোপন করা যাবে না, তবে সাথী ফসল, যেমন, পেঁপে, আনারস, আদা, হলুদ, এলাচি লাগানো যাবে। এই ভাবে উদ্ধারকৃত ভূমি আমাদের হিসাবে খুব কম করে ধরলেও মাত্র ১,০০,০০০ একর।

১০·২·০৭ঃ দেশের যেখানেই ফল (কাঁঠাল, আম, লিচু, পেয়ারা, নারিকেল, সুপারী, কলা, পেপেঁ ইত্যাদি) বাগানের মধ্যে অবাঞ্ছিত বৃক্ষ গজিয়ে উঠে ফলবান বৃক্ষের উপরে ছত্র বিস্তার করে ক্ষতি করছে তার মূল উৎপাটন করে ঐ উদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কার করে ব্যবহারে আনা। এ ক্ষেত্রেও নুতন বৃক্ষ হয়তো লাগানো যাবে না। সাথী ফসলের জন্য পাওয়া যাবে ২০,০০০ একর।

১০·২·০৮ঃ সারা দেশের ৪৪৮৮ মাইল রেলপথ, ৬৯৪৭ মাইল রাজপথ, ১২,৯৮০ মাইল জেলা পরিষদ সড়ক, ১৫,৫০০ মাইল উপজেলা পরিষদ সড়ক, ৯১,৮৩০ মাইল ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক, সর্বমোট ১,৩১,৭৪৫ মাইল রাস্তার দুইপাশে অর্থাৎ, ২,৬৩,৪৯০ মাইল দীর্ঘ স্থানে একসারী, কোথাও বা দুই সারী ফলবান ও অর্থকরী বৃক্ষ রোপনের জন্য পাওয়া যাবে আনুমানিক ৯০,০০০ একর ভূমি।

১০·২·০৯ঃ সারা দেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের, সুবৃহৎ ও সুউচ্চ বন্যানিয়ন্ত্রন বাধেঁর দৈর্ঘ হলো ৮০৫২ মাইল। এই সব বাঁধের কেবল কিনারা দিয়েই নয়, উপর দিয়েও বৃক্ষরোপন অত্যাবশ্যক, কারণ বন্যা ও জলোচ্ছাসের তোড় থেকে এই বাঁধ রক্ষার জন্য বৃক্ষই হলো শক্তিশালী মাধ্যম। এই সব বাঁধের আয়তন হবে সর্বমোট ৫০,০০০ একর।

১০·২·১০ঃ সারা দেশব্যাপী নদ--নদীর কিনারা দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য নির্মিত ডাইকের দৈর্ঘ্য হলো ৭৬০০ মাইল। এই সব ডাইক রাস্তা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য কেবল দুই কিনারা দিয়ে ফলবান ও অর্থকরী বৃক্ষ রোপন সম্ভব। এই ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে আনুমানিক ১৮,০০০ একর ভূমি।

১০·২·১১ঃ সরকারী পরিসংখ্যান মতে, ৫/৬ যুগ থেকে পরিত্যক্ত সকল বিমান বন্দরের আয়তন ৭৪৭ একর ভূমি। এই সব পরিত্যক্ত বিমান বন্দরের ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ব্যবহারের কথা বিবেচনায় রেখে এই সব বিমান বন্দরে লম্বালম্বি ভাবে দুইপাশ ধরে সারিসারি অনুচ্চ ফলবান ও অর্থকরী বৃক্ষ লাগানো যেতে পারে। বিমান অবতরন ও উড্ডয়নের পথে এবং বিমান বন্দরের মধ্যস্থলে স্বল্প মেয়াদী অর্থকরী ফসল লাগানো অবশ্যই সম্ভব। এই সমস্ত কার্যক্রমের জন্য পাওয়া যাবে প্রায় ৫০০ একর ভূমি।

www.pathagar.com

১০·২·১২ঃ আমনুড়া– গোদাগারী পরিত্যক্ত রেললাইনের সাকুল্য ভূমিকে ভাগ করে প্রায় ৩০টি চমৎকার ফলের বাগান তৈরীকরা যেতে পারে। এতে পাওয়া যাবে আনুমানিক ৬০০ একর ভূমি।

১০·২·১৩ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচের খালের মোট দৈর্ঘ্য হবে আনুমানিক ৮,০০০ মাইল। এই গুলোতে বোরো চাষ ছাড়াও মৎস্য চাষ ও হাঁসপালন চীন দেশীয় প্রথায় অতি সহজেই করা যেতে পারে। এই সব খালের আয়তন হবে আনুমানিক ২৯,০০০ একর।

১০·২·১৪ঃ দেশের রাজধানী থেকে শুরু করে সকল বিভাগীয় শহর, জেলা উপজেলা শহর ও অন্যান্য বানিজ্যকেন্দ্র বন্দর ইত্যাদি সরকারী বেসরকারী সমস্ত ভূমি, যে সবে সারিসারি ফলবান বৃক্ষ রোপন করলে শোভা বর্ধিত হবে, ভূমির মালিক উপকৃত হবেন এবং শহরে আগত গ্রামের জনগণ ঐ ভাবে ফলবান বৃক্ষ রোপনের অনুপ্রেরণা পাবেন। ভূমি পাওয়া যাবে প্রায় ১,০০,০০০ একর।

১০·২·১৫ঃ দেশের সকল খেলার মাঠ, পার্ক ও অন্যান্য বিনোদন কেন্দ্র যে গুলোর কিনার দিয়ে ফলবান বৃক্ষ সারিবদ্ধ ভাবে লাগালে কারো কোন অসুবিধা হবে না বরং সুবিধাই হবে। ভূমি পাওয়া যাবে প্রায় ২০,০০০ একর।

১০·২·১৬ঃ সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মাদ্রাসা, স্কুল ইত্যাদির চর্তুকিনার দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে, এবং যেখানেই স্থান সংকুলান হবে সেখানেই ফল উৎপাদন ও শ্রীবৃদ্ধি করণের সমন্বিত পরিকল্পনায় এলাকার মাটির গুণগত মানের সাথে সঙ্গতি রেখে ফলবান বৃক্ষ রোপন। ভূমি প্রায় ১,০০,০০০ একর।

১০·২·১৭ঃ সারা দেশের সকল সরকারী সংস্থার প্রাঙ্গনে শ্রীবৃদ্ধি করণ ও ফল উৎপাদনের পরিকল্পিত কর্মসূচী। ভূমি প্রায় ৫০,০০০ একর।

১০·২·১৮ঃ দেশের সকল ক্যান্টনমেন্ট, সেনা ছাউনী, বি, ডি, আর হেড কোর্য়াটার থেকে শুরু করে সীমান্ত ফাঁড়ি পর্যন্ত, সকল পুলিশ লাইন থেকে শুরু করে থানা আউট পোষ্ট পর্যন্ত, আনসার হেড কোর্য়াটার থেকে শুরু করে গ্রামীন ফাঁড়ি পর্যন্ত, ভি ডি পি ও গ্রাম রক্ষী দলের হেড কোয়ার্টার থেকে শুরু করে যেখানেই সম্ভব শ্রীবৃদ্ধি করণ ও ফল উৎপাদনের কর্মসূচী। ভূমি প্রায় ৫,০০,০০০ একর।

১০·২·১৯ঃ দেশের সকল সার্কিট হাউস, ডাক বাংলো ও সরকারী সংস্থা সমূহের গেষ্ট হাউস ইত্যাদিতে শ্রীবৃদ্ধি করণ ও ফল উৎপাদনের আর্দশ কর্মসূচী। ভূমি প্রায় ২০,০০০ একর।

১০·২·২০ঃ দেশের সকল কবরস্থানকে ঘেরাও করে শ্রীবৃদ্ধি করণ ও পশু খাদ্য উৎপাদনের কর্মসূচী, যার মধ্যে থাকবে পশু খাদ্য ও জ্বালানী কাঠের

www.pathagar.com

উপযোগী ইপিল ইপিল জাতীয় সুন্দর বৃক্ষরাজী, আর অভ্যন্তরে উন্নতমানের ঘাস উৎপাদন কর্মসূচী। ভূমি প্রায় ১,০০,০০০ একর।

১০·২·২১ঃ দেশের সকল কারাগার ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদিতে ফলবান বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর সাথে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যোগ দেয়া উচিত হবে। ভূমি প্রায় ১০০০ একর।

১০·২·২২ঃ দেশের সকল পুরান রাজবাড়ী, জমিদার বাড়ী, অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তির জন্য সুপরিকল্পিত শ্রীবৃদ্ধিকরণ ও ফল উৎপাদন কর্মসূচী। ভূমি প্রায় ৫০,০০০ একর।

১০·২·২৩ঃ দেশের সকল মসজিদ, ঈদগাহ্, দরগাহ, উপাসনালয় ইত্যাদির শ্রীবৃদ্ধিকরণ ও ফল উৎপাদন কর্মসূচী। ভূমি ৫০,০০০ একর।

১০·২·২৪ঃ কাপ্তাই হ্রদসহ দেশের সরকারী বেসরকারী সকল জলাশয় পুকুর দীঘি ইত্যাদি, যার মোট সংখ্যা ১৭,৬৯,০০০ এবং ভূমির পরিমাণ ৪,৯৫,৬০০ একর।

১০·২·২৫ঃ দেশের চা বাগান সমূহের যেসব ভূমি এখনো চা-গাছ রোপনের অপেক্ষায় আছে, এবং চা-বাগানের টিলার দক্ষিণ ঢালু ভূমি, যেখানে চা গাছ জন্মায় না। ভূমির পরিমাপ ১,৫০,০০০ একর।

১০·২·২৬ঃ দেশের সকল সরকারী দুগ্ধ ও পশু প্রজনন খামার। ভূমির পরিমাপ প্রায় ৪০০০ একর।

১০·২·২৭ঃ দেশের সকল সরকারী মোরগ হাঁস খামার। ভূমির পরিমাপ প্রায় ২০০ একর।

১০·২·২৮ঃ সর্বোপরি বন বিভাগের আয়ত্তাধীন যেসব এলাকা বৃক্ষহীন হয়ে পড়ে আছে, যেমনঃ মহেশখালীর পাহাড়, লালমাই বন এলাকা, ময়নামতি বন এলাকা, ভাওয়াল এলাকা, বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইত্যাদি বন বিভাগের আয়ত্তাধীন সকল এলাকায় নতুন বনায়ন কর্মসূচীতে ফলবান বৃক্ষকে অগ্রাধিকার দেবার কর্মসূচী।

www.pathagar.com

১০·৩ ঃ নদনদীর চর পুনরুদ্ধার

ইতিপূর্বে বিশদ বর্ণনা দিয়েছি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদ-নদীমালা কিভাবে বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত থেকে দক্ষিণমুখী অভিযাত্রায় বিরাট বিরাট চর সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের সাথে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, এসব চরের নদী। জল প্রবাহের চেয়ে এদের বৈশিষ্ট্য হলো খেয়াল খুশীমত বছর বছর নতুন চর সৃষ্টি করা, আর কিছুদিন পর পর ঐ সব চরকে বিলীন করে গভীর স্রোত প্রবাহ পরিবর্তন করে মূল নদীর উপরই নতুন চর সৃষ্টি করা। আমরা আরো বলেছি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চর এলাকার আয়তন হবে প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল; যার মধ্যে প্রায় এক হাজার বর্গমাইলই শুকনো মৌসুমে বোরো চাষের জন্য, শাক্‌সব্জি চাষের জন্য, তৈলবীজ চাষের জন্য অতি উর্বর ও উত্তম। আমরা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট পরামর্শ দিয়েছি দেশের অভ্যন্তরীণ এই বিশাল চরাঞ্চলকে খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করে দারিদ্র বেকারত্ব মোচনে সর্বতোভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যে আরো বলেছি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার অভ্যন্তরে যেসব নূতন চর জেগে উঠেছে, যে সব চর এখনো জরীপ করা হয়নি, বন্দোবস্ত দেয়াও হয়নি, সে সব চরও দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে সরাসরি ব্যবহার করতে হবে। এই কাজে আমরা পেয়ে যাবো কমপক্ষে ৩,০০,০০০ একর ভূমি।

চরাঞ্চলের ভূমির যে সব কঠিন সমস্যা আছে সে সব সমাধানের জন্য শক্তিশালী অবকাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। সে সম্বন্ধে এ পুস্তকের শেষ দিকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করবো।

www.pathagar.com

১০·৪ ঃ ভূমি পুনরুদ্ধার পরিক্রমা

আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণ এই ভূমি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ভুল বুঝবেন না। এই পুনরুদ্ধার অর্থ আলোচিত ভূমির মালিকানা দখল বা হস্তান্তর নয়। এই পুনরুদ্ধার অর্থ হলো আলোচ্য ভূমি, হয় পুরোপুরি না হয় আংশিক ভাবে, অপচয় অপব্যবহার হচ্ছে। এই অপচয়কৃত অপব্যবহৃত ভূমিকে ভূমির মালিকগণ কর্তৃকই "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার " এর জন্য উদ্ধার করার প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপটি আমরা নিরূপিত করে দিলাম। যেখানে একটি বিরাট বটবৃক্ষ আধ বিঘা ভূমিকে শতাব্দী ধরে শোষণ করছে, অর্থাৎ আধ বিঘা ভূমি অপব্যবহৃত হচ্ছে, আমাদের পরামর্শ সেই বটবৃক্ষের মুল উৎপাটন করে ঐ ভূমি খন্ডকে সংস্কার করে সেখানে ৪ থেকে ১৬টি ফলবান বৃক্ষ লাগানো সম্ভব। কি গাছ লাগানো হবে, কয়টি লাগানো হবে, সেটি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোন্ ফলবান বৃক্ষ ভাল হয় ও ফল ভালো ধরে। আম গাছ হলে হয়তো চারটি, কাঁঠাল গাছ ৮টি, নারিকেল গাছ ১২টি, সুপারী গাছ ২০টিও লাগানো যেতে পারে।

এই অধ্যায়ে চরাঞ্চল বাদ দিয়ে সর্বমোট ২৮টি কর্মসূচীর প্রস্তাব দিয়েছি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠকের অনুসন্ধিৎসা নিবারণের জন্য একেকটি কর্মসূচীতে কি পরিমাণ ভূমি উদ্ধার হবে তারও একটি হিসাব দিয়েছি।

১০·২·২২ঃ প্যারায় অর্পিত সম্পত্তির বেলা আমরা পুনরুদ্ধার করার মত সম্ভাব্য ভূমির পরিমাপ দেইনি, এইজন্য যে অর্পিত সম্পত্তির পুরো বিষয়টি সরকারী পর্যায়ে এখনো অমিমাংসীত। সর্বমোট ৭,৭০,৫০৮ একর অর্পিত সম্পত্তি সিদ্ধান্তহীনতার জন্য ১৯৬৫ সাল থেকে ঝুলছে। এই বিষয়টির আদ্যোপান্ত সব কিছুই আমার জানা আছে, কিন্তু এখানে এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কের সৃষ্টি করে লাভ নেই।

১০·২·২২ঃ প্যারায় বিনিময় সম্পত্তির কতটুকু "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর জন্য উদ্ধার করা যাবে তার কোন পরিমাপও এখানে দিচ্ছি না। ১৯৪৭–৪৮ সালের বিনিময়কৃত ভূমি রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি সম্বন্ধে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কোন সঠিক সিদ্ধান্তই ছিল না। ১৯৮৪ সালের প্রথমদিকে আমার উদ্যোগে সকল ডেপুটি কমিশনার, সকল কমিশনার, সংশ্লিষ্ট সকল সচিব এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে সারাদিনব্যাপী আলোচনার পর যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, তিন বছর গড়িমসির পর সেটা এখন বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তাই এই বিনিময় সম্পত্তি ও বর্তমান বিবেচনায় আনলাম না।

১০·২·২৮ প্যারায় উল্লেখিত বন বিভাগের আয়ত্বাধীন মোট যে ৯,৫৭৫ বর্গমাইল ভূমি আছে। এর একটা বিরাট অংশের মধ্যে বন জঙ্গল তো দূরের কথা, কোন বৃক্ষই নেই। যেহেতু এই ভূমি একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং যেহেতু এই সাকুল্য ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর অবকাঠামো সেই মন্ত্রণালয়ের আছে, যা অন্য

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয়ের নেই, সেই হেতু আমি বন বিভাগের নুতন বনায়ন কর্মসূচীতে ফলবান বৃক্ষ রোপণকে অগ্রাধিকার দেবার পরামর্শ দিয়ে দায়িত্বটি তাদের উপর ছেড়ে দেয়াই শ্রেয় মনে করি।

১০·২ঃ অধ্যায়ে আমাদের পরিকল্পনা মতে ২৬,১২,৯০০ একর ভূমি পাওয়া যাচ্ছে, যে ভূমি এখন পুরোপুরি অথবা আংশিক অংচয় অপব্যবহার হচ্ছে, এবং এই ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করতে কারোই আপত্তি থাকার কথা নয়। এই ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" এর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী এরপরই দিচ্ছি।

উপরেল্লিখিত সমস্ত ভূমিই নিবিড় ফলের চাষ ও সব্জির চাষে ব্যবহার করার পরিকল্পনা আমরা দিচ্ছি। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ চরাঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠা যেসব চর আমাদের পরিকল্পনার আয়ত্তাধীন হবে, সেখানে কিন্তু আমাদের সুপারিশ হবে ধান, গম, ভূট্টা, কাউন, চিনা, আলু ও অন্যান্য শাকসব্জি এবং তৈল বীজ উৎপাদনের।

www.pathagar.com

১১ ঃ কৃষি বিপ্লব

১১·১ ঃ সনাতনী কৃষি

সনাতনী প্রচলিত অর্থে কৃষি বলতে বুঝায় বছর বছর মৌসুমে মৌসুমে সনাতনী প্রথায় ভূমি চাষ করে বীজ বপণ করে বা চারা রোপণ করে শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। চাষ বলতে বুঝায় সনাতনী পদ্ধতিতে, অর্থাৎ পশু টানা লাঙ্গল দিয়ে অথবা ট্র্যাকটর দিয়ে মাটি কর্ষণ করা। অর্থাৎ মাটিতে গাছের চারা লাগানো, এমনকি বাড়িতে বাড়িতে সব্জি ফলানোকে আমাদের দেশে চাষাবাদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তাই আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস, চা বাগানগুলোকে চা শিল্প বলা হয়, কৃষি বলা হয় না। অনুরূপ ভাবে দেশে ছোট ছোট যেসব উদ্ভিদের বাগান আছে, যথা সুপারী বাগান, নারিকেল, আম বাগান এবং বৃহত্তর রাবার বাগানকেও কৃষির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয় না। তবে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যেসব সব্জি উৎপাদন করা হয়, সেগুলোকে কিন্তু সব্জি চাষ বলা হয়। সব্জির সঙ্গে ঐ পন্থায় উৎপাদিত ফল যেমন– তরমুজ, বাঙ্গি, খিরা, ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকার ডাল ইত্যাদিও এসে যায়, কৃষির মধ্যে।

কৃষির এই প্রচলিত সংজ্ঞা, অর্থাৎ লাঙ্গল বা ট্র্যাকটর দিয়ে মাটি কর্ষণ করে যেসব চাষাবাদ করা হয়, সেগুলো আর মাঠের মধ্যে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে অথবা চরাঞ্চলে মাটি কর্ষণ না করেও যে শস্য বা ফলমূল শাক সব্জি ইত্যাদি ফলানো হয়, সেই কর্ম প্রক্রিয়ার নামই হল কৃষি। বৃক্ষ রোপণকে কৃষি বলে গণ্য করা হয় না। বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা পুকুর পাড়ে, পথের ধারে, মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল প্রাঙ্গণ ইত্যাদি স্থানে একটু মাটি খুঁড়ে তরিতরকারী বা ফল গাছ লাগানোকেও কৃষি বলা হয় না।

প্রচলিত অর্থে চাষাবাদের অর্ন্তভুক্ত হয় না, অথচ মাটি খুঁড়ে বীজ লাগিয়ে উৎপাদন করা ফলমূল শাক সব্জি যা উৎপাদিত হয় এবং যার বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনা রয়ে গেছে, এই কর্মকান্ডের কোন নামই বাংলা ভাষায় খুঁজে পাচ্ছি না। ফলের চাষ ও সব্জির চাষের কোন নাম থাক বা নাই থাক, এই অধ্যায়ে আমরা যে কৃষি বিপ্লবের প্রস্তাব দিচ্ছি এই বিপ্লব প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত কৃষি বিপ্লব। এ বিপ্লব বিরাট সম্ভাবনাময়। এ বিপ্লব মানুষ সহজে গ্রহণ করবে, কারণ এই প্রস্তাবিত বিপ্লবের প্রক্রিয়া মানুষের কাছে নুতন কিছু নয়। এ বিপ্লব মানুষ সীমিত ভাবে, অপরিকল্পিত ভাবে, দারিদ্রের তাড়নায় বাধ্য হয়ে শুরু করে দিয়েছে। তবে এই বিপ্লবের গতি এতোই মন্থর যে, একে বিপ্লব বলাই যায় না, একে মন্থর গতিতে একটা পরিবর্তন বলা যায়। বিপ্লবের অর্থ সাধারণ পরিবর্তন নয়। বিপ্লবের অর্থ অভাবনীয় পরিবর্তন। বিপ্লব কথাটির মধ্যে একটা বিদ্রোহাত্মক ভাব, একটা সংগ্রামী চেতনা অন্তর্নিহীত আছে। তাই মানুষ যে পরিবর্তিত প্রক্রিয়াকে মন্থর গতিতে বাস্তবায়িত করছে, আমরা সেটাকেই সুপরিকল্পিত বিপ্লব হিসাবে একটা বিদ্রোহাত্মক অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

www.pathagar.com

১১·২ ঃ কৃষি মৌসুম বিপ্লব

সেই প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের কৃষি আবহাওয়া ভিত্তিক, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষি কাজে মাটির সাথে পানির সংযোগ অপরিহার্য, সেইহেতু প্রাচীন কাল থেকেই বর্ষার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নিবিড়। তাই আমাদের প্রচলিত কৃষি মৌসুম শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে, যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়, আর আশ্বিন কার্তিক মাসে যখন বৃষ্টিপাত শেষ, তখন শুরু হয় শস্য উঠানোর পালা। প্রচলিত পন্থায় অগ্রহায়ণ মাস হলো আমোদ প্রমোদের মাস, উৎসবের মাস, কারণ সেই মাসে ঘরে ঘরে ধান ও পাট মজুত হয়ে যায়।

এখন কিন্তু আর সেই অবস্থা নেই। এখন প্রায় প্রতিবছরই দেশের অনেক অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস আর আনন্দ উৎসবের মাস নয়, হাহাকারের মাস। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, অর্থাৎ কাল বৈশাখী, ঘুর্নীঝড়, টর্নেডো, বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির ছোবলে প্রতিটি বছরই দেশের কোন না কোন অঞ্চলে বর্ষাকালীন ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে আশ্বিন কার্তিক মাস থেকেই মানুষের হা-হুতাশ শুরু হয়ে যায়; অগ্রহায়ণ পৌষ মাস পর্যন্ত সেটা গিয়ে দাঁড়ায় হাহাকারে।

এই ঘাত প্রতিঘাতের নির্মমতাই মানুষকে বাধ্য করেছে, শুকনো মৌসুমেও ধান চাষ করতে। প্রথমে বোরো ধানের চাষ, আর এখন কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার অবদানে আরো উন্নত মানের ধান চাষ প্রচলিত হয়ে গেছে শুকনো মৌসুমে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পানির। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্যই প্রচলন শুরু হয় লো-লিফ্‌ট্‌পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল ইত্যাদি আধুনিক সেচ যন্ত্র ব্যবহার। আর সাথে সাথে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও শুরু হলো। এতে ফল পাওয়া গেলো অবিশ্বাস্য ভাবে। যেখানে একবিঘা ভূমিতে ১০ মণ ধান পেলে চাষীরা ধন্য হতো, সেই এক বিঘা ভূমিতে এখন উৎপাদিত হচ্ছে ২০/৩০/৪০ মণ ধান।

কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও চাষীর দারিদ্র মোচন হলো না। জন সংখ্যার লাগামহীন বৃদ্ধিতে মাথা পিছু চাষাবাদ যোগ্য ভূমির পরিমাণ এতোই কমে গেছে যে আবাদযোগ্য ভূমিতে বছরে ২/৩ ফসল না ফলালে এখন আর পোষায় না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অধিকাংশ স্থানে একটি মাত্র ফসলের বেশী পাওয়া সম্ভব হয় না। এমনও বহু আবাদযোগ্য ভূমি আছে, যেখানে বছর শেষে দেখা গেলো ফসল উৎপাদনই সম্ভব হয়নি। বর্ষা কালে উপর্যোপরি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো চাষীর আকাংখিত ফসল। আর শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে চাষই করা গেল না, বোরো, ইরি ইত্যাদি উন্নত মানের ধান।

এই অবস্থা মোকাবেলার জন্য কৃষি মন্ত্রনালয়ের তরফ থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সহযোগীতায় যে প্রসংশনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু সমস্যাটি এতই ব্যাপক যে এ পর্যন্ত সারা দেশের অর্থনীতিতে এই প্রশংসনীয় কার্যক্রমের অবদান অত্যন্ত সীমিত।

www.pathagar.com

দেশকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার যে সব প্রতিশ্রুতি অতীতে দেয়া হয়েছে, এবং যে সব প্রতিশ্রুতি একের পর এক বিফল হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও বিফল হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে, সেই সব প্রতিশ্রুতি সফল করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বর্তমানে দেশব্যাপী আবাদের অধীন যে ২,০৮,০১,০০০ একর ভূমি রয়েছে সেই ভূমি থেকে বছরে কমপক্ষে একটি ফসল পাওয়া নিশ্চিত করা। এ কথার অর্থ এই নয় যে আবাদাধীন উপরোক্ত ২,০৮,০১,০০০ একর সাকুল্য ভূমি থেকে বছরে একটি ফসল পেয়ে গেলেই দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তা অবশ্যই হবে না। কিন্তু অন্তত একটি ফসলের নিশ্চয়তা বাস্তবায়ন করতে পারলে একদিকে দেশের কোন এলাকায়ই সম্পূর্ণ রূপে খাদ্য শস্য উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে হাহাকারে নিপতিত হবে না; অন্য দিকে আবাদাধীন সম্পূর্ণ ভূমির অন্তত একটি নিশ্চিত ফসল দেশের সার্বিক খাদ্যের চাহিদার এক বৃহৎ অংশ মেটাতে সক্ষম হবে।

তার সাথে সাথে সম্পূর্ণ আবাদাধীন ২,০৮,০১,০০০ একর ভূমিতে দ্বিতীয় আর একটি ফসল লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। অঞ্চল বিশেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই হোক, আর কীট পতঙ্গের আক্রমণেই হোক, দ্বিতীয় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হলেও সারা দেশের সর্বত্র তো আর দ্বিতীয় ফসল একই সাথে ব্যর্থ হয়ে যাবে না। প্রকৃতির এত বড় নিষ্ঠুরতা আজ পর্যন্ত কোন দেশেই পরিলক্ষিত হয়নি, এবং হবে না বলেই আমরা আশায় বুক ভরে এগিয়ে যাব।

এতোদিন পর্যন্ত বর্ষাকালীন ফসলটাকে, অর্থাৎ আমন, আউশ, পাট, ইত্যাদিকেই প্রধান ফসল হিসাবে গণ্য করা হতো। অর্থাৎ, বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে যে চাষবাদের মৌসুম, সেটাকেই কৃষির প্রধান মৌসুম হিসাবে গণ্য করা হতো। আর শুকনা মৌসুম, যেটা আশ্বিন কার্তিক মাস থেকে শুরু হয়, এই মৌসুমটাকে কৃষির দ্বিতীয় মৌসুম হিসাবে গণ্যকরা হতো। কারণ শুকনা মৌসুমে পানির অভাবে আবাদযোগ্য ভূমির এক বৃহৎ অংশেই চাষাবাদ করা যেতো না।

কৃষির প্রধান মৌসুম, অর্থাৎ বর্ষাকাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মৌসুম। এই বর্ষাকাল, যেটা এখনো আমাদের দেশে কৃষির প্রধান মৌসুম, এই সময়টাতেই কাল বৈশাখী, ঘূর্ণি ঝড়, শিলা বৃষ্টি, বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছাস, টর্নেডো প্রতিবছরই দেশের কোন না কোন এলাকায় মারাত্মক আঘাত হানে। প্রায়শই সেই মারাত্মক আঘাত উপর্যোপরি আসে। পক্ষান্তরে শুকনা মৌসুম, যা আশ্বিন মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৭ মাস কাল স্থায়ী থাকে, এই সময়টা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মৌসুম নয়।

এই সুদীর্ঘ সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ অত্যন্ত বিরল, এবং দুর্যোগ আসলেও এর ব্যাপ্তি ও তীব্রতা তেমন মারাত্মক হয় না, যতটা হয় বর্ষা মৌসুমে।

এই সব উপলব্ধি থেকেই দেশের কৃষক কুল এখন আর কৃষির প্রধান মৌসুমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে শুকনা মৌসুমে যেখানে যেটা সম্ভব সেই খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। যেখানেই পানি পাওয়া যায়, সেখানেই চাষ করছেন ইরি, বোরো জাতীয় বিভিন্ন প্রকার ধান, আর অন্যান্য সম্ভাব্য জায়গায় গম, কাউন, চীনা, আলু, টমেটো, ডাল, তরমুজ, বাঙ্গি, খিরা ও বহু প্রকারের সবজি।

www.pathagar.com

কিন্তু বর্ষাকালে, অর্থাৎ প্রচলিত প্রধান কৃষি মৌসুমে যে পরিমান ভূমি চাষ করা হয়, শুকনা মৌসুমে তার এক ক্ষুদ্রাংশের বেশী হয় না। কারণ অবশ্যই বোধগম্য। কারণটি হলো, শুকনা মৌসুমে সেচ ব্যবস্থার অভাবে যথেষ্ট পানি পাওয়া যায় না। আর যথেষ্ট পানি না হলে, ধানের চাষ তো সম্ভবই নয়।

এখন সমস্যাটা হচ্ছে, বর্ষা মৌসুমে ফসলের প্রবল শত্রু কালবৈশাখী, ঘুর্নিঝড়, প্লাবন, বন্যা, জলোচ্ছাস, শিলা বৃষ্টি ইত্যাদি; আর শুকনা মৌসুমে ঐ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই কিন্তু পানির অভাব। তবে স্মরণ রাখতে হবে বর্ষা মৌসুমে চাষাবাদ করেও ফসল ঘরে তোলার অনিশ্চয়তা রয়েছে। অন্যদিকে শুকনা মৌসুমে যেটুকু চাষাবাদ করা যায় সে টুকুর ফসল ঘরে তোলার অনিশ্চয়তা অনেক কম। অর্থাৎ একদিকে চরম অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে তুলনা মূলক নিশ্চয়তা, এই দুটোর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে মানুষ স্বভাবতই নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করে, অনিশ্চয়তা স্বত্বেও বর্ষাকালীন চাষাবাদের গুরুত্ব কমানোর প্রশ্নই উঠে না, কিন্তু যেহেতু শুকনা মৌসুমে কেবল ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্য শস্যই নয়, বহু প্রকারের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করা যায়, এবং সুদীর্ঘ শুকনা মৌসুমে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায়, সে জন্য বর্ষা মৌসুমে একখন্ড ভূমি থেকে মূল্যের হিসাবে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব, শুকনা মৌসুমে তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করা সম্ভব।

এই সব গভীর ভাবে বিবেচনা করে আমাদের সুনিদিষ্ট অভিমত, আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত আবাদ যোগ্য সকল ভূমিতে বর্ষা মৌসুম ও শুকনা মৌসুম উভয় মৌসুমেই চাষাবাদের চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু শুকনা মৌসুমের চাষাবাদ নিরাপদ, এবং শুকনা মৌসুমে মানুষের কর্মক্ষমতাও থাকে বেশী, এবং যেহেতু শুকনা মৌসুমে চাষাবাদ সম্প্রসারণের প্রচুর সম্ভাবনা রয়ে গেছে, সেই হেতু শুকনা মৌসুমকেই কৃষির প্রথম ও প্রধান মৌসুম হিসাবে গণ্য করা উচিত। তাই শুকনা মৌসুম হবে কৃষির প্রধান মৌসুম, আর বর্ষা মৌসুম হবে কৃষির দ্বিতীয় মৌসুম। কৃষির প্রধান মৌসুমে বেশী পরিশ্রম সম্ভব, বেশী সম্প্রসারণ সম্ভব, তাই কৃষির প্রধান মৌসুম, অর্থাৎ শুকনা মৌসুমের প্রতি সরকার ও জনগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

১১·৩ঃ কৃষির প্রধান মৌসুম

পূর্ববর্তি আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কৃষির দুইটি মৌসুম, অর্থাৎ প্রচলিত প্রধান মৌসুমে বর্ষাকালীন চাষাবাদ এবং প্রচলিত দ্বিতীয় মৌসুমে অর্থাৎ শুকনা মৌসুমের চাষাবাদ, এই দুটি মৌসুমেই দেশের আবাদযোগ্য ও আবাদাধীন সম্পূর্ণ ভূমিকে উৎপাদনের আওতায় আনতে হবে। আমরা আরো বলেছি যে শুকনা মৌসুমকেই কৃষির প্রথম বা প্রধান মৌসুম হিসাবে গণ্য করতে হবে। এবং কৃষি সম্প্রসারণের, তথা খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারী বেসরকারী সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে, কৃষির প্রধান মৌসুম, অর্থাৎ শুকনা মৌসুমে কৃষি সম্প্রসারণের উপর।

শুকনা মৌসুমকে কৃষির প্রধান মৌসুম হিসাবে গণ্য করার এবং গুরুত্ব দেয়ার অসংখ্য যুক্তির মধ্যে নিম্নে বর্ণিত যুক্তিগুলো বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ–

১১·৩·০১ঃ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল সনাতনী পন্থায় বর্ষাকালীন চাষাবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, যেহেতু আবহাওয়ার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই।

১১·৩·০২ঃ বর্ষাকালীন চাষাবাদ করতে প্রায়শই ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত ইত্যাদির জন্য চাষীদের ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয় এবং কাদা পানির মধ্যে চলাচলে শারীরিক ও মানসিক কষ্টও হয় যথেষ্ট।

১১·৩·০৩ঃ অত্যধিক ঝড় বৃষ্টির জন্য প্রায়শই কৃষি কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময় প্রবল বর্ষণের ও শিলা বৃষ্টির সময় মাঠের মধ্যে চাষীকে নিজের নিরাপত্তা ও পশুর নিরাপত্তার জন্য ছুটাছুটি করতে হয়। মানুষকে একটু উঁচু আইলের পাশে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হয়।

১১·৩·০৪ঃ কাদা পানির মধ্যে চাষের গরু মহিষ ও লাঙ্গল জোয়াল ইত্যাদি নিয়ে একটু দূরের মাঠে যাওয়া আসা ও রীতিমত কষ্টকর।

১১·৩·০৫ঃ বর্ষাকালীন চাষাবাদ আরম্ভেই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। বৃষ্টিপাত শুরু হতে বিলম্ব হলে চাষাবাদও বিলম্বিত হয়। অতি বৃষ্টিতে মাঠে হাটু পানি হয়ে গেলে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যায়।

১১·৩·০৬ঃ বীজ বপনের পর, চারা গজানোর পর বা চারা রোপণের পর হঠাৎ করে বন্যা এসে সব বিনষ্ট করে দেয়ার ঘটনা প্রতি বছরই দুই একবার ঘটে যায়, যার জন্য বহু স্থলে একবারের প্রচেষ্টায় ধানের চারা পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেগে ওঠার সংগ্রামে পরাস্ত হয়। এবং চাষীকে বার বার একই জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হয়। ইহা ব্যয় বহুল ও সময় বিনষ্টকারী।

১১·৩·০৭ঃ বর্ষাকালীন কৃষি কাজ, বর্ষণ বন্যার সাথে মানুষের এক কঠিন প্রতিযোগিতা; হার জিতের প্রশ্ন লেগেই থাকে।

www.pathagar.com

১১·৩·০৮ঃ সারা বর্ষাকাল ধরে সংগ্রাম করে চাষ করার পরও মৌসুম শেষে সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে ভন্ডুল হয়ে যাওয়া প্রতিটি বছরে কোন কোন স্থানে ঘটেই যাচ্ছে।

১১·৩·০৯ঃ শুকনা মৌসুমে চাষাবাদ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বর্ষার পানি যখন ধীরে ধীরে কমতে থাকে তখন উচু ভূমি থেকে শুরু করে নিচু ভূমির চাষাবাদ শুরু হতে থাকে। শুকনা মৌসুমে চাষাবাদের জন্য চলা ফেরা যেমন সহজ, তেমনি অনুকুল আবহাওয়ার জন্য নিরাপদে নির্বিঘ্নে কাজও করা যায় অনেক বেশী।

১১·৩·১০ঃ বর্ষাকালের চাষাবাদ কেবল মাত্র ধান, পাট ইত্যাদির মধ্যে সীমিত থাকে, কিন্তু শুকনা মৌসুমে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, অত্যাবশ্যকীয় তৈলবীজ, নানা প্রকার শস্য, উচ্চ ফলনশীল সবজি এবং মৌসুমী ফল এর মধ্যে যেখানে যেটা উৎপাদন বেশী হয় সেখানেই সেটা লাগান যায়।

১১·৩·১১ঃ বর্ষাকালের ধান চাষ আমন–আউস ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত থাকে, যেগুলোর ফলনের চেয়ে শুকনা মৌসুমের বিভিন্ন জাতের উন্নত মানের (ইরি, বোরো) অনেক বেশী ফলনশীল, তাই বেশী লাভজনক।

১১·৩·১২ঃ শুকনা মৌসুমে সারা দেশে সম্পূর্ণ আবাদযোগ্য ভূমিই চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বর্ষাকালে মোট চাষাবাদযোগ্য ভূমির এক বৃহৎ অংশ, যেমন হাওর ও চরাঞ্চল গভীর পানির নিচে চলে যাওয়ায় চাষাবাদ করাই যায় না। অর্থাৎ শুকনা মৌসুমে আবাদ যোগ্য যে কোন ভূমিই চাষ করা সম্ভব, কিন্তু বর্ষাকালে এই সুযোগ সীমিত।

১১·৩·১৩ঃ বর্ষা মৌসুমের বড় সমস্যা হলো জলাধিক্যতা, আর শুকনা মৌসুমের বড় সমস্যা হলো জলাভাব। এই দুই পরস্পর বিরোধী সমস্যার মধ্যে তুলনামূলকভাবে জলাধিক্যতা সমাস্যার চেয়ে জলাভাব সমস্যার সমাধান অনেক সহজ।

১১·৩·১৪ঃ সার্বিক ভাবে বর্ষা মৌসুমের চাষাবাদের চেয়ে শুকনা মৌসুমের চাষাবাদ তুলনামূলক ভাবে অনেক নিরাপদ এবং অনেক বেশী সম্ভাবনাময়।

১১·৩·১৫ঃ এই সব কারণেই আমি শুকনা মৌসুমকে প্রথম এবং প্রধান কৃষি মৌসুম হিসাবে গণ্য করতে সমগ্র জাতির কাছে সনির্বন্ধ আবেদন করছি। শুকনা মৌসুমের চাষাবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে পরবর্তিতে আলোচনা করবো। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলবো যে সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রচেষ্টা কেবল অব্যাহতই নয়, আরো জোরদার করতে হবে। এবং বর্ষাকালে চাষাবাদের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করার কলা কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

১১·৩·১৬ঃ কৌশলগত দিক দিয়ে অবস্থাটা দাঁড়াবে এই, চাষের প্রধান মৌসুম, অর্থাৎ শুকনা মৌসুমকে করতে হবে বহুমুখী চাষাবাদের মৌসুম। এই মৌসুম, যার মধ্যে বাংলাদেশী ঋতু শরৎ কালের আশ্বিন মাস সহ হেমন্ত শীত ও বসন্ত,

www.pathagar.com

এই সাড়ে তিনটি ঋতু অন্তর্ভুক্ত। সর্বোৎকৃষ্ট এই সাড়ে তিনটি ঋতুর ৭ মাস বাংলাদেশের জন্য গরম আদ্রতা কম থাকায় বৃষ্টি বাদল, ঝড় তুফান, বন্যা প্লাবন মুক্ত এই সাতটি মাস। এই সময় মানুষের কর্ম ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই এই মৌসুমটাকেই করে তুলতে হবে কর্মচাঞ্চল্যের মৌসুম, জীবন সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের মৌসুম। বাকী ৫ মাস, অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ৪ মাস এবং শরৎকালের ভাদ্রমাস কৃষির দ্বিতীয় মৌসুম। এই মৌসুমে সনাতনী পন্থায় ও কৃষকগণের চিরাচরিত অভ্যাসানুযায়ী বৃষ্টি বাদল ও প্রতিকুল আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে থাকবে প্রচলিত নিয়মের চাষাবাদ। এই মৌসুম মূলতঃ আমন জাতীয় ধান এবং বিভিন্ন জাতীয় পাট, যেগুলো গভীর পানির মধ্যেও টিকে থাকতে পারে, এগুলো ছাড়াও যেখানে যা উৎপাদন হয়ে আসছে, সেখানে সেটা উৎপাদন চালিয়ে যাওয়াটাই উচিত হবে। কৃষির দ্বিতীয় মৌসুম, অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমের চাষাবাদের, ফলাফলের অনিশ্চয়তা স্বত্ত্বেও অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে চাষাবাদের এই সনাতন পদ্ধতি। আমাদের প্রস্তাবিত চাষাবাদের পরিবর্তিত মৌসুম গৃহীত হয়ে গেলে কৃষককে আর বর্ষাকালীন কৃষির উপর অসহায় ভাবে নির্ভরশীল থাকতে হবে না। তাদের আসল সম্বল হবে, তুলনামূলক ভাবে অনেক নিরাপদ, শুষ্ক মৌসুমের চাষাবাদ; আমরা যার নাম দিয়েছি কৃষির প্রথম ও প্রধান মৌসুম; যে মৌসুমের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর এবং বিভিন্নমূখী চাষাবাদের সুযোগও অনেক বেশী।

www.pathagar.com

১১·৪ঃ প্রধান মৌসুমের সুযোগ ও সম্ভাবনা

কৃষির প্রধান মৌসুম, অর্থাৎ শুকনা মৌসুম, যার শুরু আশ্বিন মাস থেকে এবং শেষ চৈত্র মাসে, অর্থাৎ সুদীর্ঘ সাত মাস, এই সময়টা কৃষি কাজের জন্য তুলনামূলক ভাবে অনেক নিরাপদ; এ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করার কারণ নেই। এই মৌসুমটার সম্ভাবনা প্রচুর। এই মৌসুমের সুযোগ ও সম্ভাবনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করছিঃ–

১১·৪·০১ঃ শুকনা মৌসুমের প্রারম্ভ থেকেই আবহাওয়ার আর্দ্রতা কমতে থাকে, যার জন্য মানুষের আলস্য জড়তা কমে যায়, কর্মশক্তি বেড়ে যায়।

১১·৪·০২ঃ শুকনা মৌসুমে মাঠের মধ্য দিয়ে সরাসরি চলাচল সহজ হয়ে যায়। পথের দূরত্বও কমে যায়, তাই সময় অনেক বেঁচে যায়। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সময়ের সদ্ব্যবহার সঠিক ভাবে হয়।

১১·৪·০৩ঃ শুকনা মৌসুমে কৃষক দুপুর বেলার খাবার সাথে নিয়ে নিতে পারেন, এবং দুপুরে খাওয়ার পর মাঠেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে কৃষকের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও মাঠে খাবার পৌঁছে দিতে পারে, তাঁর কাজে সহযোগীতা করতে পারে, যা বর্ষা মৌসুমে কঠিন।

১১·৪·০৪ঃ শুকনা মৌসুমে কৃষক ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে পারেন, যা বর্ষা কালের গরম ও আর্দ্রতায় কোন মতেই সম্ভব নয়।

১১·৪·০৫ঃ শুকনা মৌসুমের চাষাবাদ বহুমুখী, বর্ষা মৌসুমের মত এক ঘেয়ে কাজ নয়, যার জন্য কৃষক কাজের মধ্যে আনন্দ আগ্রহ পাবেন বেশী।

১১·৪·০৬ঃ শুকনা মৌসুমে ইরি বোরো জাতীয় উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, বাজরা, কাউন, চীনা, তিল, সরিষা, তিসি, চিনাবাদাম ইত্যাদি লাভ জনক শস্য উৎপাদনের নিরাপদ সম্ভাবনা প্রচুর।

১১·৪·০৭ঃ শুকনা মৌসুমে অত্যন্ত লাভজনক সব্জি, যেমন গোল আলু, লাল আলু, মিষ্টি আলু, টমেটো, মুলা, শালগম, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সীম, লাউ প্রচুর পরিমাণে ফলানো যায়।

১১·৪·০৮ঃ শুকনা মৌসুমে অত্যাবশ্যকীয় আমিষ খাদ্য, যেমন মশুর, মুগ, চানাবুট, মটরশুটি, কলাই, ছোলা, অড়হর, সীম ইত্যাদি ডাল জাতীয় খাদ্য দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলানো সম্ভব।

১১·৪·০৯ঃ শুকনা মৌসুমে মাঠের ফল, যেমন তরমুজ, বাঙ্গি, খিরা, ফুটি ইত্যাদি ফলানোর সুযোগ অপরিসীম।

১১·৪·১০ঃ শুকনা মৌসুমে বাড়ীর আনাচে কানাচে থেকে শুরু করে সুদুর মাঠ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে শাক জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য ফলানো সহজ।

১১·৪·১১ঃ শুকনা মৌসুমে দেশের আবাদ যোগ্য সম্পূর্ণ ভূমিই চাষের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বর্ষাকালে অনেক ভূমিই পানির নিচে।

www.pathagar.com

১১·৪·১২ঃ শুকনা মৌসুমে হাওর বাঁওড়ের, সাগর ও নদ নদীর চরাঞ্চলের বিশাল ভূমি ভেসে ওঠে, যেখানে সহজে, এমনকি বিনা চাষেও বীজ লাগালে উত্তম ফলন পাওয়া যায়, যা বর্ষাকালে অসম্ভব। হাওর বাঁওড়ও চরাঞ্চলের এই বিশাল ভূমি শুকনা মৌসুমে চাষ করা অত্যন্ত সহজ এবং ফলন হয় অনেক বেশী।

১১·৪·১৩ঃ শুকনা মৌসুমে সার প্রয়োগ সহজ এবং সার জমিতে ভেসে অপচয় হয় না।

১১·৪·১৪ঃ শুকনা মৌসুমে জমিতে প্রয়োগ করা কীট নাশক পুরোপুরি কাজে লাগে। পানির সাথে ভেসে পার্শ্ববর্তী খাল, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে মিশে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে না।

১১·৪·১৫ঃ ফসল উৎপাদনের জন্য পানির মত সূর্যালোকও অত্যাবশ্যকীয়। শুকনা মৌসুমে সেচের মাধ্যমে আবশ্যকীয় পানি ও প্রকৃতি প্রদত্ত পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রচুর শস্য উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

১১·৪·১৬ঃ শুকনা মৌসুম, স্বাস্থ্য রক্ষা থেকে শুরু করে যোগাযোগ সহ সর্বস্তরে, বর্ষা মৌসুমের চেয়ে নিরাপত্তা মূলক বিধায় সকল বয়সের এবং সকল পেশার লোকেরাই কমবেশী ফসলের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

১১·৪·১৭ঃ শুকনা মৌসুমে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কারণে ভিন্ন পেশার লোকেরাও তাদের অবসর সময় স্ব-স্ব কৃষি ক্ষেতে কাজ করতে পারেন।

১১·৪·১৮ঃ শুকনা মৌসুমে ফসল উপযোগী জমির উপযুক্ততা রক্ষা করা যায় হেতু এক ফসলের সাথে অন্য ফসল উৎপাদনও সম্ভব, যেমন ধান ক্ষেতের আইলে ডালের চাষ, বিভিন্ন প্রকার শাকের চাষ ইত্যাদি।

১১·৪·১৯ঃ শুকনা মৌসুমে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ বিধায় উপজেলা কিংবা জেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা কৃষি বিশেষজ্ঞসহ ফসলের মাঠ পরিদর্শন করা সম্ভব এবং কৃষকদের ফসলের পরিচর্যার জন্যে যথাযথ পরামর্শ দান করতে সক্ষম। এর ফলে যত্নের অভাবে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম।

১১·৪·২০ঃ শুকনা মৌসুমের চাষাবাদ মূলত সেচ ভিত্তিক। ফলে একই মাঠের কৃষকদের সম্মিলিত ভাবে একই ফসলের চাষ করতে হয়। এই জন্য কৃষকদের মধ্যে কার ফসল বেশী ভাল এই প্রতিযোগীতার মনোভাব গড়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে স্বভাবতই উৎপাদন আশাতীত বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

১১·৫ ঃ শুকনা মৌসুমে চাষাবাদের সমস্যা

শুকনা মৌসুমে চাষাবাদের সমস্যা মাত্র একটি। সেই সমস্যাটি হলো অত্যাবশ্যকীয় সেচ বা পানি সরবরাহ। এই সমস্যা অবশ্যই কঠিন; এর সমাধান ও কঠিন। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে সমস্যা অনেক বেশী ও সমাধান ততোধিক কঠিন। বর্ষা মৌসুমের বহু সমস্যার মধ্যে একমাত্র জলাধিক্য সমস্যা সমাধানই সকল প্রচেষ্টাকে এ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস, কাল বৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি এই সবই বর্ষা মৌসুমের সমস্যা। এর যে কোন একটি সমস্যার তুলনায় শুকনা মৌসুমের একমাত্র সমস্যা সমাধান অবশ্যই সহজতর।

বাংলাদেশ এমন একটি আজব দেশ, যে দেশে বছরের পাঁচ মাস (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস) অতিবৃষ্টির বর্ষাকাল। আর বাকী সাত মাস (আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র মাস) অনাবৃষ্টির শুকনা কাল। বর্ষাকালে পানি আসে মানুষের শত্রু রূপে; অতি বৃষ্টির দাপটে কাজ কর্ম ব্যাহত হয়ে যায়, ডুবে যায় চাষের ভূমি, পানির নীচে পচে যায় বহু কষ্টে ফলানো ফসল; এমনকি ঘরবাড়ী পর্যন্ত ডুবিয়ে মানুষকে অসহায় করে অর্ধাহারে অনাহারে ঘরে বসিয়ে রাখে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। জলোচ্ছ্বাসে দেশের দক্ষিণাঞ্চল কিছু দিন পর পর আক্রান্ত হয় নির্মম ভাবে। পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শত শত, হাজার হাজার মানুষ, গবাদী পশু, মাঠের ফসল। বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাসের সময় মনে হয় পানির মতো এতবড় শত্রু মানুষের আর নেই।

মাস কয়েক পরই যখন শুকনা মৌসুম শুরু হয় তখন মানুষ ছুটাছুটি শুরু করে দ্রুত পলায়নরত পানি নামক যে শত্রু তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেই পানিকে আটকে রাখার জন্যে। কেননা শুকনা কালে পানির অভাবে মানুষ পানি কর্তৃক ধ্বংসকৃত তার অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করতে পারেনা। তখন যেখানেই পানি, সেখানেই আবার দ্বিমুখী প্রতিযোগিতা। কৃষকরা চান পানি সংরক্ষণ করে পানি সংলগ্ন এলাকায় চাষাবাদ করতে, আর মৎস্যজীবিরা, বিশেষ করে মৎস্যের মহাজনরা, চান পানি ঠেলে দিয়ে খাল শুকিয়ে মাছ ধরতে। এই দ্বিমুখী স্বার্থের সংঘাত চলে আসছে বহুকাল থেকে। এতে অসংখ্য মামলা মোকদ্দমা, ঝগড়া হাঙ্গামা খুনাখুনি লেগেই থাকে।

বছরের পাঁচ মাস অতি বৃষ্টি, জলাধিক্যতা; আর বছরের সাত মাস অনাবৃষ্টি জলাভাব এই দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থা হলো বাংলাদেশের চাষাবাদের বিরাট সমস্যা।

জলাধিক্য সমস্যার সমাধানের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ নামক বিভিন্ন মুখী বিরাট বিরাট প্রকল্প প্রস্তুত হয়েছে; কিছু কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িতও হয়েছে; এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তাও প্রচুর ভাবে আসছে। কিন্তু জলাধিক্যতা, অর্থাৎ বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ যে কতো কঠিন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। গণচীন হাজার বছর সংগ্রাম করে চীনের দুঃখ বলে কথিত হোয়াং হো নদীকে বশে আনতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেনেসি ভেলী বহু

www.pathagar.com

বছর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করে সাফল্য জনক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নেদারল্যান্ডস্ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করে জলোচ্ছ্বাস থেকে গোটা দেশটিকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঐসব সাফল্যের পিছনে রয়েছে শত শত বছরের ত্যাগ তিতিক্ষা ও অধ্যবসায়। আজ বিশ্বের বহুদেশে এই জলাধিক্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। তাই আমাদের দেশের জলাধিক্যতার, অর্থাৎ বন্যা প্লাবন জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহসাই বিজয় অর্জন আশা করা যায় না। এটা একটা দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী।

কিন্তু আমরা এখানে যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি, সেটা হলো শুকনা মৌসুমে জলাভাব, পানির তীব্র অভাব, যার জন্য দেশের সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমি আমাদের হাতের নাগালে এসে গেলেও কেবলমাত্র পানির অভাবে তাতে আমাদের কাংখিত ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ হলেও, এই সমস্যার সমাধান হবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ হলে বর্ষাকালের চাষাবাদের নিরাপত্তা কিছুটা বাড়বে। তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেলেও বর্ষাকালে দেশের নিম্ন এলাকা, বিশেষ করে বিশাল চরাঞ্চল ও হাওর বাঁওড়ের বিরাট নিম্ন ভূমি চাষাবাদে আনা সম্ভব হবে না; কারণ এগুলো তখন অথই পানির নীচে। তা ছাড়াও বর্ষাকালের চাষাবাদে অন্যান্য শত্রু, –শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টর্ণেডো ইত্যাদি থেকেই যাবে। অর্থাৎ তখনো বর্ষাকালের চাষাবাদ সম্পূর্ণ নিরাপদ হবেনা।

অন্যদিকে শুকনা মৌসুমে একমাত্র পানির অভাব ছাড়া সারাটি দেশে সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমিতে অজস্র ফসল ফলানোর আর কোন অসুবিধাই নেই। এই অভাবটা দূর করতে পারলে শুকনা মৌসুমের সাত মাসে দেশে যা খাদ্যশস্য, মৌসুমী ফলমূলও শাক সব্জি, তৈলবীজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে, তাতেই দেশটাকে অবশ্যই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে নেওয়া যাবে; আর বর্ষা মৌসুমে যা খাদ্যশস্য ঘরে উঠানো সম্ভব হবে, তা হবে বাড়তি খাদ্যশস্য।

এখন কথা হলো, শুকনা মৌসুমে সারাটি দেশে, যেখানেই আবাদযোগ্য ভূমি আছে, সেখানেই সেচ ব্যবস্থা করা কত দূর সম্ভব; এবং কোন পন্থায় সেটা সম্ভব। পুঁথিগত বিদ্যা থেকে নয়, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমার সুদৃঢ় অভিমত গভীর নলকূপ দিয়ে সেচ ব্যবস্থা করা একদিকে অত্যন্ত ব্যয় বহুল, আর অন্যদিকে গভীর নলকূপের রক্ষণাবেক্ষণের মনোবৃত্তি এবং কলাকৌশল দুটিরই অভাব। এই জন্য গভীর নলকূপের এক বৃহৎ অংশ অকেজো হয়ে পড়ে থাকে বছরের পর বছর। অর্থাৎ গভীর নলকূপের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। তা ছাড়াও ডিজেল চালিত নলকূপের জন্য ব্যয় হয় অত্যন্ত বেশী, আর বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সরবরাহের লুকোচুরি, আর অধিকাংশ গভীর নলকূপের বিদ্যুৎ নাগালে আসতে বহুবছর অপেক্ষা করতে হবে। সর্বোপরি অত্যধিক গভীর কূল স্থাপন করলে ভূ–গর্ভের পানির স্তর নিঃশেষ হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারানোর আশংকা একেবারে ফেলে দেয়া যায়না। এখনি অনেক স্থানে শুকনোর সময় গভীর নলকূপে পানির অভাব শুরু হয়ে গেছে।

আমার বিশ্বাস, গভীর নলকূপ কেবলমাত্র সেই সব আবাদযোগ্য ভূমিতে স্থাপন অব্যাহত থাকতে পারে, যে সব ভূমি সারা বছরই শুকনা থাকে, বর্ষায় পানিতে ডুবে

www.pathagar.com

যায়না। অর্থাৎ বারো মাসই গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করে তিন বা চারটি ফসল ফলানো সম্ভব হয়।

আমার সুস্পষ্ট অভিমত, যে সব ভূমি বছরে অন্তত কিছু দিনের জন্য পানির নীচে চলে যায় সেই সব ভূমিতে গভীর নলকূপ স্থাপনের যুক্তি নেই। এই প্রেক্ষিতে আমি সুপারিশ করছি, সারা দেশে গভীর নলকূপ স্থাপনের উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করে কেবল সেই সব এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন সীমাবদ্ধ করা হোক। গভীর নলকূপ প্রকল্পের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, অর্থাৎ বিকল হওয়া মাত্র মেরামতের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয়। এটা এখনো হচ্ছে না।

শ্যালো বা অগভীর নলকূপের সম্ভাবনা আরো বেশী সীমিত; কারণ অধিকাংশ স্থানেই অগভীর নলকূপ ভূগর্ভের পানির স্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌছায় না।

কিন্তু লো-লিফ্‌ট পাম্প দিয়ে সেচ ব্যবস্থা অনেক সহজ, ব্যয় কম এবং এই পাম্প সহজে বহনযোগ্য বিধায় স্থানান্তরিত করে অনেকবেশী ভূমিতে পানি সরবরাহ করতে পারে। তবে লো-লিফ্‌ট পাম্প সহজলভ্য পানির উপর নির্ভরশীল। তাই পানির সহজ লভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করছি।

পানি সহজলভ্য হয়ে গেলে লো-লিফ্‌ট পাম্প ছাড়াও চাষীরা বিভিন্ন দেশী পদ্ধতিতে স্বহস্তে পানি উত্তোলন করে নিজ নিজ মাঠে নিয়ে যেতে পারে।

মোট কথা, শুকনা মৌসুমে পানির সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করতে পারলে লো-লিফ্‌ট পাম্প দিয়ে হোক, বা হস্ত চালিত বিভিন্ন রকম পন্থায়ই হোক, মানুষ বেশ কিছু দূর পর্যন্ত পানি নিয়ে সেচ কাজ সমাধা করতে পারে; এখনো অনেক অনেক স্থানে করছে।

আমার বিশ্বাস শুকনা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে পানি সংরক্ষণ করা কঠিন কাজ নয়। এখন আমরা পানি সংরক্ষণে মনোনিবেশ করছি।

www.pathagar.com

১১৬ ঃ শুকনা মৌসুমে পানি সংরক্ষণ

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে বর্ষা মৌসুমের প্রায় পাঁচ মাস দেশের আবাদযোগ্য ভূমির এক বিরাট অংশ, যেমন চরাঞ্চল, হাওর বাঁওড় ইত্যাদি গভীর পানিতে ডুবে যায় যে সেখানে চাষাবাদ সম্ভব হয় না; আর শুকনা মৌসুমে এই সব ভূমি অথই পানির নীচ থেকে জেগে ওঠে এবং পুরা শুকনা মৌসুমের প্রায় সাত মাস এই সম্পূর্ণ এলাকায় চাষাবাদ সম্ভব হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র শুকনা মৌসুমেই দেশের সম্পূর্ণ আবাদযোগ্য ভূমি চাষাবাদের জন্য অপেক্ষমান থাকে। আমরা আরো দেখেছি, বর্ষাকালীন চাষাবাদের অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক অসুবিধা; কিন্তু শুকনা মৌসুমে চাষাবাদে একটি মাত্র সমস্যা; সেটি হলো সেচ ব্যবস্থা। আমরা একথাও বলেছি যে সেচ ব্যবস্থায় গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে; তবে সেটা সারা দেশের সকল আবাদযোগ্য ভূমিতে সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভূ-গর্ভের পানি দিয়ে চাষাবাদ সম্ভব সীমিত এলাকায়। আমরা আরো বলেছি, যে জমির অদূরে পানি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে সেই পানি চাষীরা বিভিন্ন পন্থায় তাদের জমিতে নিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে।

এখন প্রশ্ন হলো, সারা দেশের সর্বত্র চাষাবাদযোগ্য জমির কাছাকাছি পানি সংরক্ষণের কি ব্যবস্থা করা যায়। ব্যবস্থাটা এমন অভিনব কিছু নয়, তেমন কঠিনও নয়। কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে সারা দেশব্যাপী পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে কোন কারণেই হোক, গুরুত্ব লাভ করেনি। এই ব্যবস্থার মূল মন্ত্র হলো বর্ষাকালে অত্যধিক পানি যে ক্ষতি সাধন করে, সেই পানিরই একটা অংশ যেখানেই সম্ভব সেখানেই সংরক্ষণ করে শুকনা মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করা। এই প্রস্তাবের মধ্যে অভিনবত্ব না থাকলেও এর মধ্যে নিহিত আছে প্রচুর সম্ভাবনা। আমাদের দেশের লোক পানি সংরক্ষণে অভ্যস্ত নন। বর্ষার শেষদিকে মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠেন, কতক্ষণে পানি সরে যাবে। দু'চারটি মাছ ধরার আশায় এক একটি খাল বা ছোট ছোট জলাশয় বহু কষ্টে তারা শুকিয়ে নেয়, পানি ভাটির দিকে ঠেলে দিয়ে। এই তো সেদিন স্বচক্ষে দেখে এলাম সিলেটের আটগ্রাম-জাকিগঞ্জ রাস্তার দুপাশে, বিশেষ করে রতনগঞ্জ থেকে লামারগ্রাম পর্যন্ত বিরাট মাঠে, চমৎকার বোরো ধানের সবুজ দৃশ্য। আনন্দে প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম রাস্তার দুপাশের খাল পানি শূন্য। পানি শুকিয়ে মাছ ধরার চিহ্ন বিদ্যমান। ভাবলাম সম্মুখের শৌলজুরি ও তালগাঙ্গ থেকে পানি আনতে হবে এই বিরাট বোরো ক্ষেতকে বাঁচাতে। কিন্তু সম্মুখে এগিয়ে দেখি শৌলজুরি ও তালগাঙ্গ মাছ শিকারীদের দৌরাত্মে পানি শূন্য। সেই রাতেই মিলিত হই জাকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কৃষি অফিসার, মৎস্য অফিসারের সাথে। তারা প্রায় অবিশ্বাস্য নেত্রে আমার কথা শুনলেন। বললেন পানি শুকিয়ে মাছ ধরা আইনত অপরাধ। সহকারী পুলিশ সুপারও একই কথা বললেন। কিন্তু পানি তো নিঃশেষ। এখন অপরাধীদের পিছনে ছুটলেও তো ঐ বোরো ক্ষেত

www.pathagar.com

রক্ষা করা যাবেনা। তারা অবশ্য কথা দিলেন অনেক দূরের বিল থেকে পানি এনে এই বোরো ক্ষেত রক্ষা করবেন। কিন্তু কাজটা কতো কঠিন হয়ে গেলো।

জনগণকে পানি সংরক্ষণের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত করতে এক দুর্বার প্রচার অভিযানের প্রয়োজন। পানি সংরক্ষণ করে সেটা কয়েক মাস ধরে চাষের ভূমিতে সেচ কার্যে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলে এর সুফল বুঝতে চাষীদের বেশী দিন লাগবেনা। এখন পানি সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থার তালিকা দিচ্ছিঃ–

১১৬·০১ঃ সারা দেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল পুকুরে পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর পার উচুঁ করা এবং পানি বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে। এই সব বদ্ধ পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষও করতে হবে। এই কাজ করার জন্য পুকুরের মালিককে স্বল্প মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরের পানি বিক্রি করার প্রথাও চালু করা যেতে পারে।

১১৬·০২ঃ দেশের সমস্ত মজা পুকুর সংস্কার করে পাড় বেঁধে পানি সংরক্ষণ ও আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিপূর্বে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে মজা পুকুর সংস্কার কর্মসূচী সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এটা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সংস্কারকৃত এই পুকুর থেকে অর্জিত আয়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে হবে। এই সব মজা পুকুরের পাড়সহ রক্ষণাবেক্ষণ লাভজনক করা আদৌ কঠিন নয়। পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং পুকুরপাড়ে ফলের বাগান, এই দুটি প্রক্রিয়ায় এই সব পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ লাভজনক করে তোলা যায়। এই সম্বন্ধে পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবো।

১১·৩·০৩ঃদেশের যেখানে যতো দীঘি আছে, সমস্ত দীঘি পুনঃখনন করে উঁচু পাড় বেধে পানি সংরক্ষণ, মাছ চাষ, ও পুকুর পাড়ে ফলের বাগান প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

১১৬·০৪ঃ প্রত্যেক গ্রামের অভ্যন্তরে, অথবা কাছাকাছি যেসব মজা খাল পড়ে আছে এই সমস্তকে গভীর ভাবে পুনঃখনন করে খালের পাড়কে এমনভাবে বাঁধতে হবে যে এই খালের পাড় চলাচলের পথ হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, আর পাড়ের দু'পাশে স্থায়ী ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে।

১১৬·০৫ঃ প্রত্যেক গ্রাম থেকেই এক দুটি খাল বেরিয়ে গিয়েছে ভাটির দিকে। এগুলো পানি নিষ্কাশনের কাজ করে। এই সব খাল গভীর ভাবে পুনঃখনন করে উঁচু পাড় বেঁধে দিতে হবে এমন ভাবে যাতে ঐ পাড় চলাচলের জন্য ও স্থায়ী ফলগাছ লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এসব খাল বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশন করবে, আর বর্ষা শেষে পানি সংরক্ষণ করবে। এইজন্য বর্ষার শেষ দিকে উপযুক্ত স্থানে পানি আটকাবার জন্য বাঁধ দিতে হবে।

১১৬·০৬ঃ যেখানে গভীর খাল আছে, যেগুলো পুনঃখননের আবশ্যকতা নেই, সেইখানে বর্ষা শেষে পানি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানে মাটির বাঁধ দিতে হবে।

১১৬·০৭ঃ যেসব বিলের পাড় বর্ষায় ডুবে যায়, আর বর্ষা শেষে ভেসে উঠে, সেই সব বিলেও পানি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানে বাঁধ দিতে হবে।

www.pathagar.com

১১৬·০৮ঃ দেশের সকল নদীতে শুকনা মৌসুমে যতদূর সম্ভব পানি আটকাবার সু-পরিকল্পিত ব্যবস্থা করতে হবে।

১১৬·০৯ঃ বোরো চাষের জন্য বেড়িবাঁধ প্রথা অনেক জায়গায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তাই যেখানেই সম্ভব এবং প্রয়োজন সেখানেই মাঠের চারদিকে বেড়িবাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে সেই পানিতে ধান লাগাবার প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব সম্প্রসারণ করতে হবে।

১১৬·১০ঃ উপরোক্ত কর্মসূচীর মধ্যে কেবল নাব্য নদীর, যেগুলো দিয়ে শুকনা মৌসুমেও নৌকা চলাচল করে, এগুলোতে পানি সংরক্ষণ সমস্যা সহজসাধ্য নয়। এইসব নদী থেকে লো-লিফ্‌ট পাম্প দিয়ে যথেষ্ট পানি উঠাবার ব্যবস্থা করার দায়ীত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশল ব্যবহার করে পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সংরক্ষণ ও উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন।

১১৬·১১ঃ এতোসব করার পরও যে সব বিরাট এলাকায় পানি পৌছানো যাবে না সেগুলোতে কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, ইত্যাদি জেলার বিশাল বিশাল হাওরের বিরাট সমতল ভূমি, যেগুলো বর্ষাকালে গভীর পানির নীচে ডুবে থাকে, আর শুকনা মৌসুমের ৬/৭ মাস ভেসে উঠে, এই সব ভূমির অধিকাংশেই পানির অভাবে চাষাবাদ করা যায় না। এইসব ভূমি অতি উর্বর এবং কেবল সেচ ব্যবস্থা করতে পারলে এই সব ভূমিতে প্রচুর পরিমাণ ইরি বোরো ধান ফলানো সম্ভব হবে। এই সব ভূমিতে সেচ ব্যব্যস্থা করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। হাওরের অসংখ্য খাল ও বিলে সারা শুষ্ক মৌসুমেই প্রচুর পানি থেকে যায়। তাই ঐসব মাঠের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট খাল কেটে নদী ও বিলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দিলেই খালের পানি থেকে পাম্প দিয়েই হোক, আর দেশী প্রথায়ই হোক, প্রত্যেক কৃষক নিজ নিজ আবশ্যক মতো পানি সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। যেখানে পানি নেয়া ব্যয় বহুল হয়ে যাবে, সেইসব এলাকায় ধানের পরিবর্তে গম, ডাল, সরিষা ইত্যাদি, যেসব শস্যে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, সেসব শস্যের চাষ করতে হবে।

১১৬·১২ঃ নদ-নদীর চরাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা আরো সহজ। চরের পলি বালু মিশ্রিত মাটির একটু নীচেই পানির স্তর। ছোট ছোট পুকুর কেটে নিলে সেগুলো পানিতে ভর্তি থাকে। সেখান থেকে পাম্প দিয়ে হোক। আর দেশী পন্থায় হোক পানি নিয়ে সেচ ব্যবস্থা করা কঠিন নয়।

www.pathagar.com

১২ ঃ ভূমি বিপ্লব

১২·১ ঃ ভূমিকা

আমি বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের যে দেশে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে সে মানবিক বিবেচনায় সেই দেশের সম্পদের অংশীদারিত্বের দাবীদার। অর্থাৎ যে দেশে যার জন্ম, সেই দেশের মৌলিক সম্পদের উপর তার একটা জন্মগত অধিকার সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সেই মৌলিক সম্পদ হলো ভূমি। এই কথাটা কোন ধর্মে প্রত্যক্ষভাবে বলেছে কিনা জানিনা; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম পরোক্ষভাবে এই অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে একথার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বীকৃতি না থাকলেও মানবাধিকারের সংজ্ঞায় এই অধিকারের সমর্থন প্রকারান্তরে অর্ন্তনিহিতই আছে।

কিন্তু আমার জানা মতে বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে মানুষের এই জন্মগত অধিকারটুকু স্বীকৃতি পায়নি। বাস্তবক্ষেত্রে তাই আমরা দেখেছি, বিশ্বব্যাপী ভাসমান ছিন্নমূল এক জনগোষ্ঠী। তবে উন্নত দেশগুলোতে এই ভাসমান ছিন্নমূল জনগোষ্ঠি আমাদের দেশের মতো দারিদ্র প্রপীড়িত, অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টিতে কংকালসার, আশ্রয়হীন, কর্মহীন জনগোষ্ঠী নয়। এরা ঠিকানাহীনও নয়। এরা ভূমির মালিকানার জন্য লালায়িতও নয়। এরা উপার্জনশীল কর্মকান্ডে দেশের অর্থনৈতিক মূল স্রোতের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হতে পারলেই সন্তুষ্ট। এদের মধ্যে যারা শ্রমিক, শিল্প শ্রমিকই হোক আর কৃষি শ্রমিকই হোক, তাদের চাকুরীর শর্তাবলীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই স্ব-স্ব পরিবারের জন্য বাসস্থানের দখলদার হয়ে যায়। একস্থানের চাকুরী ছেড়েদিয়ে অন্যস্থানে চাকুরী নিলে নুতন কর্মস্থলে একই সুবিধা উপভোগ করে।

ঐসব দেশে ভূমিহীন গৃহহীনদের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত, তারা থাকে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। ঠিক একই ভাবে যারা সরকারী বা বেসরকারী কর্মকর্তা, এবং কর্মস্থলের কাছাকাছি নিজস্ব আবাসস্থল নেই, তারা সবাইও বাস করেন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। অবশ্য বাড়ীতো আর আমাদের দেশের মতো মস্তবড় এক ভূখন্ড, পুকুর প্রাঙ্গণ ইত্যাদি সমেত, অট্টালিকাও নয়, ঝুপড়িও নয়। বাড়ী মানে হলো শোবার ঘর, বসবার ঘর পাকের/খাবার ঘর, গোসলখানা, প্রস্রাব পায়খানা। নব দম্পতিরা সাধারণত একটিমাত্র শোবার ঘর বিশিষ্ট ঐরূপ বাড়ীতে থাকে। আর দু-একটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেলে দুই বা কোন ক্ষেত্রে তিনটি শোবার ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে আস্তানা গাড়ে। আমার গ্রামের আরসিদ আলীর পুত্র আব্বাস আলীর মতো বারোটি ছেলেমেয়ের জন্মদাতা দম্পতি ঐসব দেশে অচিন্তনীয় অকল্পনীয়। বিশ্বের খুব কম দেশই আছে যেখানে এক একটি দম্পতির ছেলেমেয়ের সংখ্যা দুই বা তিনের উপরে। চার সন্তানের জনক জননী অত্যন্ত বিরল। প্রকৃত পক্ষে অধিক সংখ্যক সন্তান দারিদ্র কবলিত অনুন্নত দেশ সমূহের বৈশিষ্ট।

তবে বাংলাদেশের মতো এক কোটি গৃহহীন আর পাঁচ কোটি ভূমিহীন লোক বিশ্বের অন্যকোন দেশেই নেই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য

www.pathagar.com

গৃহহীন ভূমিহীন লোক আছে। ঢাকা মহানগরীর মতো কলকাতা মহানগরীর ফুটপাতে, অফিস আদালতের সিঁড়ি ও বারান্দায় রাত্রি যাপনের লোক যথেষ্ট আছে। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে ও দারিদ্রের প্রকটত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশের দরিদ্রতম অন্তত এক কোটি লোকের মানবেতর দুরাবস্থার কোন তুলনা নেই বিশ্বের কোথাও।

এই পুস্তক লিখার মূল উদ্দেশ্যই হলো আর্ন্তজাতিক স্বীকৃত দারিদ্রের সীমারেখার নিম্নে অবস্থানরত আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী, যার সংখ্যা ছয় কোটি বলে আমরা ধরে নিয়েছি, এদের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন। এদের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে, এদের তিন বেলা খাবার সংগ্রহ করার মত উপার্জনশীল করে তুলতে , এদের শারীরিক মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য সুষম খাদ্য সংগ্রহ করার উপযুক্ত করে তুলতে, এদের সকলকে অর্থনৈতিক মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে আমাদের এই দুঃসাহসিক প্রয়াস।

এই পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে (অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান) আমরা যা কিছু বলেছি, তার একই লক্ষ্যঃ দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন করে কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার করে উপার্জনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু দেশের মৌলিক সম্পদ, অর্থাৎ ভূমি সম্পদ,এতোই সীমিত যে এই কোটি কোটি মানুষকে একটুখানি ভূমির মালিকানা প্রদান করা, একটুখানি ভূমির উপর কোন রকম অধিকার বা কর্তৃত্ব প্রদান করা, প্রত্যক্ষ ভাবে কোন মতেই সম্ভব নয়।

আমরা জানি, ১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মতো একটি গণমুখী ও প্রগতিশীল আইন পাশ হওয়ায় সাবেক জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আইনের বাস্তবায়ন সঠিক মতো না হওয়ায়, যাদের স্বার্থে সে আইন পাশ করা হয়েছিল তাদের কোন লাভই হয়নি। বরং সাবেক জমিদার গোষ্ঠীর স্থলে সৃষ্টি হয়েছে ততোধিক ধনকুবের, যারা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণেও স্বীয়স্বার্থে হস্তক্ষেপ করছেন; যা ঐসব সাবেক জমিদাররা করতে পারতেন না।

আমরা পূর্ববতী এক পরিচ্ছেদে বলেছি, একটি রাষ্ট্রের মূলশক্তি হলো তার নাগরিকদের দেশ প্রেম। যে রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের দেশপ্রেম যতো গভীর, সেই রাষ্ট্রের ভিত্ হয় ততোই শক্ত। আমরা এখানে পুনরাবৃত্তি করছি, দেশপ্রেমেরও একটা ভিত্ আছে, নাগরিকত্বের ও একটা ভিত্ আছে। আমরা প্রথমে ধরে নেই আমাদের দেশের দরিদ্রতম সেই এক কোটি লোকের কথা, যারা ছিন্নমূল, যারা দেশের মাটির সাথে যোগসূত্রহীন, যাদের হারাবার কিছুই নেই, যাদের পাবার আছে দৈনিক মাথা পিছু সাড়ে তিন টাকা, আর সেই পাওনাটুকুও উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত কাজের মাধ্যমে। এই অন্তত এক কোটি জনগোষ্ঠির নাগরিকত্বের ভিত্ কোথায়? অধিকার কোথায়?

এই দরিদ্রতম এক কোটি লোকের উর্দ্ধে অবস্থানকারী আরো যে পাঁচ কোটি মানব সন্তান সরকারী সংজ্ঞামতে ভূমিহীন, তাদেরই বা নাগরিকত্বের ভিত্ কতটুকু শক্ত, তাদের দেশপ্রেমই বা কতটুকু গভীর? তাদের হারাবারইবা কি আছে? পাবারইবা তারা কি আশা করতে পারে? এই বাস্তবতা উপলব্ধি না করার জন্যই, এই বাস্তবতা স্বীকার না করার জন্যই আমরা যুগ যুগ ধরে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের কেবল স্লোগানই দিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছি, কিন্তু কোন পরিকল্পনা করিনি, কোন পদক্ষেপই নেইনি। দেশে উন্নয়নের যতোসব প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রশসংনীয় কার্যক্রম, প্রগতিশীল কার্যক্রম, সকল কার্যক্রমই প্রাচুর্য্য ও দারিদ্রের বৈষম্য কেবল বাড়িয়েই দিচ্ছে। দারিদ্র আরো প্রকটতর হচ্ছে, বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করছে। আর গোটা দেশটা রসাতলে পৌঁছে তার তলাহীন অতলের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

১২·২ঃ দারিদ্র বনাম ভূমি সম্পদ

আমরা বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছি, বাংলাদেশের কোটি কোটি লোকের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের একটি মাত্র পথই আছে, আর সেই পথটি হলো সারাদেশের অপচয়কৃত ভূমির 'সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার'। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে ভূমি ক্ষুধার্ত বাংলাদেশের অতিসীমিত "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করেই কোটি কোটি মানুষের চরম দারিদ্র বিমোচন আদৌ কি সম্ভব হবে? এই যুক্তি সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর হলো, এই পথ ছাড়া আর তো কোন বিকল্প পথ নেই। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একবার দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে কিছুটা অগ্রগতি হয়ে গেলে, অর্থনীতির স্বয়ংক্রীয় প্রক্রিয়ায় নূতন নূতন কার্যক্রম সৃষ্টি হবে, এবং এক একটি কার্যক্রম অন্যটির সম্পূরক হিসাবে কাজ করে অর্থ উপার্জনের নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ফলে দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের আম উৎপাদিত হয়, তাহলে কেবল আমগাছের মালিকরা একাই এই বর্ধিত আয়ের একচ্ছত্র অধিকারী হবেন না। আমগাছ পাহারা দেবার জন্য লোক লাগবে, গাছ থেকে আম পাড়ার লোক লাগবে, আমগুলোকে জাতে জাতে ভাগ করে খাঁচায় ভর্তি করতে লোক লাগবে, খাঁচা তৈরী করতে লোক লাগবে, ঐ খাঁচার জন্য বাঁশের প্রয়োজন হবে, বেতের প্রয়োজন হবে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে রেলপথ, নৌপথ, সড়কপথ পর্যন্ত আমের ঝুড়ি পরিবহণের জন্য গরুরগাড়ি, ঠেলাগাড়ির প্রয়োজন হবে, রেল-নৌ-সড়ক পরিবহণের মালিকরাও এই কাজে সম্পৃক্ত হবেন, ছোট মহাজন থেকে বড় মহাজনের মাধ্যমে দূর থেকে দূরান্তে সেই আম যাবে, সেখানে আবার বড় মহাজন থেকে ছোট মহাজন, তারপর ফড়িয়া এবং শেষ পর্যন্ত দোকানী বা ফেরীওয়ালা সর্বশেষ লাভবান হবে। আর পরবর্তী বছরে আম উৎপাদনের প্রক্রিয়া বর্ধিত হবে, অর্থাৎ আমগাছের পরিচর্যার জন্য আরো বেশী লোক লাগবে, আমের চারার চাহিদা বাড়বে, যার জন্য নার্সারীর কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হবে।

আমেরই মতো যদি সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়তে থাকে তাহলে মানুষের কার্যক্রম দশগুণ বিশগুণ করে বাড়তে থাকবে। এটা অর্থনৈতিক স্বয়ংক্রিয় অমোঘ ধারা।

আরেকটি যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন জাগতে পারে যে, উপরোক্ত পন্থায় না হয় লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটি কোটি লোকের কর্মসংস্থান হলো, তাদের মাথা পিছু আয় না হয় কিছুটা বাড়লো, কিন্তু ছিন্নমূল ভূমিহীন মানুষের নাগরিকত্বের জন্য ভূমির সঙ্গে যোগসূত্রের যে কথা পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে বলা হয়েছে সেই যোগসূত্র সৃষ্টি হবে কি করে? প্রশ্নটি অবশ্যই কঠিন। কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর দেয়া যায় না। কঠিন প্রশ্নের জটিল উত্তর সহজে গৃহীতও হয় না। এই কঠিন প্রশ্নের জটিল উত্তর হলো, নিম্নবর্ণিত পন্থাসমূহ অনুসরণ করে দেশের ভূমিহীন মানুষকে "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" কার্যক্রমে এমনভাবে জড়িত করতে হবে যে তারা বর্ধিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়ে যাবে। উন্নত বিশ্বের

www.pathagar.com

মাত্র পাঁচ কাঠা ভূমির অংশীদারিত্ব পেয়ে একশতটি পরিবারই সন্তুষ্ট। ঐ পাঁচ কাঠা ভূমির উপর পঞ্চাশ তলা দালানের মধ্যস্থলে উঠানামার ছোট্ট সিঁড়ি ও বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট। প্রত্যেক তলায় দুটি করে আবাসিক ঘর। এরূপ একশতটি ঘরের মালিক একশতটি পরিবার। প্রত্যেকটি ঘরের মালিকানা সম্পূর্ণ নিজস্ব। মালিক তার ঘর ভাড়া দিতে পারেন, বিক্রিও করতে পারেন। কিন্তু যে পাঁচ কাঠা ভূমির উপর এই স্বয়ংসম্পূর্ণ একশতটি ঘর নির্মিত হয়ে গেছে, তার মূল ভিত্ যে পাঁচ কাঠা ভূমি তার মালিকানা কিন্তু যৌথ। সমবায় ভিত্তিতে এই একশতটি পরিবার পাঁচ কাঠা ভূমির যৌথ মালিক। পাঁচ কাঠা ভূমিকে ১০০ ভাগে ভাগ করলে পরিবার প্রতি মালিকানা দাঁড়ায় মাত্র ৩৬ বর্গফুট ভূমি। অর্থাৎ এই পাঁচ কাঠা ভূমির যৌথ ব্যবহার না করে, বিচ্ছিন্ন ব্যবহার করলে পরিবার প্রতি ভূমির পরিমাপ দাঁড়াতো ৩৬ বর্গফুট। মাত্র ৩৬ বর্গফুট ভূমি দিয়ে একমাত্র একটি কবর ছাড়া আর কোন ব্যবহারই সম্ভব নয়। অথচ, যৌথ মালিকানায় একেকটি পরিবার ১৫০০/১৬০০ বর্গফুটের একেকটি ঘরের মালিক হয়ে গেলো। অন্যদিক থেকে হিসাব করলে প্রত্যেক পরিবার যদি নিজস্ব ভূমিতে নিজস্ব বাড়ী করতো, তবে প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য কমপক্ষে ৩ কাঠা ভূমির দরকার হতো, অর্থাৎ ১০০টি পরিবারের জন্য ৩০০ কাঠা বা ১৫ বিঘা ভূমির প্রয়োজন হতো।

বহুতলা বিশিষ্ট যৌথ মালিকানাধীন আবাসস্থল নির্মাণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় একে বলা হয় কনডোমোনিয়াম। বাংলা ভাষায় এর কোন প্রতিশব্দ এখনো নেই। আশাকরি শীঘ্রই উদ্ভাবন হয়ে যাবে।

ভূমি ক্ষুধার্ত বাংলাদেশ, যেখানে সমস্ত ভূমিহীন পরিবারদের পৃথক পৃথক ব্যবহার যোগ্য পৃথক পৃথক ভূমির মালিকানা দেয়ার মতো ভূমিই নেই, সেখানে সমবায় ভিত্তিতে যৌথ মালিকানা দিয়ে অল্প ভূমির উপর অনেক পরিবারের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করাই ভূমিহীন সমস্যার একমাত্র সমাধান। পূর্বেই বলেছি, গুচ্ছ গ্রামের যে কর্মসূচী অনুসারীত হচ্ছে, সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গুচ্ছ গ্রামের অনুমোদিত কার্যক্রম পরিবর্তিত না করলে কিছু দিন পর দেশের সমস্ত খাসভূমি নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর শতকরা ৮০ ভাগ ভূমিহীন চিরকালের জন্যই ভূমিহীন থাকবে। বংশ পরম্পরায় ভূমির মালিক হবার যে ক্ষীণ আশা তারা পোষণ করে আসছে সেটাও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এর নির্মম পরিণতির কথা এখনই চিন্তা না করলে পরবর্তীতে প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকবে না।

কিন্তু সমবায় ভিত্তিতে যৌথ মালিকানায় ভূমিহীনদের ভূমির অংশীদারিত্ব দেয়ার সুযোগও সীমিত। কোন কোন স্থানে তাদের যৌথ মালিকানা দেবার মতো খাস ভূমি পাওয়া যাবে না। কোন এলাকায় ভূমি পাওয়া যাবে, কিন্তু ভূমির যৌথ অংশীদারিত্বে আগ্রহী ভূমিহীন হয়তো পাওয়া যাবে না। এই সব মাঠ পর্যায়ের সমস্যার সমাধান এই পুস্তকে দেয়া যাবে না। বাস্তবক্ষেত্রে এই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। দেশের সকল ভূমিহীনকে ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যে কতো কঠিন কাজ, সেটা আমরা সম্যক উপলব্ধি করি। সেই জন্য আমি আরেকটি নূতন, এমনকি অভিনব, প্রস্তাব নিয়ে আসছি।

www.pathagar.com

১২·৩ঃ ভূমিহীন বনাম স্থাবর সম্পত্তি

ভূমি সম্পদেরই আরেক নাম "স্থাবর সম্পত্তি"। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ঘর বাড়ী, গাছ পালা, পুকুর-পানি, ইত্যাদিও অর্ন্তভুক্ত। আমার বিশ্বাস, ছিন্নমূল ভূমিহীন একেকটি পরিবারকে ভূমির মালিকানা দিতে না পারলেও রাষ্ট্রের বা স্থানীয় সরকারের মালিকানাধীন ভূমিতে উৎপাদন করার আইনত অধিকার দিলে সেই অধিকারে উক্ত পরিবারের স্থাবর সম্পত্তির সাথে একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, আর একটা বাৎসরিক আয়ের উৎসও সুনিশ্চিত হয়ে গেলো। এই প্রস্তাবটি একটু অভিনব মনে হলেও, মোটেই অবাস্তব নয়। সারা দেশের হাজার হাজার মাইল রাস্তার পাশ দিয়ে বৃক্ষ রোপণের প্রচেষ্টা হয়েছে অনেক, ব্যয়ও হয়েছে কোটি কোটি টাকা। সাফল্য হয়েছে কতটুকু? প্রায় শতাব্দী পূর্বে যশোর কোলকাতা রাস্তার উভয় পার্শ্বে কোন এক জমিদার যে গাছগুলো লাগিয়েছিলেন, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার কাছাকাছি মহাসড়কের পাশ দিয়ে কোন মহারাজা যে গাছগুলো লাগিয়েছিলেন, গত এক শতাব্দীতে বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূ-খন্ডটিতে এই কাজটুকু সাফল্যজনক ভাবে আর কয়টি স্থানে হয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রাস্তার পাশে কেবল চারা লাগানোই হচ্ছে, কিন্তু কোথায় সে চারা? পূর্বেই বলেছি, মানব শিশুকে লালন করতে যে রকম মাতাপিতার আন্তরিক যত্নের দরকার, পশু পালনে যেরকম মালিকের নিজস্ব দৃষ্টির দরকার বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যায় ঠিক তেমনি মালিকের হাতের পরশের দরকার, সযত্ন দৃষ্টির দরকার। বর্তমান সরকার উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশংসনীয় বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমটি অনুমোদন করেছিলেন। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, টাকা খরচ ঠিকই হয়েছে, কিন্তু বৃক্ষের তো নাম নিশানাও নেই।

আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, সারা দেশের রেলপথ, রাজপথ, মহাসড়ক, জেলা পরিষদ সড়ক, উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ডাইক, বেড়ি বাঁধ ইত্যাদির দুপাশে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা নিশ্চিত করার জন্য একটা বিশেষ আইন পাশ করা হোক, যে আইনে ব্যবস্থা থাকবে, একেকটি পরিবারকে বৃক্ষ রোপণের জন্য এমন একেকটি এলাকা বরাদ্দ করা হবে যে এলাকায় ফলবান ও অর্থকরী বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা করে কয়েক বছরের মধ্যে সে পরিবার বছরে হাজার দশেক টাকার আয় করতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদী এই ইজারার শর্ত থাকবে এই যে, ইজারাদার ভূমির মালিক হবে না, কিন্তু অনুমোদিত পন্থায়, অনুমোদিত ফলবান ও অর্থকরী বৃক্ষ লাগিয়ে ইজারাদার সম্পূর্ণ আয়ের মালিক হবে, এমন কি বৃক্ষের অবাঞ্ছিত ডালপালা কেটে বিক্রী করতে পারবে, বাঁশ, বেত, মুরতা ইত্যাদি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, যেগুলো পানির মধ্যেও টিকে থাকে এবং একবার লাগালে বছর বছর চারা দিয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, এগুলো প্রচুর পরিমাণে লাগাতে পারবে এবং নির্বিঘ্নে বিক্রিও করতে পারবে। ইজারাদারের অল্প কিছু পুঁজির প্রয়োজন হবে। তাকে উন্নত মানের চারা ক্রয় করতে হবে, সার ক্রয় করতে হবে, চারা গাছের নিরাপত্তার জন্য ঘেরাও দিতে হবে। তদুপরি তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তার

www.pathagar.com

পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কিছু সাহায্যও লাগবে। গ্রামীন ব্যাংক মারফত তার ইজারা দলিল বন্ধকের বিপরীতে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে চারা সার এবং ঘেরাও এর জন্য ইট অথবা বাঁশ সরাসরি সরবরাহ করতে পারলে অপচয়ের সম্ভাবনা কমবে।

দেশের মোট ১,০৫,০৮৫ মাইল রাস্তা এবং মোট ১৬,০৭৮ মাইল বাঁধ এর দু'পাশের সর্বমোট দৈর্ঘ্য হবে ২,৪২,৩২৬ মাইল। এই সুদীর্ঘ ভূমির উপর গড়পড়তা ১৫ ফুট পর পর ফলবান এবং অর্থকরী গাছের চারা লাগালে সর্বমোট চারার সংখ্যা দাঁড়াবে ৮,৫২,৯৪,০০০ টি। এক একটি ভূমিহীন পরিবারের ভাগে মাত্র ৩৪ টি চারা লাগানোর মতো ভূমিই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। পাঁচ/ছয় বছর পর ঐ সব গাছে ফল ধরতে শুরু করবে। তাছাড়া বর্ধিত আয় হবে, রাস্তার কিনারার নিম্নতম স্থান দিয়ে বাঁশ, বেত, মুরতা এগুলো লাগিয়ে দিলে, এসব তৃতীয় বছর থেকেই প্রতিদান দিতে থাকবে। সর্বোপরি রাস্তার কিনারায় মৌসুমী ফসল লাগাবার সুযোগ ইজারাদার পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় সারাদেশে অনুমানিক ২৫,০০,০০০ ভূমিহীন পরিবার ভূমি সদ্ব্যবহারের অধিকার লাভ করবে, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

১২·৪ঃ গ্রামাঞ্চলে ফলের চাষ

কিছুটা পরিসংখ্যান ও কিছুটা অনুমান থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ২,৫০,০০০ মসজিদ, ৫০,০০০ ঈদগাহ, ৫০০০ অন্যান্য উপাসনালয়, ৬৮,০০০ কবর স্থান দরগাহ, ৫৭,১৯২ স্কুল মাদ্রাসা, ৬৩,০০০ হাটবাজার বিদ্যমান আছে। ফল ও শাক সব্জি ইত্যাদি উৎপাদনশীল কার্যক্রমে ব্যবহারের শর্তে এগুলোতে কমপক্ষে ছয় লক্ষ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করে স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার দান করা যাবে। এই সব সম্পদ পাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করার দায়ীত্ব নিতে হবে সংশ্লিষ্ট সরকারী আধা সরকারী কর্তৃপক্ষদের অথবা গ্রামীন সমাজের। এই পুঁজি নিয়োগের জন্য তারা ইজারাদারদের নিকট থেকে বাৎসরিক একটা যুক্তিসঙ্গত প্রতিদান পাবেন।

পূর্বেই বলেছি, কবরস্থানের চর্তুসীমা দিয়ে ফলবান এবং অর্থকরী বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে, আর সমস্ত কবরস্থান ব্যাপী ঘাস তখন এমনিতেই জন্মাতে থাকবে; কারণ ঘেরাও করার পর এটাতো আর গোচারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হবে না। কবরস্থানের ইজারাদারকে গেইট সংলগ্ন এলাকায় বাসস্থান নির্মাণ করে দিলে কবরস্থানের সার্বক্ষণিক তদারকি নিশ্চিত হবে। এটা শহরাঞ্চলে এখনই হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীর কবরস্থানের ঘাস বিক্রি করে বহুলোক জীবিকা অর্জন করছে, আর সাথে সাথে কবরস্থানও জঙ্গলাকীর্ণ হচ্ছে না। কবরস্থানে 'নেপিয়ার' ইত্যাদি উন্নত মানের ঘাস লাগালে লাভ হবে বেশী।

কবরস্থানের তদারকির আর একটা সুফল হবে, সুন্দর লাইন ধরে কবর স্থাপন করা। তদুপরি কবর খননের জন্য ঐ ইজারাদার স্বয়ং বা তার সাথী ভূমিহীন লোক বিশেষজ্ঞ হয়ে যাবে। এইজন্য তাদেরকে কিছুটা পারিশ্রমিক দিতে কেউ দ্বিধা বোধ করবেন না। যে মৃত ব্যক্তির পক্ষে এই খরচটুক করার কেউই নেই সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক দাবী করা চলবে না।

হাট বাজারের বটবৃক্ষ অথবা অন্য অনর্থকরী জরাজীর্ণ বৃক্ষের মূল উৎপাটন করে বৃক্ষরোপণকারী ভূমিহীন ইজারাদার বাজার কমিটির অনুমোদন ক্রমে চর্তুসীমা দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে লাগাবে ফলবান বৃক্ষরাজী। হাট বাজারের অভ্যন্তরে ও মাঝে মাঝে ঐ সব বৃক্ষ লাগানো সম্ভব হবে। ফলের মালিক হবে ঐ ভূমিহীন ইজারাদার, আর ছায়া উপভোগ করবেন বাজারের সকল লোক।

www.pathagar.com

১২.৫ঃ শিক্ষাঙ্গণে ফল ও সব্জি

গ্রামাঞ্চলের সকল শিক্ষালয় স্কুল মাদ্রাসা কলেজ এর খেলার মাঠ সহ প্রাঙ্গণ ফলবান বৃক্ষ চাষের আদর্শ ক্ষেত্র। কেননা সেখানে কেবল ভূমিহীনদের কর্ম সংস্থান, তথা স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্তিই হবে না, ছাত্র ছাত্রীদের একটা অত্যাবশ্যকীয় প্রশিক্ষণের সুযোগও হবে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এমনকি লজ্জার বিষয় যে, আমাদের জনগণ বৃক্ষের চারা লাগানোর পদ্ধতিই জানেন না, পরিচর্যা জানেন না। একটা চারা গাছ লাগাতে হলে তারা তাদের সুবিধা জনক স্থানে কোদাল দিয়ে এক কোপ মেরে, এমনকি কেউ কেউ বটি দাও দিয়ে একটুখানি মাটি খুঁড়ে চারাটি কোনমতে পুঁতে দিয়েই খালাস। যে স্থানে চারা পুঁতেছেন সে স্থানে আলো বাতাস আসে কি না তার কোন চিন্তা নেই, চারাটির জন্য কতো বড়, কত গভীর গর্ত করা অত্যাবশ্যক, সেই গর্তে কতো দিন আগে থেকে কি পরিমাণ সার দিয়ে রাখা উচিত ছিলো, তার কোন খোঁজ খবরই নেই। ধারনাটি হলো, মাটিতে বীজ বা চারা পুঁতে দিলেই তো মানুষের দায়ীত্ব শেষ। এখন আল্লার দায়ীত্ব সেই গাছটিকে বড় করে তোলা, আর বছর বছর গাছ ভর্তি ফল উৎপাদন করা।

প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে খুঁজে দেখেছি, কোথাও বৃক্ষ রোপণের এবং পরিচর্যার জ্ঞানের সন্ধান পাইনি। সপ্তাহ তিনেক পূর্বে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল মোঃ শহীদুল ইসলামের সাথে এক সুদীর্ঘ আলোচনা করছিলাম সারা দেশ ব্যাপী ফল ও সব্জি উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে। শুনে অনেকটা অবাক হয়েছিলাম, তিনি আমার চিন্তাধারার প্রায় সব কিছুই সমর্থন করেন। কমলার চাষ সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে তিনি বললেন, সিলেটের কোন এক গ্রামে বেশ কিছু কমলা গাছের অপুষ্টি জনিত দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি পরামর্শ দিলেন প্রত্যেকটি গাছের চর্তুদিকে গোলাকার ছোট নালা করে তার মধ্যে গোবর সার প্রয়োগ করতে। কিছুদিন পর সেই পথে অন্য কোথাও যাওয়ার সময় সেই বাড়ীতে গিয়ে দেখেন প্রত্যেক কমলা গাছের গোড়ায় মাটির উপরে সযত্নে গোবর ঠেসে রাখা হয়েছে আর সেই গোবর শুকিয়ে জড়সড়ো হয়ে আছে। এই ভাবে মাটির উপরে গোবর ঠেসে রাখা যে আদৌ সার প্রয়োগ নয়, এবং এতে গাছের যে কোন পুষ্টিই হবে না, এটা কয়জন লোক জানেন। তাই ফলের চাষে আমাদের দৈন্যতা বোধগম্য।

যা বলছিলাম, শিক্ষালয়ে ফলের চাষকে একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করা অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে। সকল উচ্চ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে নাতে ফলের চাষ ও সব্জির চাষ একটি স্থায়ী কর্মসূচী হওয়া উচিত। এখানেও আমাদের প্রস্তাবিত পন্থায় ভূমিহীন লোকদের স্থাবর সম্পত্তির সাথে যোগসুত্র সৃষ্টি করা ছাড়াও প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর এক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের সমস্ত ভূমি "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করা হয় তা হলে এটা কেবল খাদ্য উৎপাদনে এক বিরাট অবদানই হবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক উল্লেখযোগ্য আয়ের সুত্র হয়ে যাবে। অনুরুপ ভাবে সকল মাদ্রাসায়ও এরূপ কর্মসূচী চালু হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

১২৬ঃ নগরীতে ফলের চাষ

এবার বাকী থাকলো, সারা দেশের পৌরসভা এলাকা ও উপজেলা সদর। আমার সবিনয় নিবেদন, প্রত্যেকটি পৌরসভা এলাকা ও প্রত্যেকটি উপজেলা সদরকে এক একটি দর্শণীয় ফলের বাগান রূপে গড়ে তোলা হোক। পৌরসভা এলাকায় এবং উপজেলা সদরে সরকারী এমন কোন ভূমি থাকবে না, যেখানে ফল গাছ লাগানো সম্ভব, অথচ ফল গাছ লাগানো হয়নি। সর্বপ্রথমে সকল বটবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে সকল দালানে গজানো বটবৃক্ষের চারাকে মূলোৎপাটিত করে মানুষের এই দুশমন বৃক্ষকে নির্বংশ করা হোক। সাথে সাথে জরাজীর্ন বার্ধক্য প্রপীড়িত আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত সকল বৃক্ষেরও মূল উৎপাটন করা হোক। ফুটপাতের উপরে বৃক্ষকে সযত্নে লালন করা বৃক্ষের জন্য মায়া কান্নারই মতো। স্থান কাল পাত্র ভেদে কোন কার্যক্রমই অশোভনীয় নয় অযৌক্তিকও নয়। ফুটপাতের সমস্ত বৃক্ষের মূল উৎপাটন করে ফেলা উচিত। ঐ সব মূল উৎপাটিত বৃক্ষের পরিবর্তে সারিবদ্ধ ভাবে ৪/৫ গুন ফলের চারা লাগানো অবশ্যই সম্ভব।

জিয়া আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের মহাসড়কের দু'পাশে কেবল মাত্র শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য যে সব বৃক্ষরাজী লাগানো হয়েছে এই গুলোর পরিবর্তন প্রক্রিয়া চালু করা উচিত। ঐ রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে লাগানো উচিত কাঁঠাল, আম, কালোজাম, পেয়ারা, নারকেলি কুল, নারিকেল, তাল, সুপারী এসব দেশী ফলের চারা। আগেই বলেছি বিদেশীরা বাংলাদেশে আসেন বাংলাদেশের স্বকীয় দৃশ্য দেখতে, বিদেশী দৃশ্য দেখতে নয়।

ঢাকা মহানগরী সহ বাংলাদেশের সকল শহরে এবং উপজেলা সদরে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত করলে আমরা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, সারা বিশ্বের প্রশংসা লাভ করবো।

বঙ্গভবনের বিশাল প্রাঙ্গনে যে বৃক্ষরাজী বিরাজ করছে, এগুলোরও আশু পরিবর্তনের সর্নিবন্ধ সুপারিশ করছি। বঙ্গভবনের প্রাঙ্গনে সুপরিকল্পিত, সুশোভিত ভাবে লাগানো উচিত বাংলাদেশের সর্ব প্রকার ফলের প্রতিনিধিত্ব মূলক নমুনা। কাঁঠাল আম থেকে শুরু করে জলপাই কামরাঙ্গা পর্যন্ত কোন একটা ফলবান বৃক্ষই বঙ্গভবনে স্থান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলাদেশের সকল ফলবান বৃক্ষ দিয়ে বঙ্গভবন প্রাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে পারলে সারা বছরব্যাপী এটা হবে এক দর্শনীয় স্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভবন (হোয়াইট হাউজ) যদি সপ্তাহে একদিন পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে, তবে আমাদের বঙ্গভবনের দর্শনীয় ফল বাগানটি কেন পর্যটকদের দেখানো যাবে না? রমনা সেগুন বাগিচা এলাকায় বার্ধক্য জনিত জরাজীর্ন আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত সকল বৃক্ষরাজীর পরিবর্তন আর বিলম্বিত করা যায় না। বিলম্বের জন্য অনেক বৃক্ষের মূল্যবান কাঠ ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রধান বিচারপতি ভবনে শত শত অনর্থকরী বৃক্ষ পরিবর্তন করে লাগানো উচিত উন্নত মানের ফলবান বৃক্ষরাজী, সারিবদ্ধ করে, সুশোভিত করে। মন্ত্রি পাড়ার সকল বাড়ীর বৃক্ষরাজীর পরিবর্তনও অপরিহার্য।

www.pathagar.com

বিশাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অনর্থকরী বৃক্ষে ভর্তি। অল্প কিছু সংখ্যক ফলের গাছ রেখে বাকী সমস্ত বৃক্ষ পরিবর্তন করা উচিত ফলের গাছ দিয়ে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে বিভিন্ন সেকসনে ভাগ করে কাঁঠাল বাগান, আম বাগান, লিচু বাগান, পেয়ারা বাগান, নারিকেল বাগান ইত্যাদিতে বিভক্ত করে বৃক্ষ রোপণের এক নুতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। অনুরুপ ভাবে রমনা পার্ককে পরিণত করা উচিত এক সুন্দর ফল বাগানে। মহানগরীর প্রত্যেকটি পার্কের অনর্থকরী বৃক্ষের পরিবর্তে ফলবান বৃক্ষ লাগিয়ে নগরবাসীকে, এমনকি দেশবাসীকে দৃষ্টান্ত দেখানো উচিত, "ভূমির সবার্ত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করে একটি দরিদ্রতম দেশকেও দারিদ্রের রসাতল থেকে উথান করা যায়।

ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম বন্দরনগরী, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় নগরী গুলোকে ফলের নগরীতে পরিণত করতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যেক জেলা শহর, ও উপজেলা শহরকেও পরিণত করতে হবে ফলেব শহরে। ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ির প্রাঙ্গনে ফলের চাষের জন্য চারা সরবরাহ এবং চারা লাগানো একটি পেশায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কৃষি শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকেরা শহরে শহরে নার্সারী স্থাপন করে বাড়ী বাড়ী চারা লাগিয়ে দেয়ার চুক্তিবদ্ধ কাজ প্রচলিত করতে পারেন। চারা লাগানো থেকে, প্রথম বাব্রের ফল উৎপাদন পর্যন্ত, এই চুক্তি সম্প্রসারিত হতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা নিজের বাড়ীর প্রাঙ্গনের অনর্থকরী বা নিম্নমানের ফলগাছ কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে উচ্চমানের ফল গাছ স্বহস্তে লাগাতে পারেন এবং পরিচর্যাও করতে পারেন।

সারা দেশের সকল শহর ও উপজেলা সদরে এই কার্যক্রম শুরু হলে গ্রামে গ্রামে অনুকরণ শুরু হতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে অনর্থকরী একটি বৃক্ষ কর্তন করে ফলবান পাঁচটি বা দশটি বৃক্ষের চারা লাগাতে অর্থ যোগানোর কোন সমস্যাই হবে না। কারণ কর্তন করা সেই বৃক্ষের যে মূল্য পাওয়া যাবে, উন্নত মানের প্রযুক্তিতে দশটি ফলবান বৃক্ষের চারা রোপণ করতে তার অর্ধেক টাকাও খরচ হবে না।

www.pathagar.com

১২·৭ ঃ নার্সারী

ইংরেজী শব্দ NURSERY বলতে আমরা উদ্ভিদের চারা প্রজননের ও বর্ধনের স্থান বুঝাতে চাই। 'নার্সারী' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে, কিন্তু বাংলা কোন প্রতিশব্দ নেই। এই পুস্তকে ব্যবহৃত নার্সারী শব্দটাকে আমরা বাংলায় 'চারা বাগান' নাম দিয়েছি। উন্নতমানের উদ্ভিদ, বিশেষ করে উন্নতমানের ফুল ও ফলের চারা, সরবরাহের জন্য দক্ষ শিক্ষিত নিবেদিত মালিকের নিজস্ব পরিচর্যা নার্সারীর জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা আনন্দের সাথে স্বীকার করছি, ঢাকা মহানগরীতে উন্নতমানের ফুলের চারার বেশ কয়েকটি নার্সারী স্থাপিত হয়ে গেছে, এবং বেশ লাভজনক ব্যবসা করছে। এমনো নার্সারী আছে, যার মালিক মাত্র তিন/চার যুগ পূর্বে সরকারী রমনা পার্কে দিন মজুরের কাজ করতেন। অশিক্ষিত কিন্তু বিদ্যুৎসাহী এইরূপ কিছু যুবক দৈনিক ৮ ঘন্টা রমনার ফুল বাগানে দিন মজুর হিসাবে মালীর কাজ করার পর শহরের কোন নিভৃত কোণায় নিজে নিজে কিছু ফুলের চারা লাগাতে থাকেন। এদের একজনতো এখন বাড়ী–গাড়ির মালিক। এমনকি বছর কয়েক পূর্বে বাণিজ্যিক এলাকায় বহুতলা বিশিষ্ট দালানও নির্মাণ করেছেন। আর এই বৈষয়িক উন্নতি করেছেন কেবল মাত্র ফল–ফুলের চারার মাধ্যমে। প্রথমে কেবল ফুলের চর্চা নিয়ে শুরু করে কয়েক বছর পর ফলের চারা জন্মাতে শুরু করেন; তারপর ফল–ফুলের চারার বিরাট পাইকারী ব্যবসা। আরেকজন এতোটা উন্নতি করতে না পারলেও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ইনিও ফল–ফুলের চারা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েননি।

১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত একটানা জাতীয় চিত্তবিনোদন সমিতির সভাপতি হিসাবে বাৎসরিক জাতীয় পুষ্প প্রদর্শনী প্রতিযোগীতা উপলক্ষে দেশের পুষ্পমোদীদের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বহস্তে ফুলের চারা লালনকারী অনেক নারী পুরুষকে জানতে পেরেছি, যারা সমাজের উচ্চতম পর্যায়ের মানুষ, কিন্তু প্রত্যহ ভোরে কমপক্ষে একঘন্টা স্বহস্তে মাটি ও পানির সাথে বীজের বা কলম চারার সংযোগ করে সৃষ্টি সুখের উল্লাস লাভ করেন। এদের একজন ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং গণপূর্ত বিভাগের সচিব, জনাব শফিকুর রহমান। তার স্ত্রী ডঃ মিসেস আমেনা রহমান, স্বামীর জীবিত অবস্থায়ই মন্ত্রী নিয়োজিতহয়ে ছিলেন। তাদের পুত্র রিয়াজ রহমান বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত। আমার বড় মেয়ে, রেহানা আশিকুর রহমান, যার বড় ছেলে এখন মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত, সেও তো স্বহস্তে ফুলের চর্চা করে। তাদের বনানীস্থ বাস ভবনের দৃশ্য টেলিভিশনে প্রায়শই দেখা যায়।

বেশ কিছু উচ্চস্তরের নারী পুরুষ নার্সারী বা চারা বাগানকে সার্বক্ষণিক পেশা হিসাবে গ্রহণ করে একই সাথে সুনাম ও অর্থ কুড়াচ্ছেন। ফল–ফুলের বহু পুস্তকের

www.pathagar.com

রচয়িতা, এ, এস, এম, কামাল উদ্দীন জীবনের সপ্তম দশকেও সারা দিনটাই অতিবাহিত করেন ফল-ফুলের চারা পরিচর্যায়।

বাণিজ্যিক হারে ফল-ফুলের চারা উৎপাদনে বরিশালের স্বরূপ কাঠি, উজিরপুর ও কোতোয়ালী উপজেলার শত শত পরিবার যুগ যুগ ধরে নিবেদিত। তাদের একমাত্র পেশাই হলো চারা উৎপাদন, পরিচর্যা ও বিপনন। ঢাকার সদরঘাটে যারা বিশাল নৌকা ভর্তি ফলের চারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাইকারী হিসাবে বিক্রী করেন, তাদের সবারই পরিচিতি স্বরূপকাঠির চারা বাগানের মালিক হিসাবে। মাটির টব অথবা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে এরা যেসব চারা বিক্রী করেন, তার অনেকগুলোর মধ্যে ফুলের মুকুল এসে গেছে, কোনটিতে ফলও ঝুলছে। নৌকা থেকে পাইকারীদরে চারা ক্রয় করে সন্নিকটস্থ সাবেক রেলওয়ে কলোনীর অব্যবহৃত স্থান সমূহে ফলের চারা ভর্তি করে রেখেছে চারা ব্যবসায়ীরা। নৌকা থেকে ৫ টাকায় ক্রয় করা চারা অনায়াসে ১৫ টাকায় বিক্রী করছে। এদের আয়ের উৎস বরিশালের ঐ নার্সারীগুলো।

মিন্টো রোডের মাত্র এক বিঘা জমির উপর বনবিভাগের যে নার্সারীটি লক্ষ লক্ষ টাকার চারা বিক্রী করে, সেখানে উন্নত মানের আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, নারিকেল ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি প্রজাতির ফলের চারা ছাড়া আর সবই কিন্তু সেগুন, মেহগিনি ইত্যাদি কাঁঠের চারা। বন বিভাগের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাদের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা নিবেদিত করুন কেবলমাত্র উন্নত মানের ফল উৎপাদনে। উন্নত মানের কাঠের আবাসস্থল সংরক্ষিত বন, মানুষের আবাসিক এলাকায় নয়।

আমাদের এই ভূমি বিপ্লব পরিকল্পনায় কোটি কোটি ফলের চারার প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাব, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক উপজেলায় অন্তত একটি করে ফলের চারা উৎপাদনকারী নার্সারী স্থাপন করার লক্ষ্যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হোক বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও বন বিভাগকে। এই প্রশিক্ষণের প্রার্থী নির্বাচনে অগ্রগণ্যতা দেয়া হোক সেসব বেকার যুবককে যারা উপযুক্ত স্থানে, হয় নিজস্ব না হয় ভাড়া করা, অন্তত এক বিঘা জমিতে নার্সারী স্থাপন করতে পারবেন। কোন উপজেলায় যদি এরূপ উপযুক্ত স্থান পাওয়া না যায়, তাহলে উপজেলা কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে বা যে কোন সরকারী ভূমিতে ১০ বছর মেয়াদী ইজারা ভিত্তিক ফলের নার্সারী গড়ে তোলা হোক। প্রযুক্তিগত সাহায্য দেয়ার জন্য স্থানীয় কৃষি ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হোক। উপজেলায় এই সব নার্সারীর সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উপজেলা কৃষি অফিসারের গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

১২.৮ তিলোত্তমা ঢাকা

বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে ভূমি বিপ্লবের যে পরিকল্পনা আমরা জাতির কাছে পেশ করছি তার প্রায় প্রত্যেকটি কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রস্থল গ্রাম নয়, শহর। এই পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র হলো দেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরী। এই প্রাণকেন্দ্রের শাখা প্রশাখা বিস্তারলাভ করবে উপজেলা সদর পর্যন্ত। এর কারণ সহজেই বোধগম্য। গ্রামে গ্রামে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো স্থাপন করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে উপজেলা সদর থেকে গ্রামে গ্রামে প্রযুক্তি, উপকরণ, উপাদান, পরামর্শ প্রদান করা সহজতর। রাজধানী থেকে সকল পৌরসভা ও সকল উপজেলাতে প্রযুক্তি, উপকরণ, উপাদান ইত্যাদি সরাসরি বিতরণে সময় লাগবে কম। তা ছাড়াও বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠান, যেমন সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বি,ডি,আর, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি রাজধানীতে অবস্থিত জাতীয় কেন্দ্রের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারে।

আমার সুচিন্তিত অভিমত, আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা, "ভূমি বিপ্লবের" মাধ্যমে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন এমন একটি অভূতপূর্ব, দুঃসাহসিক কার্যক্রম, যাতে এগারো কোটি মানুষের বিরাট জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে, অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে, এর বাস্তবায়নের গতি মন্থর হয়ে যাবে; আর মন্থরগতির বাস্তবায়নের সুফল সহজে দৃষ্টিগোচরই হবে না। তাই আমার প্রস্তাব, এই কার্যক্রম শুরু করতে হবে দেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরী থেকে।

সরকারের প্রশংসার জন্যই হোক, আর সমালোচনার জন্যই হোক, কিছু কাল থেকে মহানগরীর নাম হয়ে গেছে "তিলোত্তমা ঢাকা"। সমালোচকরা নামটা দিয়েছেন ব্যঙ্গাত্মক অর্থে। তারা বুঝাতে চান, মহাআড়ম্বরে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধিকরণের কোন যুক্তি নেই। শ্রীবৃদ্ধি করতে গিয়ে অপচয়ের যে সব অভিযোগ উঠেছে, তার মধ্যে যদি কিছুটা সত্যও নিহিত থাকে, তবে আমি সে অপচয়ের ঘোর নিন্দা করি। কিন্তু দেশের রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধিকরণ একটি কার্যক্রম হিসাবে কেবল প্রশংসার যোগ্যই নয়, একটি অত্যাবশ্যকীয়, অপরিহার্য কার্যক্রম।

মনে রাখতে হবে, মানুষের শারীরিক শক্তির চেয়ে মানসিক শক্তি বহু বহু গুণ বেশী মূল্যবান। দূষিত পরিবেশে, নোংরাও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে উৎকৃষ্টমানের খাবার খেয়ে শারীরিক শক্তি বর্ধিত হতে পারে, কিন্তু মানসিক শক্তি বর্ধিত হতে পারে না, মেধার বিকাশ হতে পারে না। ময়লা দুর্গন্ধ এলাকায় বসে কুচিন্তা, কু-মতলব করা যায়, কিন্তু সুচিন্তা, কল্যাণমুখী চিন্তা করা যায় না; এমনকি নিবেদিত প্রাণে আল্লাহ্‌র নামও নেয়া যায় না। তাই সারা জাতিটাকে ময়লা মুক্ত করতে হবে, দুর্গন্ধমুক্ত করতে হবে, দূষিত পরিবেশ-মুক্ত করতে হবে। এই জন্য কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট নয়, শ্রীবৃদ্ধি করণও প্রয়োজন। সারা দেশের শ্রীবৃদ্ধিকরণ আমাদের কার্যক্রমে স্থান পেয়েছে; কিন্তু

www.pathagar.com

একসাথে সারাটা দেশকে তো আর সুন্দর, সুশোভিত করা সম্ভব হবে না। দেশের ৮০/৯০ শতাংশ লোকের তো সৌন্দর্য জ্ঞানই নেই, সুন্দর পরিবেশের স্পষ্ট ধারণাও নেই, এমনকি শৃংখলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণাই নেই।

শ্রীবৃদ্ধিকরণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-শৃঙ্খলারই একটি লক্ষ্য। তাই সারা দেশটাকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত করার উদাহরণের, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। সেই দৃষ্টান্ত যথার্থভাবেই শুরু হয়েছে ঢাকা মহানগরী থেকে। আমার বিশ্বাস, ঢাকা মহানগরী আমাদের প্রস্তাবিত ভূমি বিপ্লবের মাধ্যমে, "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" মাধ্যমে, সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারবে। ঢাকা মহানগরীই হবে বিশ্বের সর্বপ্রথম মহানগরী, যেখানে প্রত্যেকটি বৃক্ষই পরিকল্পিত ভাবে লাগানো, প্রত্যেকটি বৃক্ষই ফল উৎপাদক ও সাথে সাথে শ্রীবৃদ্ধিকারক। সারাটি মহানগরীর সমস্ত ভূমিই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত, সমস্ত ভূমিই সব্জি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃহৎ বৃক্ষের ফল ও ফুলে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ সমস্ত ভূমিই মানুষের হাতের স্পর্শ-ধন্য।

ভূমি বলতে আমরা অবশ্যই পানিকে বাদ দেইনি। মহানগরীর যেখানেই যতো জলাশয় আছে সমস্তই ন্যূনতম সংস্কার করে পানি সম্পদে পরিণত করতে হবে। লালন করতে হবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, অন্যান্য লাভজনক জলীয় প্রাণী ও বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ও পানির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করার জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিক্ষিত যুবকগণকে ফল-ফুলের নার্সারী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞকে মৎস্য নার্সারীর জন্য পুঁজিগত ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দিতে হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ও পানি মালিকের স্বার্থ রক্ষা করে উন্নয়ন বাধ্যতামূলক করে নিতে হবে। গণকল্যাণমুখী এরূপ আইন দেশের জনগণের সমর্থন অবশ্যই লাভ করবে। তিলোত্তমা ঢাকাকে "তিলোত্তমা ঢাকা মহানগরী" করে গড়ে তুলতে হবে। পুরস্কার তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সরকারের এগিয়ে যেতে হবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। অবাঞ্ছিত অপচয় বন্ধ করে একাজ সম্পাদন করতে পারলে জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে এই অবদান স্মরণ করবে। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে এই অবদান।

একই সময়ে "তিলোত্তমা ঢাকা মহানগরী"র সাথে পাল্লা দিয়ে দেশের সকল শহরও একই প্রক্রিয়ায় তিলোত্তমা শহরে পরিণত করতে হবে। তখন গ্রামাঞ্চলের জন্য আর বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। অনুকরণশীল মানুষ লাভজনক ও সুন্দর কাজের অনুকরণ করবেই। কেবল প্রযুক্তিগত উপকরণ, উপাদান ও সাহায্য দিলেই যথেষ্ট হবে।

www.pathagar.com

১৩ ঃ বৃক্ষ বিপ্লব

১৩·১ ঃ ভূমিকা

সৃষ্টির অসংখ্য রহস্যের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য রহস্য হলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের প্রাধান্য। মাটিতে গজায় উদ্ভিদ। আর সেই উদ্ভিদেরই ফল হলো মানুষের খাদ্য। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপাদিত খাদ্যের মধ্যে তারতম্য অনেক। মানুষের প্রধান খাদ্যের মধ্যে কোন এলাকায় বেশী জন্মায় ধান, কোন এলাকায় গম, কোন এলাকায় আলু, কোন এলাকায় ভুট্টা। ফলের মধ্যেও দেখা যায় সেই তারতম্য। কোন কোন এলাকায় আম-কাঁঠালের প্রাচুর্য্য, কোন এলাকায় আপেল-বাদাম-আঙ্গুর, কোন এলাকায় কমলা-মাল্টা, কোন এলাকায় আনারস-কলা, কোন এলাকায় ডুরিয়ন, ম্যাঙ্গোষ্টিন, রাম্‌বুথন। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে যে এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, সৃষ্টিকর্তা সে এলাকায় সেই খাদ্য সহজে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বাংলাদেশে আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা সহজেই জন্মায়, কিন্তু আপেল, বাদাম, আঙ্গুর জন্মানো সুকঠিন। তেমনি যে দেশে আঙ্গুর বাদাম অতি সহজে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় সে দেশে আম কাঁঠাল উৎপাদন করা খুবই কঠিন।

তাই মানুষের উচিত, যেখানে যে খাদ্যদ্রব্য সহজে উৎপাদিত হয়, সেটার আবাদেই মনোনিবেশ করা। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র একটি দেশে তাই সেই সব খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপরই গুরুত্ব দেয়া উচিত, যেসব এখানে সহজেই উৎপাদিত হয়। এটাই হওয়া উচিত আমাদের জাতীয় বৃক্ষনীতি।

তবে সৌখিন ব্যক্তিদের বিনোদনের জন্য এই নীতির ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন উঠেনা। যাদের সামর্থ্য আছে তারা বিনোদনের জন্য বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। দৈবাৎ এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে ফলপ্রসূ কিছু আবিষ্কার হয়েও যেতে পারে। এমন আবিষ্কার আমাদের দেশেও হয়েছে। গম উৎপাদন শূন্যের কোঠা থেকে দশ লক্ষ টনে উন্নীত হয়ে এখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যের স্থান দখল করেছে। এই ভাবে তুলা উৎপাদনেও এক নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট বৃক্ষ নিয়ে আলোচনা করবো। সংগত কারণেই বৃক্ষ বলতে আমরা ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষকেই অগ্রাধিকার দিবো। কারণ খাদ্যের ঘাটতি ও দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে ফল উৎপাদন যে বিরাট অবদান রাখতে পারে তার প্রমাণ ইতিপূর্বে দিয়েছি।

আমাদের লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশের যেখানে যে ভূমি অব্যবহৃত আছে এবং সনাতনী চাষাবাদের উপযুক্ত নয়, সেই সমস্ত ভূমিতেই আধুনিক পদ্ধতিতে ফলের চাষ ও সব্জির চাষ করে সেই ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করা। আমরা দীর্ঘস্থায়ী ফলবান বৃক্ষের উপর সংগত কারণেই গুরুত্ব দিচ্ছি সবচেয়ে বেশী। ঐ সব ফলবান

www.pathagar.com

বৃক্ষের মধ্যে আবার আমরা অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করছি বিভিন্ন কারণে। ঐ সব কারণ উল্লেখ করবো যথাস্থানে।

আমাদেরই নির্বাচিত প্রধান কয়েকটি বৃক্ষ রোপণের একটি লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছি এ কারণে যে, লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া পাঠকবর্গের জন্য আমাদের প্রস্তাবনার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিরুপণ করা কঠিন হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করছি না, কারণ সময়সীমা নির্ভর করবে সরকার এবং জনগণ কর্তৃক আমাদের প্রস্তাবনার গ্রহণযোগ্যতার উপর। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১১ কোটি। জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে; আমাদের এই কর্মসূচী যদি সরকার ও জনগণ গ্রহণ করেন তবে এটা বাস্তবায়ন শুরু করতে করতে জনসংখ্যা হয়ত ১২ কোটিতে উঠে যাবে। তাই আমরা আগাম ধরে নিচ্ছি, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলে রাখতে চাই, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটির মধ্যে স্থিতিশীল রাখতে না পারলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিবে। আমরা ধরে নিচ্ছি, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটিতেই স্থিতিশীল হয়ে যাবে।

এইবার আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রধানতম ফলবান বৃক্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ তালিকা পেশ করছি।

www.pathagar.com

১৩·১·০১ঃ কাঁঠাল

আমাদের প্রস্তাবিত বৃক্ষ বিপ্লবে কাঁঠালকে প্রথমস্থান দিচ্ছি বিভিন্ন কারণে। প্রথমতঃ কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দ্বিতীয়তঃ ফল উৎপাদনের তারতম্য হলেও বাংলাদেশের সকল এলাকায় কাঁঠালগাছ জন্মায় এবং স্বাদে গন্ধে পার্থক্য তেমন বেশী নয়। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের ফলবান বৃক্ষের মধ্যে কাঁঠাল গাছের কাঠ সর্বোৎকৃষ্ট। সর্বোপরি, কাঁঠাল এমন একটি বৃক্ষ যার শিকড় থেকে পাতা পর্যন্ত সবকিছুই মানুষের কাজে লাগে।

ফল হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি না থাকলেও বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে কাঁঠাল একটি প্রিয় খাদ্য। ভিটামিন সমৃদ্ধ এই ফল অত্যন্ত পুষ্টিকর। কাঁঠালের বীচি ভাজি করে বাদামের মত খাওয়া যায়। ভাজি করা কাঁঠাল বীচি শিশু-কিশোরদের জন্য বাদামের মতো প্রিয় খাদ্য। ভাজি করা বিচি দিয়ে সুস্বাদু ভর্তা হয়। আলুর মত পাক করলে এই বীচি আবার সুস্বাদু সব্জি। কচি কাঁঠালও উন্নতমানের সব্জি, তাই ঝরে পড়ে-যাওয়া অপরিপক্ক কাঁঠাল পরিত্যজ্য নয়। বিরাট আকারের একেকটি কাঁঠালের পরিত্যক্ত ভুতি গবাদি পশুর, বিশেষ করে দুধেল গাভীর অতিপ্রিয় খাদ্য। কাঁঠাল গাছের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ঝড়ে ভূপতিত হয়ে যাওয়া মস্তবড় বৃক্ষটিকে মাটি নরম থাকা অবস্থায় ঠেলে টেনে দাঁড় করিয়ে কিছুদিন ঠেস দিয়ে রাখলে বৃক্ষটি যেমন সতেজ ছিল তেমনই সতেজ থাকে; আর পরবর্তী বছর সমূহে ফলন হয় বেশী। এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার ঐতিহাসিক ভাওয়াল অঞ্চলে যে চারা বিক্রি হয় তার এক একটির উচ্চতা ৬/৭ ফুট এবং বয়স দুই বছর। এতো উচ্চ চারা বিক্রি করার কারণ হলো ঘেরাও ছাড়াই ঐ চারা লাগিয়ে দিলে গবাদি পশু, বিশেষ করে ছাগল ঐ চারার মাথার কচি পাতাগুচ্ছ খেতে পারেনা। ঐগুলো খেয়ে ফেললে চারাই নষ্ট হয়ে যায়। চারার ডালপালা সযত্নে ছাটাই করে দিলে গাছের কান্ডটি সরলভাবে ১৫/২০ ফুট পর্যন্ত উঠে যায় এবং অত্যধিক ডালপালা হয় না। যেহেতু গাছের গোড়া থেকে শুরু করে সমস্ত কান্ড ভর্তি ফল ধরতে থাকে, সেইহেতু বেশী ডালপালা দিয়ে বেশী ভূমিকে ছায়াযুক্ত করে রাখার কোন যুক্তি নেই। সরল গাছের কান্ডে ফলন হয় বেশী; আর ফলের আকার হয় বড়। প্রতি বছর গাছের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত প্রচুর ছোট ছোট ডালপালা বেরুতে থাকে। এগুলো পশুর, বিশেষ করে ছাগলের প্রিয় খাদ্য। তাই ডালপালা বছর বছর ছাঁটাই করে দেয়াই লাভজনক।

সুবৃহৎ গর্ত করে প্রচুর সার দিয়ে লম্বা চারা লাগালে, এবং কিছুদিন পর পর পরিচর্যা করলে, তৃতীয়/চতুর্থ বছর থেকে ফল উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। ৫ম/৬ষ্ঠ বছর থেকে ফলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। পঞ্চাশ ষাট বছর পর্যন্ত একেকটি গাছ বছরে ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার ফল উৎপাদন করে। আর আয়ুস্কাল শেষে গাছের কান্ডের মূল্য বর্তমান হিসাবে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা হয়। মূল উৎপাটন করে শিকড় জ্বালানী হিসাবে বিক্রী করলে আরো অন্তত ১০০০ টাকা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত করণের কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। থাইল্যান্ডে কাঁঠাল কোষকে জলশূন্য করে ছোট ছোট পলিথিন প্যাকেটে করে বিক্রয় করা হয়। এগুলোকে কাঁঠালের শুঁটকী বলা যেতে পারে। প্যাকেট খুলে কোষের শুক্‌না টুকরাগুলো মুখে দিয়ে চিবুতেই কাঁঠালের আসল স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায়। সেই দেশে কাঁঠালের আইসক্রীম প্রস্তুতও শুরু হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কাঁঠালের জেলী এবং সুস্বাদু পানীয় প্রস্তুত করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রক্রিয়াজাত করা কাঁঠাল, বিশেষ করে জলশূন্য করা কাঁঠাল, মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানীর সুযোগ প্রচুর। এখনই আস্ত ভারী কাঁঠাল মধ্যপ্রাচ্যে বিমানে রপ্তানী শুরু হয়ে গেছে।

আমাদের প্রস্তাব, ঢাকা মহানগরী সহ দেশের সকল আবাসিক বাড়ীতে, অফিস প্রাঙ্গণে, রাস্তার ধারে সর্বত্র কাঁঠালের চারা রোপণ করা হোক। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বারো কোটি ধরে নিয়ে জন প্রতি একটি কাঁঠালের চারা, অর্থাৎ সর্বমোট বারো কোটি কাঁঠালের চারার মধ্যে আট কোটি চারা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে এবং চার কোটি রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে লাগানো হোক।

www.pathagar.com

১৩১০২ঃ আম

আম যদিও বিশ্বের গ্রীষ্ম মন্ডলে উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ শীত প্রধান দেশে উৎপাদিত হয় না, তথাপি একটি অতি উন্নত মানের ফল হিসাবে সারা বিশ্বে এটা সমাদৃত। আম বিভিন্ন মানের, বিভিন্ন স্বাদ- গন্ধের ও বিভিন্ন আকারের। উন্নতমানের আম উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। কারণ এর সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাজার আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরাগায়ণ ও জোড় কলমের মাধ্যমে আমের গুণগত মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বত্রই আম গাছ সহজেই জন্মায়। কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের আম এতোই নিম্নমানের যে, এই আম দেশের অভ্যন্তরেও বাণিজ্যিক বাজার সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে এই নিম্নমানের কাঁচা আম সব্জি হিসাবে কিছুটা বাজারজাত হয়।

কিন্তু রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের আমের মান যথেষ্ট উন্নত। বিশেষ করে চাঁপাই নবাবগঞ্জের ফজলি, ল্যাংরা, গোপাল ভোগ, হিমসাগর, ক্ষিরসাপাত ইত্যাদি উন্নতমানের আমের চাহিদা সর্বাধিক। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের নিকৃষ্টতম আমও ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠতম আমের চেয়ে উন্নতমানের। ঐ দুই বিভাগের যে কোন স্থানের আমই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে রাজশাহীর আম বলে বাজারজাত হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের আম সম্পদ উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। চাঁপাই নবাবগঞ্জের শ্রেষ্ঠতম আম উৎপাদন এলাকায় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পূর্বের এক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একটি উৎকৃষ্টমানের ফল উৎপাদন করে বাংলাদেশের জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় উন্নীত করতে আম এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এর জন্য আবশ্যক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। আমার সুনির্দিষ্ট অভিমত, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সর্বত্র উন্নতমানের আম গাছ লাগানো উচিত। আর সাথে সাথে আম গাছের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে যে অমার্জনীয় গাফলতি চলে আসছে, সেটাকে শক্ত হাতে দমন করে, চারা লাগানো থেকে শুরু করে আম বাজারজাতকরণ ও রপ্তানীকরণ পর্যন্ত উৎসাহ-আগ্রহ সহকারে কার্যসম্পাদন করলে তা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

আমার প্রস্তাব, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা ১২ কোটি ধরে নিয়ে ১২ কোটি নূতন আমগাছ লাগানোর একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা যতশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হউক। আমার প্রস্তাবিত ১২ কোটি নূতন আমগাছের মধ্যে ১০ কোটি আমের চারা রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে এবং ২ কোটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে রোপণ করা যেতে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে উন্নত মানের আমের কলম লাগিয়ে যত্ন করলে প্রথম দিকে ফলন ভালই হয়। তবে অবশ্যই রাজশাহী খুলনার মত স্বাদ গন্ধ ও আকার হয় না। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আমাদের পিতৃ পুরুষের বাড়িতে ৬০/৭০ বছরের প্রাচীন ফজলি ও গোপাল ভোগ গাছে এখনো যে আম ধরে তার বংশ পরিচিতি স্বাদে গন্ধে পাওয়া যায়, তবে পোকার উৎপত্তি ঠেকানো সম্ভব হয়নি। আমাদের বর্তমান

www.pathagar.com

পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে শীঘ্রই ঐ গাছগুলোর মূল উৎপাটন করে নতুন গাছ লাগানো হবে।

আম গাছে প্রচুর ডালপালা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে আমের নিম্নমান হেতু ডালপালা ছাটাই করে জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত থাকবে।

www.pathagar.com

১৩·১·০৩ঃ পেয়ারা

পেয়ারা এখনো ফল হিসাবে আমাদের দেশে তার প্রাপ্য সমাদৃত স্থান লাভ করতে পারেনি। এখনো পেয়ারাকে একটা নিম্নমানের ফল হিসাবে ধরে নেয়া হয় এবং এটা শিশু–কিশোরদের মুখরোচক ফল হিসাবেই গণ্য হয়। তবে কিছুকাল থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, বিশেষ করে আমাদের অন্যতম নিকটবর্তী রাষ্ট্র থাইল্যান্ডের, বিরাট আকারের পেয়ারা দেখে কিছু লোক আকৃষ্ট হন এবং থাইল্যান্ডের পেয়ারার প্রজাতি এদেশে সাফল্যজনক ভাবে উৎপাদিত করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাইল্যান্ডের ঐ বৃহৎ আকারের পেয়ারা সাফল্যজনকভাবে বাংলাদেশে ফলাতে সমর্থ হন। ঐ সময় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন কাজী বদরুদ্দোজা। তাঁরই সম্মানে ঐ বৃহৎ আকারের পেয়ারার নাম দেয়া হয়েছে কাজি পেয়ারা। এখন বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, কাজি পেয়ারার সম্প্রসারণ চলছে।

কাজি পেয়ারার, তথা থাইল্যান্ডের ঐ বৃহৎ আকারের পেয়ারার, আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর ভিতরে বীচি অত্যন্ত কম। গড়পড়তা একেকটি পেয়ারার ওজন ৫০০ গ্রাম বা আধ সের–এর মতো। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখেছি বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বৃহত্তম কাজী পেয়ারার ওজন হয়েছে ১ কেজি।

বাংলাদেশের স্থানীয় পেয়ারার মধ্যেও উন্নতমানের ও বড় আকারের কয়েকটি প্রজাতি আছে, বিশেষ বিশেষ এলাকায়। চট্টগ্রাম থেকে সড়ক ধরে কক্সবাজার যাবার পথে কাঞ্চননগর নামক মৌজার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস হলো পেয়ারা। স্বাদে–গন্ধে আর্কষণীয় লম্বাকৃতির একেকটি পেয়ারার ওজন হয় ২৫০ গ্রাম বা ১ পোয়া। ফলনও প্রচুর। কাঞ্চন নগরের পেয়ারা সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে।

বরিশালের স্বরূপকাঠি উপজেলায় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যে গোলাকৃতি পেয়ারা হয় তারও ওজন প্রায় ২৫০ গ্রাম। স্বরূপকাঠির ঐতিহ্যবাহী নার্সারী সমূহের বদৌলতে ঢাকা মহানগরীতে ঐ পেয়ারাই বিস্তার লাভ করছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চননগরের পেয়ারা কিন্তু এখনো তার এলাকার বাহিরে খুব বেশী সম্প্রসারিত হয়নি।

পেয়ারা উচ্চমানের ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি সুস্বাদু ফল। চিকিৎসা বিজ্ঞানমতে যারা যথেষ্ট পরিমাণ পেয়ারা খান তাদের দাঁতের মাড়ি হয় শক্ত এবং বৃদ্ধ বয়সেও দাঁত নড়ে না। অন্য ফলের মতো কলমের গাছ উন্নতমানের ও অধিক সংখ্যক ফল উৎপাদনকারী। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, বীজ থেকে গজানো চারা গাছের পেয়ারাও মোটামুটি ভালই হয়।

পেয়ারা গাছ দ্রুত বর্ধনশীল, বছরান্তেই ফল দিতে শুরু করে এবং গাছ আকারে ছোট। একেকটি গাছের জন্য ভূমির প্রয়োজন হয় অতি অল্প। আর গাছতলায় আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। গাছের ডালপালা যতখুশী ছেঁটে দিলে অতি দ্রুত গতিতে নূতন ডালপালা জন্মায়, অর্থাৎ ছেঁটে দেয়া ডালপালা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সর্বত্রই পেয়ারা গাছ জন্মায়। তাই এর সম্প্রসারণ সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ নয়। পেয়ারার জেলী ও জ্যাম দেশে বিদেশে সমাদৃত; প্রস্তুত প্রণালীও অতি সহজ। বাংলাদেশের বহু মহিলাই ঘরে ঘরে পেয়ারার উন্নত মানের জেলী জ্যাম প্রস্তুত করেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়ারা উৎপাদন করলে রপ্তানীর লক্ষ্যে জেলী, জ্যাম প্রস্তুত একটি কুটির শিল্প হিসাবে গড়ে উঠবে। কুটির শিল্পে প্রাথমিক প্রক্রিয়ার পর জেলী ও জ্যামকে বৃহত্তর শিল্পে উন্নীত করণ ও মোড়কীকরণ করে দেশে বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বাজারজাত করা যেতে পারে।

এই সব বিবেচনায় আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ১২ কোটি জনগোষ্ঠীর জন্য অতিসত্তর দেশী বিদেশী উন্নতমানের ১২ কোটি পেয়ারার চারা সযত্নে লাগিয়ে এর যথাযথ পরিচর্যা করা হোক। এ সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য রাখবো বৃক্ষরাজির লক্ষ্য মাত্রা আলোচনায়।

www.pathagar.com

১৩·১·০৪ঃ কুল

কুল বা বরই বাংলাদেশের একটি নিম্নমানের ফল। আকারে অতি ছোট, সাধারণত অত্যন্ত টক্। মাঝে মধ্যে দু-চারটি গাছের ঐ ছোট্ট কুল মিষ্টিও হয়। টক্ হোক আর মিষ্টিই হোক, ঐ ছোট্ট কুল ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় খাদ্য। ঐ নিম্নমানের কুলের বাণিজ্যিক প্রচলন নেই বললেই চলে।

কিন্তু একই বংশোদ্ভূত একটু ভিন্ন প্রজাতির নারিকেলের আকৃতি এবং ঐ ছোট্ট কুলের চার/পাঁচ গুণ বড় আকারের সুমিষ্ট যে ফলটি যথেষ্ট জনপ্রিয় তাকে সাধারণত নারকেলি কুল বলা হয়। আকারে বড় সুপারীর মতো, অথবা মধ্যম আমড়ার মতো লম্বা ছোট বীচি যুক্ত এই ফল বাংলাদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট এলাকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং স্বাদে গন্ধে একেক স্থানের ফলের নিজস্ব কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে।

নারকেলি কুলের মধ্যে রাজশাহীর প্রজাতিই সবচেয়ে বেশী সুপরিচিত। শীতের প্রারম্ভেই রাজশাহীর নারকেলি কুল সারাদেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। আধা পাকা কুলই খেতে সবচেয়ে সুস্বাদু। দিনাজপুরের উন্নতমানের কুলও অনেকটা রাজশাহীর কুলেরই মতো, তবে বাজারে এখনো রাজশাহীর কুলের চাহিদাই বেশী।

চাঁদপুর জেলার গোলাকৃতি নারকেলি কুল স্বাদে-গন্ধে রাজশাহী ও দিনাজপুরের কুলের চেয়ে ভিন্নতর। প্রবাদ আছে যে, চাঁদপুরের কোন এক বৃটিশ সাবডিভিশনাল অফিসার এই কুলটির নাম দিয়েছিলেন "চাঁদপুর আপেল"। এই কুলের বীচি অতি ছোট, অর্থাৎ শাঁ এর অংশ বেশী। এই কুল পেকে লালচে হবার পূর্বেই খাবার জন্য সর্বোকৃষ্ট। পেকে যতো বেশী লাল হবে তার স্বাদ ততোই কমবে।

পূর্বেই বলেছি, নিম্নমানের ছোট কুল সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে, আর উচ্চমানের নারকেলি কুল মাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমিত আছে। কুলের একটি বৈশিষ্ট হলো, নিম্নমানের গাছের ডাল কেটে ফেলে কান্ডের মধ্যে উন্নতমানের কুড়ি সংযোজন করে দিলে অতি সহজেই নিম্নমানের গাছে উন্নতমানের অংকুর গজিয়ে উঠে এবং বছরান্তেই উন্নত মানের ফল দিতে থাকে।

এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সুপরীক্ষিত। একটি গাছে দু-তিন প্রজাতির অংকুর লাগিয়ে একই গাছের ভিন্নভিন্ন ডালে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উন্নতমানের কুল উৎপাদন সম্ভব। অর্থাৎ একই গাছে বিভিন্ন প্রকার ফল। এটা যেন এক রহস্য।

পরিতাপের বিষয়, সুদীর্ঘকাল থেকে এই পদ্ধতি সাফল্যজনকভাবে পরীক্ষিত হওয়া সত্বেও বাংলাদেশে এখনো নিম্নমানের কুলগাছই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আর উন্নত মানের কুলগাছ মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিত হয়ে আছে। এক থেকে তিন বছরের মধ্যে সারাদেশের সর্বত্র অংকুরিত কলম প্রথায় উন্নতমানের কুল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন অতি সহজ। আমার প্রস্তাব, জরুরী ভিত্তিতে এই কার্যক্রমটি তিন বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হোক। এবং দেশের প্রত্যেক বসতবাড়িতে অন্তত ১টি উন্নতমানের কুল গাছ লাগানো হোক।

www.pathagar.com

১৩·১·০৫ ঃ নারিকেল

অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিক দিয়ে নারিকেল আমাদের তালিকায় প্রথম স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু পাম জাতীয় ফলের ব্যবহার পদ্ধতি একটু ভিন্নতর বলে আমরা নারিকেল, তাল, খেজুর ও সুপারীকে ভিন্নতর করে একের পর এক স্থান দিচ্ছি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে নারিকেল এমন একটি অবদান রাখতে পারে যা অনেকেই হয়তো চিন্তা করেননি। নারিকেল বাংলাদেশের সর্বত্রই জন্মায়, যদিও দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফলন হয় অনেক বেশী। পাম জাতীয় ফল (নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারী) এই সবের প্রধান বৈশিষ্ট হলো, ভূমির প্রয়োজন হয় সবচেয়ে কম, আর সেই জন্যই অন্যফলের তুলনায় প্রতিদান পাওয়া যায় অনেক বেশী। এক বিঘা ভূমিতে কমপক্ষে ৬৪টি নারিকেল গাছ সহজেই লাগানো যায়; এবং ভূমির মান ও পরিচর্যার তারতম্যের জন্য ৪/৬ বছরের মধ্যে ফলন শুরু হয়। এরপর ৫০/৬০ বছর পর্যন্ত একটি গাছ থেকে বাৎসরিক ৫০০ থেকে ১০০০ টাকার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। ১ বিঘা থেকে বছরে ৩২ হাজার টাকা থেকে ৬৪ হাজার টাকার নারিকেল বিক্রয় করা যেতে পারে। ঐ ১ বিঘা ভূমিতে নারিকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাথী ফসল হিসাবে পেঁপে এবং তারও ফাঁকে ফাঁকে আদা, হলুদ, এলাচি লাগিয়ে বছরে আরো ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় করা অবশ্যই সম্ভব।

১৯৬৪ সালে ফিলিপাইন দেশে নারিকেলের সাথী ফসল হিসাবে পেঁপে–আদা–হলুদ চাষের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়েছিল। অন্যান্য যেসব দেশে অসংখ্য নারিকেল বাগান দেখেছি তারমধ্যে শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ উল্লেখযোগ্য।

নারিকেলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, যত্ন করে চারা লাগিয়ে প্রথম ৩/৪ বছর মাসে এক/দুই ঘন্টা সময় পরিচর্যায় ব্যয় করলে, পরবর্তী ৫০/৬০ বছর ধরে বাৎসরিক দুবার একেকটি গাছের জন্য মাত্র ১/২ ঘন্টা সময় পরিচর্যায় ব্যয় করলে উপরোক্ত প্রতিদান অবধারিত।

আমাদের দেশে ডাবের পানি পান করে করে নারিকেলের অর্থনৈতিক অবদান কমিয়ে ফেলা হয়। নারিকেল প্রধান দেশ গুলোতে ডাবের পানি আমাদের দেশের মতো এতো জনপ্রিয় নয়। একমাত্র থাইল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য নারিকেল প্রধান দেশে রাস্তার পাশে কচি নারিকেলের স্তূপ দৃষ্টিতে আসেনা। কারণ জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়েছি, পাকা নারিকেলের অর্থনৈতিক অবদান অনেক বেশী; সেইজন্য নিজস্বার্থেই নারিকেল চাষীরা কচি নারিকেল বাজারজাত করে না। নারিকেলের ছোবরা দিয়ে কেবল রশি এবং পাপোষই নয়, আজকাল তো মোটা কার্পেটও তৈরী হচ্ছে। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে 'ফিবরি ফ্লেক্স' নামক যে তোষক তৈরী হয়, সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও দীর্ঘস্থায়ী। আমার নিজস্ব পরিবারে প্রায় ৩০ বছর থেকে ঐ ফিবরিফ্লেক্স এর বিছানা ব্যবহৃত হচ্ছে। ফিবরিফ্লেক্সের তোষক এবং গদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হলে বিদেশ থেকে কাঁচামাল

www.pathagar.com

আমদানী করে আর ফোম তৈরী করতে হবেনা। নারিকেলের ফিবরিফ্লেক্স প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা যাবে। তুলার বিছানা মানুষের গায়ের ঘর্মযুক্ত হয়ে কেবল দুর্গন্ধযুক্তই হয়না, আঠালো ও শক্ত হয়ে যায়। ফিবরিফ্লেক্সের স্বচ্ছিদ্র বিছানায় বাতাস চলাচল করে। সেই জন্য সেটা ঘর্মাক্ত হয়না এবং চেপ্টাও হয় না। প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপাদন হলে ছোবড়া এবং মালা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্প হতে পারে। নারিকেলের পাতা দিয়ে চাটাই তৈরী হয়, আর পাতার শক্ত ডগা হয় উত্তম জ্বালানী।

নারিকেলের শাঁস বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় খাদ্য। প্রোটিন সমৃদ্ধ এই শাঁস দিয়ে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি তৈরী হয়। সর্বোপরি নারিকেল তৈলের আন্তর্জাতিক চাহিদা অপরিসীম। এখনো বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে নারিকেল তৈল আমদানী করা হয়।

আমরা বৃহৎ আকারের নারিকেল বাগানের সুপারিশ করছি না। কারণ নারিকেল উৎপাদনে তেমন কোন প্রযুক্তির আবশ্যকতা নেই। আমাদের লক্ষ্য, দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে নারিকেল এক অতুলনীয় অবদান রাখতে পারে। একজন বেকার যুবক বা যুবতী তার আবাস স্থলে বা বসত বাড়ীতে যদি ১০টি নারিকেল গাছ সযত্নে লালন করে নেয়, তবে সে বছরে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা আয়ের নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে। এমন বহু বসতবাড়ী আছে যেখানে ২০টি নারিকেল গাছ লাগানো তেমন কঠিন নয়। বাংলাদেশের দক্ষিণার্ধে একেকটি নারিকেল গাছ থেকে বছরে এক হাজার টাকা উপার্জন করা সহজ।

বৃহৎ আকারের নারিকেল বাগানের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকারের পারিবারিক বাগান তৈরীকে উৎসাহিত করা উচিত। বাংলাদেশের দক্ষিণার্ধের একেকটি বসতবাড়ীতে ২০ থেকে ১০০ টি নারিকেল গাছ লাগানো অবশ্যই সম্ভব। আর ২০টি নারিকেল গাছ একটি, দুটি এমনকি তিনটি পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত সৃষ্টি করে দিতে পারে।

www.pathagar.com

১৩·১·০৬ঃ তাল

ইংরেজী পাম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দই হলো তাল। কিন্তু ইংরেজী পাম শব্দদ্বারা কোন একটি বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষকে বোঝায় না। ইংরেজী পাম একটি "জেনেরিক" শব্দ। তালগাছ, নারিকেল গাছ, সুপারী গাছ ইত্যাদি যে সকল বৃক্ষ সোজা সরল উঠে গিয়ে মাথায় প্যাতা বিস্তার করে ও ফল ধরে ঐ গুলোকে পাম জাতীয় বৃক্ষ বলে। তাল ঐ রকমই একটি পাম বৃক্ষ।

তবে তাল গাছের প্রাধন বৈশিষ্ট্য হলো, এর কাঠ অত্যন্ত শক্ত, লোহা কাঠের মতই অমর। এই জন্য যেসব এলাকায় তালগাছ জন্মায় সেইসব এলাকায় টিনের ছাদযুক্ত ঘরের বর্গাপেটির জন্য এর চাহিদা সর্বাধিক। মাত্র ২৫/৩০ বর্গফুট ভূমির মধ্যে একটি তালগাছ গজিয়ে উঠে, ৩০/৪০ বছরে পরিপক্কতা লাভ করে। তখন সেই বৃক্ষটির মূল্য অন্তত পাঁচ হাজার টাকা। আর বছর পাঁচ ছয়েক বয়স থেকে বাৎসরিক যে ফল ধরতে থাকে তার মূল্য কমপক্ষে পাঁচশত টাকা। অর্থাৎ প্রতিদানের দিক দিয়ে এর স্থান নারিকেলের প্রায় সমতুল্য। এই বিবেচনায়ই আমরা তালগাছকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কিন্তু তালগাছ দেশের সর্বত্র সমভাবে জন্মায় না। তালগাছ পলিমাটিতে ভাল জন্মায় না। সরকারী পরিসংখ্যান মতে যে সকল জেলায় প্রচুর পরিমাণে তালগাছ জন্মায় সেগুলো হলো বৃহত্তর ফরিদপুর, রাজশাহী, ঢাকা, যশোহর, বরিশাল, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনা, পটুয়াখালী, পাবনা, এবং ময়মনসিংহ।

তালগাছের উৎকৃষ্ট কাঠ ছাড়াও তার আর একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তার শক্ত ডগার মাথার পাখার মত বিস্তৃত পাতা সৃষ্টির এক অনন্য অবদান। ডগাসহ পাতাটিকে ছেটে কাপড়ের পাড় লাগিয়ে দিলেই একটা চমৎকার হাতপাখা হয়ে গেলো। তালের হাতপাখার প্রচুর চাহিদা আমাদের দেশেই আছে। মহিলারা এই পাখার উপর সুন্দর রঙ্গীন চিত্রাংকন করে নিলে বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উন্নত দেশের পর্যটকরা হাতপাখার অভাব অনুভব করে, যখন তারা প্রতি সপ্তাহান্তে সমুদ্র সৈকতে মুক্ত আকাশের নীচে ঘন্টার পর ঘন্টা বিশ্রাম নেয়। সেখানেতো আর বৈদুত্যিক পাখা নেই।

তালের পাতা দিয়ে চাটাই ও অন্যান্য হস্তশিল্প প্রস্তুত করা হয়। তালের ডগার আঁশ দিয়ে যে টুপি তৈরী করা হয়, মজলুম জননেতা মৌলানা ভাসানী আজীবন সেই টুপীই পরতেন।

তালগাছ দেশের সর্বত্র লাগানোর পরামর্শ আমরা দিচ্ছি না। কেবল মাত্র যেসব এলাকায় তালগাছ সহজেই জন্মায় সেই সব এলাকায় সযত্নে রাস্তার কিনার দিয়ে ও অন্য যে কোন স্থানে সারিবদ্ধ ভাবে ৬ ফুট পর পর তালগাছ লাগানোর সুপারিশ করছি।

www.pathagar.com

১৩·১·০৭ঃ খেজুর

সরকারী পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের যেসব এলাকায় খেজুর গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তারমধ্যে প্রধানতম বৃহত্তর জেলাগুলো হলো যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী। এসব জেলার বিশেষ বিশেষ এলাকায় খেজুর গাছ লাগাতে হয় না। পরিপক্ব গাছ থেকে বীজ পড়ে গাছ গজাতেই থাকে। সাধারণত যেসব মাঠ প্রতিবছর বর্ষার পানিতে ডোবেনা সেসব মাটিতেই খেজুর গাছ জন্মায়। জমি চাষ করার সময়ই ঘাসের সাথে খেজুরের চারাও উপড়িয়ে উঠে এবং ফেলে দেয়া হয়। তাই ঐ সব এলাকায় জমির আইলের উপর সারিবদ্ধ খেজুর গাছ থেকে যায়। এগুলো মানুষের হাতে লাগানো নয়। আপনা আপনি গজিয়ে উঠা গাছ।

একটু যত্ন নিলে চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে গাছের মাথা থেকে রস সংগ্রহ শুরু করা যায়। আর সাথে সাথে ফলও ধরতে থাকে। বাংলাদেশের খেজুর নিকৃষ্টমানের হওয়া সত্ত্বেও এখন বাজার সৃষ্টি হয়ে গেছে। একেকটি গাছের ফলের মূল্য ৫০ থেকে ১০০ টাকা। কিন্তু একেকটি গাছ থেকে যে রস পাওয়া যায় তার গড়পড়তা বাৎসরিক আয় অন্তত ২০০ টাকা। অর্থাৎ একেকটি গাছ থেকে বছরে গড়পড়তা ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা আয় হয়। আর এই আয় পাওয়া যাচ্ছে অব্যবহৃত ভূমি থেকে।

খেজুরের রস থেকে যে গুড় তৈরী হয় সেটি উন্নতমানের এবং চাহিদাও প্রচুর। এমনকি ছানার মিষ্টির মধ্যে খেজুরের গুড়ের মিষ্টিই সর্বোৎকৃষ্ট। খেজুর গাছের উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি দুটি কারণে। একটি হলো খেজুরের গুড়ের মান উন্নত, মূল্য যথেষ্ট, চাহিদা ও প্রচুর। উৎপাদন বাড়তে থাকলে দরিদ্র মানুষের সুষম খাদ্যে খেজুরের গুড় এক বিরাট অবদান রাখবে। দ্বিতীয় কারণটি হলো খেজুর গাছের জন্য কোন স্বতন্ত্র ভূমির দরকারই নেই। মাঠের আইল, রাস্তার কিনার দিয়েই খেজুর গাছ জন্মাতে থাকে। আমাদের প্রস্তাব, যেসব এলাকায় খেজুর গাছ জন্মায় সে সব এলাকার প্রত্যেক বসত বাড়ীর অব্যবহৃত স্থানে পাঁচটি দশটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দিলে একটি সম্পূরক খাদ্য ও আয় সৃষ্টি হবে। তবে যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা ঐসব জেলায় বেকার যুবক যুবতীরা মাত্র আধ বিঘা, এমনকি পোয়া বিঘা জমিতে খেজুরের চাষ করলে বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট আয়ের পথ নিশ্চিত হয়ে যাবে। মাত্র ১ কাঠা ভূমিতে ৫ ফুট অন্তর অন্তর এক একটি খেজুর গাছ লাগালে ২৮টি গাছ লাগানো যায়; আর ২৮টি খেজুর গাছ থেকে ৩০/৪০ বছর পর্যন্ত বাৎসরিক ৭/৮ হাজার টাকা নিশ্চিত আয় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মাত্র দুই কাঠা ভূমিতে খেজুর গাছ ও তার সাথী ফসল আদা হলুদ ইত্যাদি লাগালে বাৎসরিক আয় সর্বমোট ২০ হাজার টাকা সুনিশ্চিত।

www.pathagar.com

১৩·১·০৮ঃ সুপারী

সুপারী বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল। সুপারীকে ঠিক খাদ্য বলা যায়না। কিন্তু মুখ রোচক চর্ব্য হিসাবে পান সুপারীর প্রচলন বাংলাদেশে প্রায় সার্বজনীন। গ্রামাঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নের প্রধানতম উপাদানই হলো পান সুপারী। তামাকের অপকারীতা সম্বন্ধে জনগণের উপলব্ধি দ্রুত বেগে বাড়ছে, তাই সিগারেট বিড়িসহ তামাকের প্রচলন ক্রমাগত কমছে, আর সেই স্থান দখল করে নিচ্ছে পান সুপারী। পান সুপারী স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর নয় বিধায় এর প্রচলন বাড়বে বই কমবে না। তদুপরি সুপারীর আন্তর্জাতিক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায়শই সুপারী আমদানী করতে হয়, যদিও রপ্তানীর সুযোগ রয়ে গেছে।

সুপারী যেখানে সেখানে ভাল জন্মায় না। এমনকি একই উপজেলার একাংশে সুপারী ভাল হয় আর অন্য অংশে মোটেই ভাল হয় না। বাংলাদেশের যে সব জেলার বিশিষ্ট এলাকায় সুপারী ভাল জন্মায় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৃহত্তর নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, ফরিদপুর, যশোর ও পটুয়াখালী।

সুপারী একটি অতি উচ্চ ফলনশীল ফসল। এরজন্যে ভূমির প্রয়োজন খুবই কম। যে সব বিশেষ বিশেষ এলাকায় ভাল ফলন হয় সেখানে এক একটি বসতঃবাড়ীতে মাত্র ১০০টি করে সুপারী গাছ লাগিয়ে দিলে বছরে ২০,০০০ টাকার আয় সুনিশ্চিত। আর ১০০টি সুপারী গাছের জন্য মাত্র ৫ কাঠা ভূমির প্রয়োজন। যে কোন বসত বাড়ীর অনর্থকরী আজে বাজে গাছের মূল উৎপাটন করে ২/৪ শত সুপারী গাছ লাগানো অতি সহজ। বেকার যুবক যুবতীরা মাত্র আধ বিঘা ভূমিতে ২০০টি সুপারী গাছ লাগিয়ে এবং মাঝে মাঝে কিছু সাথী ফসল আদা হলুদ ইত্যাদি লাগিয়ে বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকার সুনির্দিষ্ট আয় করতে পারে।

www.pathagar.com

১৩·১·০৯ ঃ কমলা ঃ সাতকরা

কমলা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল। আসলে শীত প্রধান দেশের ফল হলেও নাতিশীতোষ্ণ এলাকার কোন কোন স্থানে কমলা জন্মায়। বাংলাদেশের মাত্র তিনটি জেলার অল্প এলাকায় অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় কমলার চাষ এখনো চলে আসছে। বৃহত্তর সিলেট জেলার উত্তর সীমান্তে, ভারতের পর্বত মালার পাদদেশ দিয়ে যে কমলা ৪/৫ দশক পূর্বে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো তার মান ছিলো অতি উন্নত। এখনো সেই উন্নত মানের কমলা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়নি। কিন্তু স্নেফ অনুপ্রেরণা সহায়তা ও তৎপরতার অভাবে এখন বাংলাদেশের বাজারে সিলেটের কমলা নামে পরিচিত যে ফলটি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই সীমান্তের ওপার থেকে আমদানীকৃত।

সরকারী পরিসংখ্যান মতে সিলেট ছাড়াও রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন জেলায় অল্প কিছু কমলা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত জাকিগঞ্জ উপজেলার আটগ্রাম নামক স্থান থেকে দেশের উত্তর সীমান্ত ধরে পশ্চিমমুখী এগিয়ে সিলেট সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই সীমান্ত রেখাটির দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল। এই ১৬০ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত এলাকাই কমলা চাষের উপযুক্ত স্থান। এই সুদীর্ঘ সীমান্ত এলাকা প্রায় জনবসতি শূন্য। ভারতের পর্বতমালার পাদদেশে সীমান্তের ওপারে রাশি রাশি কমলা বাগান আর সীমান্তের এপারে ফাঁকা ভূমির মধ্যে এখানে সেখানে১০/২০টি কমলা গাছ অতীতের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পূর্ণ এলাকায় কমলা চাষ সম্ভব।

সিলেটের বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা উপজেলার বেশ কিছু টিলা ভূমিতে কমলা জন্মাতো প্রচুর। এই এলাকা ও ভারতের করিমগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী। এখানেও ঐ একই অবস্থা; কমলা বাগান মৃত প্রায়। কৃষি সম্প্রসারণের ডিরেক্টর জেনারেল জনাব শহীদুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি উপরোক্ত এলাকাগুলোতে কমলা চাষ সম্ভব।

সরকারী উদ্যোগ অনুপ্রেরণা সহযোগীতা ও প্রযুক্তি পাওয়া গেলে স্থানীয় বেকার যুবকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে এই লাভবান কার্যক্রমে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক ভেলিতে ১৯৬৩ সালে স্বচক্ষে দেখেছি প্রচুর কমলা; সেখানেও নাকি এখন ২/৪টি কমলা গাছ অতীতের স্মৃতি বহণ করছে।

আমাদের দেশে উন্নতমানের কমলা উৎপাদনের প্রচুর ভূমি অব্যবহৃত পড়ে আছে, আর আমরা কষ্টার্জিত অথবা ভিক্ষালব্ধ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে নিম্নমানের কমলা আমদানী করছি, এর কি কোন যুক্তি আছে? আমরা কমলার কোষগুলো খেয়ে তৃপ্তি পাই, আর খোসা বা ছাল ফেলে দেই। এই খোসা বা ছাল দিয়েই প্রস্তুত হয় সারা বিশ্বে প্রচলিত "মার্মালেড"। আমাদের দেশেও অল্প বিস্তর হয়। কেউ হয়তো বলবেন মার্মালেড তো ঘরে ঘরে তৈরী করা যাবেনা। আর কমলার ছালের তো কোন বাজার নেই। কথাটা সঠিক নয়। কমলার ছাল যে একটা অতি উত্তম সব্জি। মাত্র একটি কমলার ছাল টুকরো টুকরো

www.pathagar.com

করে মাছের সাথে পাক করে দেখুন ঝোলের স্বাদ কত বৃদ্ধি পায়, আর একটু ঝাঁঝযুক্ত কমলার ছালটাই কত সুস্বাদু হয়ে যায়। কমলার ছাল রোদে শুকিয়ে মাসের পর মাস রেখে দিন। মাঝে মাঝে অবশ্যই একটু একটু শুকাতে হবে। ছয়মাস পরও সেই শুকনা ছাল মাছের ঝোলের সঙ্গে পাঁক করে নিন। দেখবেন স্বাদে গন্ধে মনে হবে যেন সদ্য আহরিত কমলার ছাল।

সাতকরা একটি লেবু জাতীয় ফল। কিন্তু অন্যান্য লেবুর রসটাই মানুষের খাদ্য, আর সাত করার রসটা অখাদ্য। রস অবশ্য খুব কমই হয়। সাতকরা আকারে ছোট জাম্বুরার মতো। বহিরাবরণ অনেক পুরো। ভিতরের কোষ অত্যন্ত ছোট। সাতকরার বহিরাবরনটিই মানুষের প্রিয় খাদ্য। এর স্বাদ গন্ধ তুলনাহীন। প্রাচীনকাল থেকে সাবেক বৃহত্তর সিলেট জেলা ও আসামের কাছাড় জেলায় কিছু কিছু স্থানে সাতকরা একটি অতিপ্রিয় সব্জি হিসাবে জনপ্রিয় ছিলো। ঝাঁঝ মুক্ত সাতকরার শাঁস দিয়ে উন্নতমানের চাটনীও প্রস্তুত হয়।

এতোদিন ধারনাছিলো সিলেটের বনাঞ্চল, বিশেষ করে উত্তর সীমান্তবর্তী এলাকাই ছিল সাতকরার আবাসভূমি। কিন্তু প্রায় দুই যুগ পূর্বে বন বিভাগের কোন এক কর্মকর্তা এক উল্লেখযোগ্য আবিস্কার করলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে কিছু গাছে ছোট জাম্বুরার মতো লেবু জাতীয় কিছু ফল ঝুলছে দেখে একটি ফল কেটে তিনি তার অভ্যন্তরের অতি ছোট কোষে জিহ্বা লাগাতেই আৎকে উঠলেন। স্বাদ তিতা, কিন্তু ঝাঁঝটি লোভনীয়। কয়েকটি ফল নিয়ে তিনি গেলেন কাপ্তাই। সেখানে কর্মরত সিলেটের কয়েকজন লোক ফলটি দেখে উল্লাসে ফেটে পড়লেন। এটাতো তাদের প্রিয় ফল সাতকরা। তখন থেকে সেই জংলী সাতকরা কাপ্তাই দিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে চলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও ইংল্যান্ডে।

১৯৬৩ সালে আমি যখন একবার কাপ্তাই গিয়েছিলাম, তখন সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল হাদী আমাকে এই তথ্যটি দিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক এখন অসুস্থ অবস্থায় মৌলবী বাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় তার সাবেক বাড়ীতে বাস করছেন।

সিলেটের সাতকরা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও ইংল্যান্ডে। চাহিদা এতবেশী যে মূল্য এখন স্থানীয় মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যেসব ভূমিতে কমলা উৎপাদন হয় সেই ভূমিতেই সাতকরাও উৎপাদন হয়। তাই কমলা উৎপাদনের সাথে সাথে সাতকরা উৎপাদনও লাভ জনক হবে। মাংসের সাথে অল্প সাতকরা পাক করলে ঝোলের স্বাদ বৃদ্ধি পায়, আর সাতকরাও বেশ মজা করে খাওয়া যায়। সাতকরারও একটা বৈশিষ্ট হলো ফলটাকে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে রোদে শুকিয়ে নিন। মাসের পর মাস মাঝে মাঝে দুই একদিন আবার একটু শুকিয়ে নিন, ছয় মাস নয় মাস পর আবার ঝোলের সঙ্গে পাঁক করে নিন। আবার ফিরে আসবে সেই সাবেক স্বাদ গন্ধ।

www.pathagar.com

১৩.১.১০ঃ লিচু

বিশ্বের জনপ্রিয় ফলের মধ্যে লিচু অন্যতম। বাংলাদেশের রাজশাহী ও দিনাজপুরের লিচুর মান যথেষ্ট উন্নত। দেশের আরো কিছু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন স্থানে মোটামুটি চলনসই মানের লিচু উৎপাদিত হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লিচু উৎপাদনের অসুবিধা হলো, এর মৌসুম অত্যন্ত ছোট, আর ফল অত্যন্ত দ্রুত পচনশীল। বিমানে মধ্যপ্রাচ্যে রফতানীর যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিছু কিছু রফতানী শুরু ও হয়ে গেছে। রাজশাহী ও দিনাজপুরে এর ফলন বাড়াবার যথেষ্ট সুযোগ আছে, তবে এর জন্য চাই সরকারী আগ্রহ অনুপ্রেরণা ও প্রযুক্তিগত সহযোগীতা। এই ক্ষেত্রেও শিক্ষিত বেকারদের উৎসাহিত করলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

১৩·১·১১ঃ বাজ্‌না

অনেক পাঠকই হয়তো বাজ্‌না নামক কোন বৃক্ষের কথা কোনদিনই শুনেননি। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন ঢাকার (বর্তমান মেট্রোপলিটন সিটি এবং আরো ছয়টি জেলা) পুলিশ প্রধান হিসাবে টঙ্গী–জয়দেবপুর–শ্রীপুর হয়ে অত্যন্ত খারাপ রাস্তাদিয়ে কাপাসিয়া যাবার পথে দুটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। একটি হলো যেখানেই পুকুর খনন করা হচ্ছে, সেখানেই বেরিয়ে আসছে কয়লার মত কালো মাটি। দু'এক স্থানে নেমে মাটি হাতে নিতে মনে পড়ে গেলো ১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জের হাওরে দেখেছিলাম সেই মাটি। ঘনত্ব কম, ওজনও কম। অনেক পরে জানতে পারলাম এটাই হলো "পীট"। এই সম্বন্ধে পরে বলবো। কারণ এটাও বাংলাদেশের একটা অপব্যবহৃত সম্পদ। রাস্তাদিয়ে এগিয়ে যেতে বৃক্ষরাজীর মধ্যে দেখি কাঁঠালের প্রাধান্য। কিন্তু মাঝে মাঝে এক প্রজাতির বৃক্ষ দেখলাম যা কোন দিনই দেখিনি। আমার সফর সাথীদের কেউই বলতে পারলেন না এটা কি বৃক্ষ। সেদিন সন্ধ্যার পর কাপাসিয়ার অবহেলিত ডাকবাংলোয় বসে স্থানীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, এটা বাজ্‌না গাছ। এতে যে গুটি ধরে সেই গুটি থেকে এলাকার লোক ভোজ্যতৈল প্রস্তুত করেন। তাঁরা সমস্বরে বললেন বাজ্‌না তৈল সরিষার তৈলের চেয়েও উন্নত মানের। দু'একজন আরেক পদ এগিয়ে গিয়ে বললেন, বাজ্‌নার তৈলের মধ্যে খাটি ঘৃতের স্বাদ আছে। গরম ভাতের সাথে একটু লবণ মিশিয়ে খেয়ে নিলে আর মাছ, মাংস, তরিতরকারীর প্রয়োজন হয় না। পরদিনই আমার বাবুর্চি বাজ্‌নার তৈল দিয়ে তরকারী পাক করলো; স্বাদে গন্ধে অবশ্যই উত্তম।

সুদীর্ঘ দিন পর ১৯৮৪ সনে মন্ত্রী হিসাবে যখন কাপাসিয়া যাই, তখনো বাজ্‌না বৃক্ষ ও বাজ্‌নার তৈল সেই ১৯৫৭ সালের অবস্থানেই আছে। আপনা আপনি গজিয়ে উঠা বাজ্‌না গাছ বিরাজ করছে। কেউ সম্প্রসারণের কোন চেষ্টাই করেননি। আর জনগণ সেই আগেরই মতো বাজ্‌নার তৈলকে তাদের প্রিয় ভোজ্য তৈল হিসাবে ব্যবহার করছেন। তবে এইটুকু আশার বাণী পেলাম যে বাজ্‌নার তৈল নাকি বি সি এস আই আর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষিত হয়েছে এবং সদাশয় সরকার বাজ্‌না চাষের বিষয় বিবেচনা করছেন।

বাজ্‌না বৃক্ষ কেবল ভোজ্য তৈলই উৎপাদন করে না; বাজ্‌নার কাঠও নাকি অত্যন্ত উন্নতমানের। কাপাসিয়া ও তৎসংলগ্ন উপজেলায় যে ভূমিতে বাজ্‌না গাছ জন্মায়, বৃহত্তর ঢাকা ময়মনসিংহের সম্পূর্ণ ভাওয়াল গড়ের মাটিতো ঐ একই প্রকার। তাই বাজ্‌নার চাষ সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সদাশয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

১৩.১.১২ঃ বিলিম্বি

বছর চারেক আগে আমার নিজের ঘরে দুপুরে খাবার সময় মাছের ঝোলের মধ্যে কাঁচা টমেটোর মত লম্বাকৃতির একটি সব্জি দেখলাম। মুখে দিয়েই বুঝলাম এটা কাঁচা টমেটো নয়, স্বাদে গন্ধে আরো উন্নত মানের সব্জি। স্বাদটি একটু খানি টক্‌মিষ্টি। জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমার শশুর বাড়ী চট্টগ্রাম থেকে এসেছে এই সব্জি, যার স্থানীয় নাম বেলেম্বু। আমার আগ্রহ দেখে আমার স্ত্রী একটি চারা সংগ্রহ করে আনলেন এবং সেটা সযত্নে লাগিয়ে দেয়া হলো আমাদের বাসস্থান সংলগ্ন স্থলে। অতি দ্রুত বেগে বাড়তে থাকলো সেই চারা। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫/২০ ফুট উঁচু হয়ে গেলো। গাছের কান্ড ছোট ও সরল, হাল্‌কা সবুজ পাতাগুলো চমৎকার। কেবল শ্রীবৃদ্ধি করণের জন্যই এই গাছ লাগানো যায়। বছর যেতে না যেতেই গাছের গোড়া থেকে উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ কান্ডে বেরিয়ে আসলো থোকা থোকা ছোট ছোট ফল। দেখতে অনেকটা পটলের মতো, কিন্তু আকারে ছোট। বারো মাসই ফল ধরে, প্রতি সপ্তাহে দু'একবার মাছের ঝোলের সাথে এই সব্জির স্বাদ উপভোগ করি।

কৃষি বিজ্ঞানীদের বই পুস্তক ঘাটতে ঘাটতে জানতে পারলাম এই সব্জির নাম বিলিম্বি। আমরা এই বছর আরেকটি চারা লাগিয়েছি এবং সেটাও অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠছে। এতো সহজে উৎপাদন যোগ্য এবং এতো উৎকৃষ্ট এই সব্জি গাছের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

www.pathagar.com

১৩·১·১৩ঃ বৃক্ষ বিপ্লব পরিক্রমা

এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। মনে রাখতে হবে, আমাদের এই আলোচনা বিশেষজ্ঞদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রযুক্তিগত আলোচনা নয়। আমাদের আলোচনা একজন সাধারণ নাগরিকের সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ আলোচনা। কোন্ বৃক্ষের জন্য কোন্ ভূমি উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, কোন্ বৃক্ষের চারা লাগাতে কত বড় গর্ত করতে হবে, কোন্ সার কি পরিমাণ দিতে হবে, কোন্ চারার কি রকম পরিচর্যা করতে হবে, রোগ বালাই দেখা দিলেকি চিকিৎসা করতে হবে, ঐ সব বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। আজকাল তো উপজেলায় ও বিশেষজ্ঞ আছেন। তাদের সহযোগীতা চাইলে অবশ্যই পাওয়া যাবে, না পেলে পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের পথ ও পদ্ধতি দেখাতে গিয়ে অপচয়কৃত অব্যবহৃত ভূমির "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" রূপরেখা কেবল এঁকে দিয়েছি।

আমরা পুনরুক্তি করছি, যে ফলবান বৃক্ষ যেখানে সহজে জন্মায়, সেটার চাষ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে উপরে বর্ণিত বৃক্ষরাজী ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত ফলবান বৃক্ষ মানুষের সুষম খাদ্যের সহায়ক। তাই আমরা দেশের জনগণকে অনুরোধ করবো প্রত্যেক পরিবারে অন্ততঃ একটি করে বেল, আমড়া, জাম্বুরা, কাগজি লেবু, কদবেল, জামরুল, আতা, শরিফা, সফেদা, কামরাঙ্গা, ডালিম, সজনা, জলপাই, আমলকি, গাব, তেঁতুল, চালতা ইত্যাদি গাছ সযত্নে লাগিয়ে একটু পরিচর্যা করুন। আপনার বাড়ীর জরাজীর্ন, আয়ুস্কাল উত্তীর্ণ, অনর্থকরী গাছপালা, ঝোপঝাড় ক্রমে ক্রমে কেটে কেটে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করুন। তাছাড়াও অন্য যে কোন ফলের চারা আপনি লাগাতে পারেন। দেখবেন এইসব ফলের গাছ আপনার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এক বিরাট অবদান রাখবে।

www.pathagar.com

১৪ঃ তৃণ, গুল্ম, সব্জি

১৪·১ঃ বাঁশ, বেত, মুরতা

বাঁশ যদিও তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, তবু কার্যক্ষেত্রে বাঁশ বৃক্ষেরই সমতুল্য। সকলেই জানেন বাংলাদেশে বিভিন্ন মানের ও বিভিন্ন নামের বাঁশ আছে। আমরা এখানে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের উদ্দেশ্যে যে আলোচনা করছি, সে আলোচনায় বাঁশের গুণগত মানগত দিক প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। সকলেই জানেন বাংলাদেশের গণজীবনে বাঁশের অবদান কতবেশী। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় এদেশের জনগণের জন্য বাঁশের যত প্রয়োজন, অন্য কোন উদ্ভিদেরই তত প্রয়োজন নয়। গ্রামাঞ্চলের লোকজনের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজে বাঁশের প্রয়োজন হয়। এমনকি শহরাঞ্চলেও বাঁশের প্রয়োজন খাটো করে দেখা যায় না।

বাঁশকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটিকে বলা হয় জাতি বাঁশ, যা আকারে বড় লম্বায় দীর্ঘ এবং বেশ শক্ত। যে কোন ভারী কাজে এই জাতি বাঁশেরই আবশ্যক হয় বেশী। কুঁড়ে ঘরের খুঁটি দেয়া হয় জাতি বাঁশ দিয়ে, লতা জাতীয় তরিতরকারীর মাচানের খুঁটিও দিতে হয় জাতি বাঁশ দিয়ে, দালান নির্মাণের অস্থায়ী সিড়ি ও মাচান করতে ও লাগে এই জাতি বাঁশ। দ্বিতীয় জাতের বাঁশকে বলা হয় মূলী বাঁশ। এগুলো আকারে ছোট, দৈর্ঘ্য কম, মজবুত ও কম। কুঁড়ে ঘরের ছাউনির নিচে রোয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয় মূলী বাঁশ, লতা জাতীয় তরিতরকারীর মাচানের উপরে বসানো হয় এই মূলী বাঁশ।

গবাদি পশুর উপদ্রব ঠেকাতে যে ঘেরাও দেয়া হয় তাতে সাধারণত জাতি ও মূলী বাঁশ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বাঁশ ছাড়া বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন কর্মকান্ড অচল হয়ে পড়বে।

এখন কিন্তু বাঁশের সবচেয়ে বড় যে চাহিদা দেখা দিয়েছে, সেটি হলো কাগজ কলের অত্যাবশ্যকীয় কাঁচা মাল বাঁশ। বাঁশের ঘাটতির জন্য কাগজের কল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে কাগজ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমরা রফতানী করতাম, সেই কাগজ এখন আমদানী করতে হচ্ছে। দেশকে কাগজে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে, প্রতিষ্ঠিত কাগজের কলগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ বাঁশ সরবরাহ করতে হবে; আর নতুন কাগজের কল স্থাপনের জন্য আরো বাঁশ চাষের প্রয়োজন হবে।

দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" প্রক্রিয়ায় বাঁশ উৎপাদন একটি সহজ ও প্রচুর সম্ভাবনাময় কার্যক্রম। বাংলাদেশের সর্বপ্রকার মাটিতেই বাঁশ জন্মায়। কিন্তু ভূমির স্বল্পতা হেতু আমরা যে পরিকল্পনা দিচ্ছি, তাতে অন্য কোন উৎপাদনশীল কার্যক্রমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, দেশে প্রচুর বাঁশ উৎপাদন করা সম্ভব।

আমাদের পরিকল্পনায় আছে দেশের সকল রাস্তা এবং খালের কিনার দিয়ে বাঁশ লাগানোর কর্মসূচী। কোথায় জাতি বাঁশ লাগানো হবে, আর কোথায় মূলী বাঁশ, এসব নির্ভর করবে কোথায় কোনটা ভাল জন্মায়। আমরা যা চাচ্ছি সেটা হলো প্রত্যেক রাস্তার

www.pathagar.com

ঢালু কিনারার নিচের দিকে সারিবদ্ধ ভাবে যথেষ্ট ফাঁক রেখে রেখে লাগানো হবে এক একটি বাঁশের চারা। বাঁশ তো বারে বারে লাগাতে হয় না। একটি চারা থেকেই প্রতি বছর নূতন চারা গজিয়ে গজিয়ে ফাঁক ভর্তি হয়ে যায়।

বাঁশের নীচের ভূমিতে সারিবদ্ধ ভাবে লাগানো হোক উন্নত মানের বেত ও মুরতা। এই দুটি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদও বাংলাদেশের সমাজ জীবনের অত্যাশ্যকীয় উপাদান। মুরতার বেত দিয়ে স্বল্পস্থায়ী গিট দেয়া হয়, আর উন্নত মানের বেত দিয়ে দীর্ঘ স্থায়ী গিট দেয়া হয়। উন্নতমানের বেতের আসবাবপত্র বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক স্থায়ী অবস্থান গেড়ে ফেলেছে। প্রথমে সিলেট জেলা থেকে শুরু হলেও এখন বেতের আসবাবপত্র সারা দেশেই প্রচলিত। বিদেশেও বেতের আসবাবপত্রের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কিন্তু উন্নতমানের বেতের অভাবে এই কুটীর শিল্পের সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। প্রচুর বেত উৎপাদন হলে রফতানী মুখী কুটীর শিল্প গড়ে তুলে গ্রামীণ যুবক যুবতীদের বিপুল ভাবে কুটীর শিল্পে নিয়োজিত করা যাবে।

মুরতা ফলানো অতি সহজ। রাস্তার কিনারের নিম্নতম লাইন ধরে মুরতার চারা লাগিয়ে দিলেই হলো। দ্বিতীয় বছর থেকেই পরিপক্ক মুরতা পাওয়া যাবে।

মুরতা বেতের পাটি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয় আসন। মাটিতে হোক, বা খাটের উপর হোক, পাটি বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে বসা একটুখানি আভিজাত্যের পরিচায়ক।

আজকাল কিছু কিছু কারুকার্য খচিত হস্তশিল্পে মুরতা বেতের পাটি ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। বিশ্বের শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা কৃত্রিম জিনিস ব্যবহারের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। কৃত্রিম আঁশের জিনিসের পরিবর্তে প্রাকৃতিক আঁশের জিনিস তাঁরা বেশী পছন্দ করে। সেই জন্যই বাঁশ, বেত, মুরতা সম্ভাবনা প্রচুর।

তাই আমরা দেশবাসীর কাছে আবেদন রাখবো, সারাদেশে সকল রাস্তা এবং সকল বাঁধের দু'পাশের নিম্ন সীমা দিয়ে স্থায়ীভাবে বাঁশ বেত ও মুরতা লাগানোর সহজ ও লাভজনক কার্যক্রম গ্রহণ করুন। তবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত করাতে হবে ভূমিহীন মানুষদের দিয়ে, এক একটি ভূমিহীন পরিবারকে এক একটি পরিমিত এলাকা ইজারা দিয়ে।

www.pathagar.com

১৪·২ ঃ পেঁপে

পেঁপে একটি ফলবান গুল্ম। এর আয়ুস্কাল এক বছর। এক বছরের পর একটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখলে ফলের সংখ্যা ও মান কমতে থাকবে। সেই জন্য বৎসরান্তে প্রতিটি গাছের মূল উৎপাটন করে এক ফুট খানেক দূরে নূতন গাছ লাগিয়ে দিতে হয়। আমাদের দেশে পেঁপে বছরের যে কোন সময়ই লাগানো যায়। তবে শীতের প্রারম্ভে লাগালে প্রথমদিকে চারার বাড়তি কম হয়। আবার প্রচুর বৃষ্টির সময় লাগালে চারা বেশী লম্বা হয়ে যায়। তখন ফল হয় ছোট।

বাংলাদেশে খুব কম ফলই সারা বছর ধরে পাওয়া যায়; পেঁপে তার অন্যতম। পেঁপেই বোধ হয় একমাত্র ফল যা কাঁচা অবস্থায় সব্জি হিসাবে এবং পাকা অবস্থায় ফল হিসাবে প্রায় সমভাবে সমাদৃত।

আমাদের দেশী পেঁপের একটি বিরাট সমস্যা হলো চারার এক অনির্দিষ্ট অংশ পুরুষ চারা আর অন্য এক অনির্দিষ্ট অংশ স্ত্রী চারা। পুরুষ চারায় ফল ধরে না বললেই চলে। কোন্‌টা পুরুষ বুঝার উপায় নেই ফুল না ধরা পর্যন্ত। ১০টি চারা লাগিয়ে দেখা গেলো ৮টি চারাই পুরুষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৩/৪ মাসের যত্ন বিনষ্ট হয়ে গেলো। কয়জনই বা আবার ঐ স্থানে নূতন করে চারা লাগাবে? অন্যদিকে, এমনও হয় ১০টি চারাই স্ত্রী চারা হয়ে গেছে। তখনও বিরাট সমস্যা। অন্তত একটি পুরুষ চারা কাছাকাছি না থাকলে পরাগায়নের অভাবে এই স্ত্রী চারাগুলোতেও ভাল ফলন হয় না।

আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের পরামর্শে তাই আমরা একটি টিবিতে তিনটি করে চারা রোপণ করতাম; অর্থাৎ ১০টি পেঁপে গাছের জন্য ৩০টি চারা রোপণ করতে হতো। চারায় ফুল আসলে পর একটি মাত্র পুরুষ চারা রেখে বাকী পুরুষ চারাগুলো উৎপাটন করে ফেলে দিতে হতো। স্ত্রী চারাও প্রতি টিবিতে একটি করে রেখে বাকীগুলো উপড়ে ফেলে দেয়া হতো।

থাইল্যান্ডের কৃষি বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরাগায়ন করতে করতে তারা এখন এমন প্রজাতির পেঁপে উদ্ভাবন করেছেন যে একই চারা গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুলের সহ অবস্থান ঘটে। তাই একটি চারাও এখন আর ফেলে দিতে হয় না। প্রায় ৭ বছর থেকে আমি থাইল্যান্ডের এই প্রজাতির পেঁপে প্রতি বছরই ২/৪টি লাগাচ্ছি। প্রত্যেকটি চারাই ভাল ফল ধরে।

থাইল্যান্ডের এই প্রজাতির পেঁপের আর একটি বৈশিষ্ট হলো পেঁপে আকারে অনেক বড়, এবং শাঁসের রং টুকটুকে লাল। আমাদের দেশীয় পেঁপের মত ফ্যাকাশে হলদে নয়।

এক একটি পেঁপে গাছের জন্য ভূমি প্রয়োজন হয় চূড়ান্ত ৪০ বর্গফুট। আর এই ৪০ বর্গফুট ভূমির মধ্যে প্রতি বছর এক একটি পেঁপে গাছ থেকে অন্তত ৫০০ টাকার পেঁপে পাওয়া যায়। অবশ্যই পূর্ব শর্ত হলো চারাটি যত্নকরে লাগাতে হবে, আলো-বাতাস পেতে হবে, আর অন্য গাছের ছায়া ঘেরা স্থানে হবে না। বাণিজ্যিক হারে যত্ন করে

www.pathagar.com

লাগালে ও পরিচর্যা করলে ১ বিঘা ভূমি থেকে বছরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকার পেঁপে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও সাথী ফসল হিসাবে অন্তত ১০হাজার টাকার সব্জি উৎপাদন ও সম্ভব।

আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, বাংলাদেশে জন প্রতি ১টি করে বাৎসরিক ১২ কোটি পেঁপের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করা হোক। এতো সহজে এত প্রচুর পরিমাণে এবং এতো উন্নত মানের খাদ্য উৎপাদনের আর দ্বিতীয় কোন পথ আছে বলে আমার মনে হয় না।

এক একটি পরিবারে নিজ নিজ আবাসের আশে পাশে ১০/১২টি করে পেঁপে গাছ রোপণ করলে অনায়াসে বছরে ৫০০০ টাকা বাড়তি আয় হবে।

www.pathagar.com

১৪.৩ ঃ কলা

কলাও একটি আন্তর্জাতিক সমাদৃত ফল। উষ্ণ দেশের ফল হলেও এর বাজার সারা বিশ্বে বিস্তৃত। আমাদের দেশে অমৃত সাগর বা সাগর কলা ছাড়া আর একটি উন্নত মানের কলা আছে। সেটি হলো সবরী কলা। নিম্নমানের বিভিন্ন প্রজাতির কলা সারাদেশের প্রায় সর্বত্র ফলালেও বাণিজ্যিক হারে কলা চাষের এলাকা খুব ছোট।

কলা একটি পুষ্টিকর খাদ্য বিধায় আমরা প্রস্তাব করছি, যেখানেই যে জাতের কলা সহজে জন্মায়, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে সেই কলা ফলানো উচিত। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের বৃহত্তর জেলা গুলোর মধ্যে বরিশালেই কলার চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। অথচ বরিশালে সাগর কলা জন্মায় না। সেখানে সবরি কলা জন্মায় বেশী। সাগর কলার উৎপত্তি স্থল হলো মুন্সিগঞ্জের রামপাল। এখন নরসিংদি এলাকায় ভাল সাগর কলা জন্মাচ্ছে। যেসব এলাকা সাগর কলার জন্য উপযুক্ত সেই সব এলাকায় সাগর কলা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন খুবই লাভজনক। সবরী কলার বেলায়ও একথা খাটে।

দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের লক্ষ্যে প্রত্যেক যুবক যুবতীর কলা গাছ লাগানোর পদ্ধতি ও পরিচর্যা শিখে নেয়া উচিত। সনাতনী পদ্ধতিতে ফলন ভাল হবে না, তাই লাভও কম হয়।

একটি কলা গাছে মাত্র একবারইতো ফল ধরে। কলার ছড়ার শেষাগ্রে যে থোরটি থাকে সেটি একটি উৎকৃষ্ট সবৃজি। ফল পেকে গেলে কেটে নেয়ার সাথে সাথে গাছটিও কেটে ফেলতে হয়। গাছের অভ্যন্তরে সাদা নরম ছোট বাঁশের মত যে দন্ডটি থাকে সেটিও একটি উন্নতমানের সবৃজি। মূল গাছের গোড়ায়ও যথেষ্ট পরিমাণে নরম শাঁস থাকে। এগুলোও উত্তম সবৃজি। মূল গাছের চতুর্পাশে যে সব চারা গজিয়ে ওঠে, তার মধ্যে মাত্র ১টি চারা রেখে বাকী গুলো নুতন স্থানে রোপণ করলে উন্নত মানের ফলন হয়। কলা গাছে সার দিতে হয় প্রচুর। আর ২/৩ বছর পর পর স্থান পরিবর্তন করতে হয়। তবে এটা অবশ্যই একটি লাভজনক ফসল।

www.pathagar.com

১৪·৪· ঃ আলু

মানুষের ৪টি প্রধান খাদ্য হলো ধান, গম, আলু আর ভুট্টা। পূর্বেই বলেছি আমাদের দেশে গমের উৎপাদন একেবারে শূন্য থেকে এখন বার্ষিক ১০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে। এবং গম এখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য রূপে পরিগণিত হয়েছে। সংগত কারণেই আমরা আশা করবো গমের উৎপাদন ও ফলন ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে।

অন্যদিকে ভুট্টার উৎপাদন বিশেষ বাড়েনি। ১৯৮৭/৮৮ সালে ভুট্টার উৎপাদন ছিল মাত্র ৩ হাজার টনের মতো। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় ভুট্টা উৎপাদন সবচেয়ে সহজ। বসত বাড়ির প্রাঙ্গণে ভুট্টার চাষ করলে বছরে তিনটি, এমনকি ৪টি, ফসলও পাওয়া যেতে পারে। তদুপরি শুকনা মৌসুম ও বর্ষা মৌসুম উভয় মৌসুমেই ভুট্টা ফলানো যায়।

তবে আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় হলো আলু। সারা বিশ্বের শ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যে আলুর জনপ্রিয়তা বেশী। বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই যেখানে আলু মানুষের অন্যতম খাদ্য হিসাবে ব্যহৃত হয় না। আলু একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। প্রধান ৪টি খাদ্যের মধ্যে আলুই একমাত্র খাদ্য যেটা সব দেশেই প্রধান খাদ্য হিসাবে এবং সব্জি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। শ্বেতাঙ্গ লোকেরা ম্যাশ্‌ড্ পটেটো বা আলু ভর্তা খায় প্রধান খাদ্য হিসাবে; সিদ্ধ করা আলু খায় সব্জী হিসাবে; আর আলু ভাজি খায় মুখরোচক খাদ্য হিসাবে। বিভিন্ন পন্থায় ভাজি করা আলুর প্যাকেটের প্রচলন খুব বেশী। আমাদের দেশে আলুর উৎপাদন বছর বছর ধীরে ধীরে বাড়ছে। ১৯৮৭/৮৮ সালে গোল আলু উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ্য টন। আর মিষ্টি আলু প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন। এই দুই প্রকারের আলুর উৎপাদন বাড়িয়ে দ্বিগুণ, এমনকি তিনগুণ করা কঠিন নয়। এতোদিন আলুর চাহিদা কম থাকায় মূল্য ছিলো খুব কম। এখন চাহিদাও বাড়ছে, মূল্যও বেড়ে গেছে। তাই গোল আলু এবং মিষ্টি আলু উৎপাদন বাড়ানোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।

আলু উৎপাদনের প্রথম সমস্যা হলো বীজের অভাব। প্রতি বছরই বীজের অভাবের অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবু বীজের অভাব একটি বাৎসরিক সমস্যা। কৃষি মন্ত্রণালয় অচিরেই এই বাৎসরিক সমস্যার সমাধান করার নিশ্চয়তা না দিলে চাষীরা কি ভরসায় আলুর চাষাবাদ বাড়াবে? আলুর দ্বিতীয় সমস্যা হলো সংরক্ষণ সমস্যা। এই সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হয়েছে হীমাগার স্থাপনের মাধ্যমে। আলু উৎপাদনের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হীমাগারের সংখ্যা বাড়াবার উৎসাহ দিলে বেসরকারী খাতে উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।

১১ কোটি মানুষের জন্য মাত্র ১৮ লক্ষ টন আলু মোটেই যথেষ্ট নয়। এর লক্ষ্যমাত্রা এখনই দ্বিগুণ করে নেয়া উচিত। মানুষের সুষম খাদ্যের জন্য আলু একটি অত্যাবশ্যকীয় ফসল।

দেশের লোকের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে পরবর্তীতে কিছু বক্তব্য রাখবো। এখানে এতটুকু বলে রাখতে চাই যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণে অর্ধেক চাউল বা গম এবং অর্ধেক আলু দেয়ার প্রথা প্রচলন করা উচিত।

www.pathagar.com

১৪·৫ঃ টমেটো

টমেটো শব্দের বাংলা কোন প্রতিশব্দ নেই। "বিলাতি বেগুণ" নামে গ্রামাঞ্চলে পরিচিত হলেও টমেটো আসলে বিলাতিও নয়, বেগুণও নয়। সুতরাং টমেটো শব্দটাকে বাংলা ভাষায় গ্রহণ করে নেয়াই শ্রেয়। টমেটো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সব্জি। আমাদের দেশে টমেটো ঝোলের মধ্যে ব্যবহার করা হলেও শ্বেতাঙ্গ মানুষের দেশে পরিপক্ক টমেটো রান্না না করেই সালাদের মধ্যে স্থান লাভ করে। আমরাও আজকাল ওদের অনুকরণে টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি মিশিয়ে সালাদ খাওয়া শুরু করেছি। সালাদ মানেই হলো বিভিন্ন সবজির মিশ্রিত খাবার। সালাদের মধ্যে বাঁধা কপি, ফুল কপি এবং লতা পাতা যুক্ত শাক স্থান পায় অনেক। সালাদকে সুস্বাদু করার জন্য বোরহানীর মতো গাঢ় মুখরোচক কিছু তরল খাদ্য মিশিয়ে নেয়া যায়। অনেক শ্বেতাঙ্গ মানুষ দুপুর বেলা কেবলমাত্র একপ্লেট সালাদই খায়, অন্য কিছু খায় না। স্বাস্থ্যের জন্য শাক সব্জির অবদান যে কতটুকু এতেই বুঝা যায়।

টমেটোর উপাদেয় খাদ্য হলো আচার, চাটনি এবং রস। টমেটোর বোতল ভর্তি আচার ও চাটনি সারা বিশ্বের সর্বত্রই খাবার টেবিলে স্থান পায়। আর টমেটো জুস্ বা রস অত্যন্ত উপাদেয় পানীয়। টমেটো জুস অতি প্রিয় খাদ্য।

আমাদের দেশে বর্তমানে বছরে মাত্র ৮০,০০০ টন টমেটো উৎপাদন হয়। আর এই অতি অল্প টমেটোর চাহিদাই নেই। তাই মৌসুমের শেষ দিকে টমেটোর মূল্য উৎপাদন খরচেরও নীচে নেমে যায়। উন্নত মানের টমেটোর জুস্, টমেটো সস্ (আচার), টমেটো কেচ্যাপ (চাটনি) উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানী করা কঠিন কাজ নয়। এই শিল্পটিকে অগ্রাধিকার দিলে টমেটোর উৎপাদন বিপুল ভাবে বাড়তে থাকবে। আর তার সাথে বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থান হবে।

www.pathagar.com

১৪৬ ঃ কাকরল

বাংলাদেশের অন্যতম প্রিয় সব্জি কাকরল। এতোদিন পর্যন্ত কাকরলের ফলন ছিল সীমিত। কারণ লোকের একটা ধারণা ছিল যে বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে আগের বছরের কান্ড বা মূল থেকে চারা গজার পর সেই চারার জন্য মাচান তৈরী করে দিয়ে একটুখানি পরিচর্যা করলে চাষীর দায়ীত্ব শেষ। কাকরলের বীজ থেকে চারা ফলানোর প্রথা এখনো প্রচলিত হয়নি। মাত্র কিছুদিন পূর্বে হবিগঞ্জের হরসপুর নামক স্থান থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল এলাকায় এক কাকরল বিপ্লব ঘটেছে। কে এই বিপ্লবের অগ্রদূত, তা এখনো জানতে পারিনি। তবে কাকরল বিপ্লব যে ঐ এলাকায় অর্থনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অল্প কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের পর গ্রামের প্রত্যেক পরিবার বাড়ীর পাশাপাশি যার যেটুকু ভূমি আছে সেই টুকুতেই কাকরল চাষ শুরু করেছে। মূল্যবান বাঁশ ব্যবহার করে বানিয়েছে বিরাট বিরাট মাচান। আর কাকরলের লতা গাছ বেয়ে উঠেছে সেই মাচানের উপর। মাচান থেকে ঝুলছে হাজার হাজার বৃহৎ আকারের কাকরল। প্রথমে ঠেলা গাড়ী, গরুর গাড়ী দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নিকটস্থ বাজারে যেতে থাকে সেই কাকরল। উৎপাদন এতোই বেশী হতে থাকে যে স্থানীয় বাজারে আর কতো কাকরল টানবে। এবার শুরু হয় ট্রাকের মিছিল। ট্রাক ভর্তি কাকরল যেতে থাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট। ঢাকা থেকে বিমানে যেতে থাকে মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু ট্রাকেও যখন সারতে পারছেনা তখন রেল গাড়ীর ওয়াগান ভর্তি করে কাকরল থেতে থাকে দুর দূরান্তরে।

এই কাকরল বিপ্লব সেই এলাকার অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। কাকরলের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শওকত হায়দারের কাছ থেকে যেটুকু তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছি তা হলো, পরিমিত সার প্রয়োগ, আর ফুলের পরাগায়নের মাধ্যমে এই কাকরল বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এই পরাগায়ন প্রথা নাকি স্থানীয় এক গোপন রহস্য। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে অবাক হয়েছি, তারা এই রহস্য ভেদের কথা চিন্তাই করেন না। তাদের ধারণা ঐ এলাকার উপর আল্লার এক রহমত নাজিল হয়েছে। এলাকার লোক সেই রহমতের অংশিদার। প্রকৃত পক্ষে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এই কাকরল বিপ্লব কোন এক অনুসন্ধিৎসু বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তির ধ্যান ধারণা, গবেষণা সাধনার সুফল, যার মধ্য দিয়ে গোটা এলাকার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটছে।

আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে থাকে বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই সেই সব উদ্ভিদ জন্মায়। তাই কাকরলের মতো একটি সুস্বাদু পুষ্টিকর মূল্যবান সব্জির চাষ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সকল অঞ্চলেই এর ব্যাপক চাষ সম্প্রসারণ করা অত্যাবশ্যক। এর ফলশ্রুতিতে সারা দেশে অসংখ্য কৃষক পরিবার "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" সুযোগ পাবে এবং সাথে সাথে দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচন সহজ হবে।

www.pathagar.com

১৪·৭ঃ মাশরুম

ইংরেজী শব্দ Mushroom এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে ছত্রাক। আসলে মাশরুম আর ছত্রাক মোটেই এক জিনিস নয়। ছত্রাক এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Fungus. দেখতে অনেকটা মাশরুমের মতোই, গাছের ছায়ায় পচা আর্বজনার মধ্যে ছাতার মত যে ভুঁইফোড় রাতারাতি জেগে উঠে, আবার একদিনের মধ্যেই ঝরে পড়ে তারই ইংরেজী নাম Fungus, যাকে আমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতা বলা হয়। Fungus বা ব্যাঙের ছাতা আর মাশরুমের মধ্যে পার্থক্য অনেক। আপাত দৃষ্টিতে একই ধরনের বস্তু বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। ফাংগাস নোংরা ময়লা জায়গায় গজিয়ে উঠে এবং এটা ক্ষণস্থায়ী। রাতারাতি নানা রঙের চমৎকার ছাতার মত গজিয়ে উঠলো আর এক/দুই দিন পরই শুকিয়ে ঝরে পড়ে বিলীন হয়ে গেলো এটাই ফাঙ্গাস বা ব্যাঙের ছাতা। এটা মানুষের খাদ্য তো নয়ই, এটা বিষাক্ত; স্পর্শ করার মতোও নয়। আসলে ব্যাঙের ছাতা কেউ স্পর্শ করে না।

অন্যদিকে মাশরুম স্রেফ একটি সব্জি। এর বিভিন্ন জাত আছে; বিভিন্ন আকার আছে। সব্জি হিসাবে মাশরুমের চাহিদা আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশের সকল উন্নত হোটেলে এবং অসংখ্য চাইনিজ রেস্তোঁরায় মাশরুম একটি অপরিহার্য খাদ্য। আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় এই মাশরুম।

বাংলাদেশের আবহাওয়া মাশরুম চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। পরীক্ষা মূলকভাবে ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটস্থ সাভারে মাশরুমের চাষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের বড় বড় শহর ও শহরতলীতে ঘরের আঙ্গিনায় মাশরুম চাষ অত্যন্ত লাভজনক। ১ বর্গফুট জায়গা ব্যবহার করে ১২০ টাকা আয় করা যায়। এটা মহিলারাই অতি সহজে করতে পারেন। তাই আমার মতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, ও ময়মনসিংহ, এসব জেলায় মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলে আগ্রহী মহিলারা অবশ্যই এ সুযোগ গ্রহণ করবেন এবং একটি নুতন আয়ের সূত্র জেগে উঠবে। সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে মাশরুম আমদানী করার আবশ্যকতা আর থাকবেনা।

প্রাথমিক পর্যায়ে শহর ও শহরতলীর মহিলারা মাশরুম চাষ করে প্রচুর লাভবান হতে পারেন। কিছুদিনের মধ্যে মাশরুম চাষ একটি বিরাট উৎপাদনশীল ও রপ্তানীমুখী কার্যক্রমে পরিণত হয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে।

www.pathagar.com

১৪·৮ঃ তৃণ গুল্ম সব্জি পরিক্রমা

এই অধ্যায়ে তৃণের মধ্যে বাঁশ, বেত ও মুর্তা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। গো-খাদ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তৃণ সম্বন্ধে অন্য এক অধ্যায়ে লিখেছি। গুল্মের মধ্যে কেবল পেঁপে ও কলা সম্বন্ধে লিখেছি, কারণ এই দুটি ফসল খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে এবং দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে অতিদ্রুত অবদান রাখতে পারে। সব্জির মধ্যে কেবল মাত্র আলু টমেটো ও কাকরল ছাড়া আর কোন একটির উপরই বিশেষ আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছেনা, পুস্তকের কলেবরের সীমাবদ্ধতার জন্য। তবে প্রত্যেকটি সব্জি, যেমন- সীম,বেগুন, উচ্ছে, করলা, ঢেঁড়শ, পটল, মিষ্টি লাউ, পানি লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, মূলা, শালগম, গাজর, কপি, কচু, পঞ্চমুখী, মেটে আলু, কাঁচকলা, বরবটি, মটরশুঁটি, ইত্যাদির খাদ্যমান ও গুরুত্ব কম নয়। এ ছাড়াও নানা প্রকার শাক যেমন-লাল শাক, পালং শাক, পুঁই শাক, লেটুস্, হেলেঞ্চা, ঢেঁকির শাক, কলমি শাক, পুদিনার শাক, ধনিয়া মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক।

এই পুস্তকে এই সকল সব্জি ও শাকের বিষয় সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই, এই জন্য এগুলো সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই। এইসকল শাক সব্জি আম, কাঁঠাল, কুল, কলা, পেঁপে, ইত্যাদির বাগানে সাথী ফসল হিসাবে ব্যাপক মাত্রায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা সম্ভব।

এই অধ্যায়ে দেশের দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচনের লক্ষ্যে "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" জন্য একটি অত্যাবশকীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। দেশের অধিকাংশ পরিত্যক্ত অবহেলিত অব্যবহার্য ভূমির সদ্ব্যবহারের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা দিয়েছি।

www.pathagar.com

১৫ঃ দারিদ্র বনাম বনায়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আমরা এ পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি, তার মধ্যে "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারই" প্রাধান্য লাভ করেছে। ভূমির সদ্ব্যবহার বলতে আমরা সারা দেশব্যাপী বৃক্ষ রোপণের কথাই বলে আসছি আগাগোড়া। অধিকতর বৃক্ষ রোপণের জন্য অপচয়কৃত অপব্যবহৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অনিষ্টকারী, অনর্থকরী, রোগাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত বৃক্ষ উৎপাটন করে সেই পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি সংস্কার করার পর সেখানে অধিকতর সংখ্যায় ফলবান বৃক্ষের চারা রোপণের জোরালো যুক্তি দিয়েছি। যেখানেই ভূমি অব্যবহৃত, অপব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানেই আমরা জোর দিয়েছি ফলবান বৃক্ষের চারা লাগানোর জন্য। সারা দেশের রেলপথ, রাজপথ, ছোট বড় সকল সড়ক, ছোট বড় সকল বাঁধ এর দুপাশ দিয়ে বৃক্ষরাজী রোপণের এক নূতন পরিকল্পনা দিয়েছি আমরা। ফলবান বৃক্ষ রোপণের এই প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়ে গেলে বনবিভাগের আওতাভুক্ত ভূমি ছাড়া আর সর্বত্র কেবল ফলবান বৃক্ষই থাকবে। আমাদের এই লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্যে।

তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" এই প্রস্তাবনা আসলে সারা দেশব্যাপী ফলবান বৃক্ষ বনায়নেরই একটি ব্যাপক প্রকল্প।

বর্তমানে প্রচলিত বৃক্ষনীতির সাথে আমাদের প্রকল্পের পার্থক্য হচ্ছে মাত্র এইটুকু যে আমাদের প্রকল্পের লক্ষ্য দ্বি-মুখী; ফল উৎপাদন ও বনায়ন। প্রচলিত বৃক্ষনীতির লক্ষ্য শহরাঞ্চলে বনায়ন ও শ্রীবৃদ্ধিকরণ ; আর অন্যত্র বনায়ন ও উন্নতমানের কাঠ উৎপাদন। আমরা শহরাঞ্চলকে শ্রীবৃদ্ধিকরণের সাথে একমত। কিন্তু আমাদের কথা হলো বিদেশী হোক, দেশী হোক, ফলহীন বৃক্ষ দিয়ে শ্রীবৃদ্ধিকরণের সৌখিনতা ভূমি ক্ষুধার্ত বাংলাদেশে সাজেনা। দু-চারটি এলাকায় এই সৌখিনতা করলে হয়তো তেমন মারাত্মক ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমরা মনে করি দেশের অশিক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য কোথাও এমন একটি দৃষ্টান্ত ও স্থাপন করা ঠিক হবেনা, যা তাদের মনকে অনর্থকরী কর্মকাণ্ডের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে, এবং তারা সে উদাহরণ অনুসরণ করে ফেলতে পারে। আমরা সারা দেশের সর্বত্র এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাই, যার আসল শিক্ষা হবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সর্বোচ্চ লাভজনক, খাদ্য উৎপাদনে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সহায়ক, এবং সেই অর্থে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে সরাসরি সহায়ক।

আমরা দেশের সংরক্ষিত, সুরক্ষিত বনাঞ্চল সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবই রাখছিনা। সংরক্ষিত সুরক্ষিত বনাঞ্চলে উন্নতমানের বৃক্ষরাজী সযত্নে লালন পালন আমরা মনে প্রাণে সমর্থন করি। কিন্তু আমরা প্রস্তাব করেছি, বনবিভাগের আওতাভুক্ত যেসব ভূমি বৃক্ষহীন হয়ে পড়েছে, সে সব ভূমিতে নূতন করে বনায়ন প্রক্রিয়ায় ফলবান বৃক্ষের আবাদ করা

www.pathagar.com

হোক। আমাদের মতে লালমাই, ময়নামতি, ভাওয়ালগড় ইত্যাদি বৃক্ষহীন বনবিভাগের এলাকায় ফলহীন বৃক্ষের পরিবর্তে কাঁঠাল বন সৃষ্টি করা উচিত। আমরা আরো প্রস্তাব করছি, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে যদি কোথাও বৃক্ষহীন বনভূমি থাকে, সেগুলোতে উন্নতমানের আমের বন সৃষ্টি করা হোক। আমরা প্রস্তাব করছি, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে সব এলাকায় নারিকেলের ফলন প্রচুর পরিমাণে হয়, সে সব এলাকায় বনবিভাগ নারিকেলের বন সৃষ্টি করুন। আমরা প্রস্তাব করছি, বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত সুন্দর বনের যেখানে সম্ভব সেখানেই ফলের বন সৃষ্টি করুন।

কিন্তু আমাদের মতে দেশের গ্রামে গ্রামে উন্নতমানের কাঠ উৎপাদনের যে প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে, এটা বর্জন করা উচিত। দেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির শতকরা ৮০/৯০ ভাগই আন্তর্জাতিক দারিদ্রের নিম্নতম সীমারেখার নীচে অবস্থান করছে। এই ক্ষুধার্ত মানুষ আজকের দিনের খাবার যোগাড় করতেই ব্যস্ত, আগামীকালের খাবারের ধান্দায় চিন্তাযুক্ত। মাঠের ফসল উঠানোর জন্য একটি মৌসুম অপেক্ষা করার মতো শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও ধৈর্য এদের নেই। এরা একটি পেঁপে গাছ লাগাতে উৎসাহবোধ করেনা, কারণ সেই পেঁপে গাছের ফল পেতে তার ছয় মাস অপেক্ষা করতে হয়। এরা কাঁঠাল, আম, নারিকের, সুপারী গাছ লাগাতে মোটেই আগ্রহী নয়, কারণ ঐসব গাছের ফল পাওয়ার জন্য পাঁচ/ছয় বছর অপেক্ষা করার মতো শারীরিক মানসিক শক্তি ও ধৈর্য এদের নেই। তাই আমাদের মতে মানুষের বসত এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী মূল্যবান কাঠের চারা লাগানো পরিত্যাগ করা উচিত, বর্জন করা উচিত। তার পরিবর্তে অনুপ্রাণিত করা উচিত সেইসব উদ্ভিদের আবাদ শুরু করতে, যে সব উদ্ভিদ ছয় মাসের মধ্যেই, বছরান্তেই কিছু প্রতিদান দিবে। তারই সাথে তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত সেই সব উদ্ভিদের আবাদ করতে, যেসব উদ্ভিদ তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে ফল উৎপাদন করতে থাকবে এবং তারপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত বছর বছর ফল দিতে থাকবে। এই দ্রুত লাভবান কার্যক্রমের প্রতিও মানুষকে আকৃষ্ট করা সহজ হবে না। কারণ মানুষতো পেটের জ্বালায় আজকালের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত।

www.pathagar.com

১৬ ঃ পশু পালন

১৬·১ ঃ ভূমিকা

বাংলাদেশের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে পশু পালন এক অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ঘরে ঘরে পশু পালন এই দরিদ্রতম দেশে প্রত্যেকটি পরিবারের অপরিহার্য্য কর্মসূচী হওয়া উচিত। মাত্র কয়েক যুগ পূর্ব পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের, এমনকি শহরেরও, প্রায় ঘরে ঘরে দুধেল গাভী বা ছাগী পোষা হতো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বিদেশ থেকে গুঁড়ো দুধ আমদানী করে করে দেশে দুধ উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয়ে গেছে। আজ দেশে খাঁটি দুধ নেই বললেই চলে।

দেশের এগারো কোটি মানুষের সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাৎসরিক ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন দুগ্ধের প্রয়োজন। সরকারী পরিসংখ্যান মতো এখন দেশে দুগ্ধ উৎপাদিত হয় মাত্র ১৩ লক্ষ টন; আর বিদেশ থেকে আমদানী হয় ৪০ লক্ষ টন গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধ আমদানী করতে আমাদের প্রতিবছর তিন শত কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দিতে হয়।

আমাদের দেশের মতো একটি নাতিশীতোষ্ণ এবং উর্বর দেশ, যেখানে প্রায় তিন কোটি কর্মঠ যুবক যুবতী বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছে এবং যেখানে অন্ততঃ তিন কোটি কর্মঠ মহিলা উৎপাদনমুখী কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না, সেখানে উন্নতমানের দুধেল পশু পালন করলে একদিকে দেশকে দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে এবং অন্যদিকে গুঁড়ো দুধ আমদানীর জন্য প্রতিবছর তিনশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেবার জন্যে হিমশিম খেতে হবে না। তখন ঐ বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যাবে।

আমাদের পরিকল্পনায় দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য উন্নতমানের দুধেল গাভী, উন্নতমানের দুধেল মহিষ ও উন্নতমানের দুধেল ছাগল পালন গোটা জাতির সার্বজনীন কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছে।

অতীতে গ্রামাঞ্চলে প্রতি গৃহস্থের গোশালায় দু'একটি দুধেল গাভী, এবং কারো দুএকটি দুধেল মহিষ থাকতো। ঐসব গাভীর মান উন্নত না হলেও ঘরে ঘরে দৈনিক দু'চার সের দুধ পাওয়া যেতো। আর সে দুধ থেকে প্রস্তুত হতো দধি, ঘি, মালাই ইত্যাদি।

বঙ্গোপসাগরের চর এলাকায় মহিষের পাল সেইকালে বিচরণ করতো। সেই মহিষের প্রচুর দুধ নৌকায় করে চলে যেতো দূর–দূরান্তের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে।

গ্রামের মহিলারা, বিশেষ করে অসহায় বিধবারা, দুধেল ছাগী পালন করতেন দু'একটি। সেই ছাগলের দুধে পুষ্টি লাভ করতো প্রতিবেশীর শিশুরা, আর দুধ বিক্রয় লব্ধ অর্থটুকু দিয়ে বিধবা মহিলারা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করতেন।

www.pathagar.com

কালের কষাঘাতে, এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে, আজ আর গ্রামের লোক দুধের সন্ধানই পান না। গুঁড়ো দুধ ক্রয় করার মতো অর্থ সংস্থানও তাদের নেই। তাই দুধের মতো পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে গ্রামের শিশুরা এখন আর পূর্বের মত সবল সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারছে না; তাদের মেধা বিকশিত হচ্ছে না। পূর্বে এই সমাজেই মেধার বিকাশ ঘটতো গ্রামের চাষী পরিবারে। সেই বাংলাদেশে এখন মেধা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে ঢাকা মহানগরীতে ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সরকার যেখানে জনগণের স্বার্থে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করছেন, সেখানে আর কিছু না হোক, মেধা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে শহরাঞ্চলে। এর কারণ গ্রামাঞ্চলে সুষম খাদ্যের অভাব। বিশেষ করে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের ঘাটতি।

এই কারণেই আমাদের পরিকল্পনায় দেশের সর্বত্র, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

www.pathagar.com

১৬·২ঃ দুধেল গাভী

এটা অনস্বীকার্য্য যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে মুক্তি লাভের চার দশক পরেও দেশের পশু সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। যে কোন কারণেই হোক, সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমার মতে পশু পালন, এমনকি যে কোন প্রাণী লালন পালন, মনুষ্য শিশুকে লালন পালন করার মতোই একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার কাজ। মাতৃস্নেহ ও মায়ের প্রাণঢালা পরিচর্যা যেমন মানব শিশুর শারীরিক মানসিক উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য্য, তেমনি যে কোন প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা সেই মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহের সমতুল্য আন্তরিকতার দাবীদার। মাতাপিতার স্থলে যেমন বেতনভোগী কর্মচারীর উপর নির্ভর করে মানব শিশুর উৎকর্ষ সাধন হয় না, ঠিক তেমনি পশু পালনের বেলায়ও মালিকের ব্যক্তিগত দরদী দৃষ্টিছাড়া সুফল লাভ করা সম্ভব নয়। পশু পালনে কেবল চাকুরী বজায় রাখার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করা মোটেই যথেষ্ট নয়, কেবল লাভ লোকসানের হিসাব করাই যথেষ্ট নয়, এখানে প্রাণের আর্কষণের দরকার, দরদী হাতের স্পর্শের দরকার। তাই পশু পালনের যা কিছু প্রক্রিয়া আমরা সুপারিশ করছি, তার সবকিছুই হওয়া উচিত ব্যক্তি মালিকানায়। আর সেই ব্যক্তিমালিকনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত শিক্ষিত বেকার নারী পুরুষের। আমাদের এই দারিদ্রক্লীষ্ট দেশের অন্তিম দারিদ্র ও বেকারত্ব ঘুচাতে পশু পালন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনেকেই বলবেন কৃষি সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি করতে গিয়ে দেশে এখন তো আর গোচারণ ভূমিই নেই। গোচারণ ভূমিহীন দেশে পশু পালন সম্ভব হবে কি করে? উত্তর অতি সহজ। বিশ্বের যে সব দেশে প্রচুর ভূমি রয়ে গেছে সেসব দেশেও আজ আর গবাদি পশু গোচারণ ভূমিতে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেয়ে পুষ্ট হয় না। উল্লেখ্য যে আমাদের দেশেও তো সম্পূর্ণ বর্ষাকালে গবাদি পশু মাঠে মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার সুযোগ পায় না; কারণ মাঠ তো তখন চাষাবাদকৃত ধান গাছে ভর্তি; অথবা জলমগ্ন। তাই আমাদের দেশেও বছরের একটি সুদীর্ঘকাল গবাদি পশু মাঠে চারণের সুযোগ নেই। ঐ সময়টা গবাদি পশুকে গোয়াল ঘরে খাবার দেওয়া হয়।

আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে গবাদি পশুকে সারাটি বছরই খাবার সরবরাহ করা হয় গোয়াল ঘরে। মাঠে চারণ করে গবাদি পশু খেতো কেবল ঘাস, যেটা পশুর জন্য সুষম খাদ্য নয়। তাই আজ গোয়াল ঘরে সরবরাহ করা হয় সুষম খাদ্য, যার একটা ক্ষুদ্র অংশ সবুজ ঘাস। আজ গোচারণ ভূমি বাতিল। গবাদি পশু তার সম্পূর্ণ খাদ্য খাবে গোয়াল ঘরে। সারা দিনের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য গবাদি পশুকে একটু হাটিয়ে নিয়ে আসতে হয়, আর সেটা করা হয় গ্রামীণ পথ ঘাট দিয়ে, দ্রুত যানবাহন চলাচলকারী রাজপথ ছাড়া অন্য পথ ঘাট দিয়ে। এমনকি গাছ তলায়, ফল বাগানের মধ্যে দিয়েও গবাদি পশুকে হাটিয়ে নেয়া যায়।

আধুনিক গোচারণহীন পশু পালন প্রক্রিয়ায় ২/১ সের দুধ প্রদানকারী স্থানীয় নিম্নমানের গাভী পালন করে পোষাবে না। উন্নত দেশের অনুসরণে যথেষ্ট খাটি দুধ ও

www.pathagar.com

গো-মাংস উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য আমি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিম্ন লিখিত লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তাব দিচ্ছি ঃ-

১৬·২·০১ঃ সারা বাংলাদেশের সর্বত্র গাভীর খাঁটি দুধ সুলভ মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৬·২·০২ঃ বিদেশী গুঁড়ো দুধ আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করে বছরে তিনশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো।

১৬·২·০৩ঃ বিদেশী গুঁড়ো দুধের তেজস্ক্রিয়তা এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়া।

১৬·২·০৪ঃ দেশের অতি নিম্নমানের গো-সম্পদকে পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নতমানের গো-সম্পদে রূপান্তরিত করা।

১৬·২·০৫ঃ ব্যাপক ভিত্তিতে কৃত্রিম প্রজননের সম্প্রসারণ করা এবং এ বিষয়ে জনগণকে উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলা।

১৬·২·০৬ঃ দেশের অভ্যন্তরে উন্নত জাতের ষাড় পালন করে উন্নত মানের গো-মাংস সরবরাহ করা।

১৬·২·০৭ঃ মাংসের গরু চোরাই পথে আমদানী বন্ধ করে ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যে শৃংখলা প্রবর্তন করা।

১৬·২·০৮ঃ উন্নতমানের ছাগল আমদানী করে ছাগলের খাঁটি দুধ ও উন্নতমানের খাসির মাংস সরবরাহ করা।

১৬·২·০৯ঃ সারা দেশের ঘরে ঘরে গো-সম্পদ থেকে প্রাপ্ত জৈবিক সার ব্যবহার করে উন্নতমানের ফলের চাষ ও সব্জির চাষ বিপুলভাবে সম্প্রসারণ করা।

১৬·২·১০ঃ ঘরে ঘরে দুধেল গাভী ও দুধেল ছাগী পালন করে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান করা।

১৬·২·১১ঃ গোচারণ ভূমির পরিবর্তে গোয়াল ঘরে গবাদী পশুর খাবার সরবরাহ করার জন্য শিক্ষিত যুবক যুবতীদের পশু খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেয়া।

১৬·২·১২ঃ গবাদি পশুর সুষম খাবারের জন্য আধুনিক প্রক্রিয়ায় ঘাস বা সবুজ খাবার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

আমার প্রস্তাব, ১১ কোটি মানুষের জন্য ১১ লক্ষ উন্নত মানের দুধেল গাভী জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহ করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক। এগারো লক্ষ গাভী সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু যে কঠিন সমস্যা সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রস্তাব পেশ করছি, সেই সমস্যার গুরুত্বের তুলনায় গাভী সংগ্রহ সমস্যা তেমন বিরাট কিছু নয়; যদিও এটা কিছুটা সময় সাপেক্ষ।

গাভী সংগ্রহের জন্য কেবল ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সকল দেশগুলোতেও চেষ্টা চালানো উচিত মনে করি।

পরিবহন খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণের অবকাঠামো সহ একেকটি গাভীর জন্য গড়পড়তা ৪০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে হলে সর্বমোট পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ৪,৪০০,০০,০০,০০০ (চার হাজার চারশো কোটি টাকা)। পুঁজি বিনিয়োগের সমস্যা এমন কঠিন কিছু নয়। হাজার হাজার মানুষ অগ্রীম টাকা দিয়ে উন্নতমানের গাভী ক্রয়

www.pathagar.com

করতে আগ্রহী হবেন। ব্যাংক মারফত কিস্তিতে টাকা আদায় করা কঠিন হবেনা। কারণ পুঁজি বিনিয়োগের দিন থেকেই তো আয় শুরু হয়ে যাবে। আর সম্পূর্ণ পুঁজি বিনিয়োগতো একসাথে করতে হচ্ছে না। এই কর্মসূচীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতে লজ্জার কিছু নেই, কারণ এই কর্মসূচী সরাসরি দেশকে স্বাবলম্বী করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

গাভী সংগ্রহ ও বিতরণ কৃষি ব্যাংক ও সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে করা যেতে পারে। গাভীগুলোর বন্টন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির দায়িত্ব গ্রামীণ ব্যাংককে দেয়া যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে এই পুস্তকে অন্যত্র আরো কিছু সুপারিশ পেশ করছি।

বিতরণের ও কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি যথাযথ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন। গাভীগুলোর স্বাস্থ্যবীমারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখন প্রস্তাবিত গাভী পালনের অর্থনৈতিক দিকটি একটু দেখা যাক। প্রত্যেকটি গাভী যদি দৈনিক গড়পড়তা মাত্র ১২ সের দুধ দেয়, এবং দুধের সের যদি মাত্র ১৫ টাকা করে ধরে নেয়া হয়, তাহলে দৈনিক দুধের মূল্য বাবদ পাওয়া যাবে ১৮০ টাকা; অর্থাৎ মাসে ৫৪০০ টাকা। বৎসরে একেকটি গাভী যদি মাত্র ৭ মাস দুধ দেয়, তবে বাৎসরিক আয় হবে ৩৭,৮০০ টাকা। গাভীর পরিচর্যায় প্রতিমাসে যদি দুই হাজার টাকা করেও খরচ করা হয়, তবে ১২ মাসে খরচ হবে ২৪০০০ টাকা। অর্থাৎ গাভী প্রতি মোট বাৎসরিক লাভ দাঁড়াবে ১৩,৮০০ টাকা। তার উপর বছর পার হয়ে গেলে বাছুরটির মূল্য দাঁড়াবে ৩/৪ হাজার টাকা। দ্বিতীয় বছরে দুধের আয় হবে প্রথম বছরের মতোই। কিন্তু প্রথম বাছুরটির মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। আর দ্বিতীয় আরেকটি বাছুর আসবে। তৃতীয় বছরে লাভ আরো বেশী হবে। চতুর্থ বছর থেকে দুধেল গাভীর সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় দেখতে দেখতে এক একটি দরিদ্র পরিবার আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করতে থাকবে। দেশের গো–সম্পদেরও উন্নয়ন হয়ে যাবে এবং দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে এক বিরাট অগ্রগতি সাধিত হবে। সাথে সাথে পুষ্টিগত কারণে দুর্বল শক্তিহীন মেধাহীন মানুষ সুস্থ সবল ও মেধাবী হতে শুরু করবে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে মূলধন ফিরে আসবে এবং পুনঃবিনিয়োগ করে সারা দেশে উন্নতমানের গরু ও প্রচুর দুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা যাবে।

বাজার দরের থেকে কমদামে আমদানী করা গুঁড়া দুধ বাজারে বিক্রি না করা হলে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে ডেইরী ফার্ম স্থাপন ও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে গাভী সরবরাহ করলে দুই বছরের মধ্যে দেশ দুধে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই পন্থায় দেশকে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা অবশ্যই সম্ভব। সাথে সাথে গো–মাংসের আয়ও বাড়তে থাকবে। কারণ উন্নতমানের ঐসব গাভীর ষাড় বাছুরগুলো দু–বছর পর উন্নতমানের মাংসে সমৃদ্ধ হবে। অন্যদিকে বুড়ো ও বন্ধ্যা গাভীও শেষ পর্যন্ত মাংসের জন্যই ব্যবহৃত হবে।

উন্নতমানের গরু থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বাড়তি আয় পাওয়া যাবে এবং সেটি হলো এই সকল বড় বড় গরুর চামড়া থেকে। যে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের একটি ছোট

www.pathagar.com

চামড়ার বাজার মূল্য ৪০০/৫০০ টাকা, সেই ক্ষেত্রে ঐসব বড় গরুর চামড়ার বাজার মূল্য ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। এই চামড়া রপ্তানী করে দেশে আসবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

দুগ্ধ উৎপাদন বাড়তির সাথে সাথে গুঁড়ো দুধের আমদানী কমতে থাকবে। কালক্রমে বাংলাদেশ থেকে গুঁড়ো দুধ রপ্তানী করার সম্ভাবনাও নাকচ করে দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

১৬·৩ঃ দুধেল ছাগল

আমাদের দেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল মাংসের জন্য উৎকৃষ্ট হলেও দুধের জন্য উপযুক্ত নয়। বিদেশী বড় আকারের যে সকল ছাগল বাংলাদেশে পরীক্ষিত হয়েছে, এই সব একেকটি ছাগী দৈনিক ২/৩ সের পর্যন্ত দুধ দেয়। ছাগলের দুধ শিশুদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। ঢাকার মিরপুরে বিচ্ছিন্নভাবে ঐসব ছাগল দু'চারটি করে অনেক পরিবারে পালন করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

আমরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাগল খামারের সুপারিশ করছি না। গ্রামাঞ্চলে বিদেশী ছাগলের প্রবর্তনও উচিত মনে করছি না। কিন্তু শহরের বিত্তশালী লোকজনকে শিশুদের শরীর গঠনের উদ্দেশ্যে একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে দু–একটি করে ছাগী পালনের সুপারিশ করছি। সরকারের পক্ষ থেকে কেবল মাত্র উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও ছাগল আমদানীর ব্যবস্থা করে দিলেই যথেষ্ট। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এগারো কোটি লোকের জন্য মাত্র ১১,০০০ ছাগল আমদানী করলেই যথেষ্ট। আগ্রহী প্রার্থীগণের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ছাগল আমদানী করা যেতে পারে। বিশেষ করে স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীনদের ছাগল পোষা খুবই লাভজনক। ছাগল ক্রয় করতে মূলধন লাগে কম, আর খাবারের খরচও কম, অথচ বংশ বিস্তার হয় দ্রুত।

পাকা দালানের ছাদের উপর ছাগল পালন সহজ ও নিরাপদ এবং রোগ বালাই কম হয়। মহিলা ও কিশোর কিশোরীরা অতি সহজে ছাগল পালন করে লাভবান হতে পারেন।

www.pathagar.com

১৬·৪ঃ মোরগ–হাঁসের খামার

সারা বিশ্বে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে মোরগই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। বাণিজ্যিক হারে মোরগ পালন এতোই সহজ ও লাভজনক যে ইউরোপ আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে মোরগের মূল্য গো–মাংসের মূল্যের চেয়ে অনেক কম। ১৯৮৬–৮৭ খৃষ্টাব্দে মালয়েশিয়ায় মোরগ খামারের মালিকেরা লক্ষ লক্ষ মুরগীর বাচ্চা পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করেন, এই অজুহাতে যে দেশে মোরগের উৎপাদন অত্যধিক হয়ে গেছে। আর বিদেশে রপ্তানীর চাহিদাও নেই। দেশের সংবাদপত্রে এই নিয়ে বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়। মালয়েশিয়া সরকার তড়িৎ গতিতে আইন পাশ করে মোরগের বাচ্চা ধ্বংস নিষিদ্ধ করে দেন। তখন থেকে মোরগ উৎপাদনকারী সংস্থা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন।

আমাদের দেশে দারিদ্রের জন্য এবং মোরগের অত্যধিক মূল্যের জন্য চাহিদা কম। যেহেতু আমরা দারিদ্র বেকারত্ব বিতাড়ণের লক্ষ্যে এই পরিকল্পনা তৈরী করছি, সেই হেতু আমাদের পরামর্শ, দেশের সর্বত্র সকল কর্মঠ মহিলাকে নিজ নিজ ঘরে সীমিত সংখ্যক বড় মুরগী আধুনিক পদ্ধতিতে পালনের অনুপ্রেরণা উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দিলে নিজের ঘরে উৎপাদিত ডিম ও মোরগের মাংস প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য কর্মচাঞ্চল্য ও মেধা উৎকর্ষণে এক বিরাট অবদান রাখবে।

পাকা দালানের ছাদের উপর মোরগ পালন অতি সহজ আর সেখানে রোগ বালাইও খুব কম হয়।

গ্রামাঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে মোরগ/মুরগী চাষ খুব সহজ হবে না। সেখানে চিরাচরিত চারণ প্রথা আপাতত চলতে পারে। তবে উন্নতমানের, বিশেষ করে বেশী ডিম দেয়া, মোরগের বংশবিস্তারের জন্য মোরগ বিতরণের সরকার প্রবর্তিত প্রথাকে আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত করতে হবে।

আমাদের দেশের মতো চরম দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত দেশে মোরগ হাঁসের চাষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখতে পারে। অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগীতার মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতির আদর্শ মোরগ/মুরগীর খামার গড়ে তোলা যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো সহ রফতানীযোগ্য পণ্য হিসাবে মোরগ/মুরগী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ লাভ করা সম্ভব। দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচন ক্ষেত্রে এইটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

শহরাঞ্চলে হাঁসের মাংসের চাহিদা মোরগের মাংসের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ক্রয় ক্ষমতা থাকলে হাঁসের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যেতো। হাঁসের ডিমের চাহিদা যথেষ্ট। বিশেষ করে কেক বিস্কুট ইত্যাদিতে হাঁসের ডিম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক পরিবারেরই ৫/১০টি হাঁস আছে। সকাল বেলা উচ্ছিষ্ট ভাত ও কিছু কুঁড়া ইত্যাদি খাইয়ে হাঁসকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারা পুকুর

www.pathagar.com

ডোবায়, খাল নালায় ঘুরে বেড়ায়। আমরা এই পদ্ধতির কোন পরিবর্তনের সুপারিশ করছি না।

কিন্তু দেশী পাতি হাঁস বছরে ৫০/৬০টির বেশী ডিম দেয় না। সেক্ষেত্রে খাকী ক্যাম্বেল জাতীয় হাঁস বছরে ২৫০/৩০০ ডিম দেয়। খাকী ক্যাম্বেল হাঁস আমাদের দেশে বহুকাল থেকে সরকারী খামারে স্থান পেয়েছে। হাঁসের বংশোন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে খাকী ক্যাম্বেল জাতীয় হাঁস বিতরণ একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এই পদ্ধতিতে সারা দেশে হাঁসের মান উন্নয়ন করা যাবে। তাছাড়াও প্রসিদ্ধ ইন্ডিয়ান রানার ও চীন দেশীয় বড় আকারের হাঁস পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই হাঁস পালনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বেশী সংখ্যক হাঁসও পালন করতে পারেন।

www.pathagar.com

১৭ ঃ পানি সম্পদ

১৭·১ ঃ ভূমিকা

পানিকে সব সময়ই ভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" কথাটা দেশের সম্পূর্ণ পানি সম্পদের উপরও প্রযোজ্য। ভূমির অপচয় অপব্যবহারের যে সব চিত্র আমরা তুলে ধরেছি, পানির বেলাও সেই একই অবস্থা বিদ্যমান; বরং আরো বেশী। অধিকাংশ ভূমিতে খাদ্য দ্রব্যের কিছু না কিছু চাষাবাদ করা হয়, কিন্তু পানিতে মৎস্য চাষ বা আবাদ আমাদের দেশে এখনো প্রচলিতই হয়নি। পুকুরে ও বদ্ধ জলাশয়ে এখানে সেখানে অতি সীমিত আকারে মাছের আবাদ করলেও মুক্ত পানিতে মাছের পোনা ছেড়ে দেয়া যে একটি উৎপাদনমুখী কাজ এই উপলব্ধি এখনো আমাদের দেশে দানা বাঁধতে পারেনি।

তবে সনাতনী কৃষি পদ্ধতিকে উন্নত করতে কৃষি মন্ত্রণালয় যে রকম একের পর এক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, এবং যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছেন, মৎস্য মন্ত্রণালয়ও প্রায় একই পদ্ধতিতে পুকুর দীঘি ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষের কিছুটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছের পোনা উৎপাদন তাদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে এটা অনস্বীকার্য্য যে কৃষিজাত খাদ্য দ্রব্যের বেলায় যে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, মৎস্য চাষে সেই পরিমাণ অগ্রগতি অর্জন হয়নি। তার কারণ হলো, আমাদের দেশের জনগণের ধারণা, পানিতে মাছ প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মাবেই, সেই মাছ ধরে নেয়াটাই মানুষের অধিকার। "জাল যার, জলা তার" স্লোগানটির অন্তর্নিহিত অর্থই হলো, মৎস্যজীবিদের মাছ ধরাই কর্তব্য। এই স্লোগান যে এখন সম্পূর্ণ অচল, এই উপলব্ধি জনগণের মধ্যেতো নয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে এখনো শিকড় বাঁধতে পারেনি।

তবে মৎস্য পরিদপ্তর সম্প্রতি মুক্ত পানিতে মাছের পোনা ছাড়ার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিলম্বে হলেও এই পদক্ষেপ এখন দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা অত্যাবশ্যক।

মুক্ত পানিতে, নদী নালা খাল বিলে, এবং বিশেষ করে, বর্ষার প্রারম্ভে ধান ক্ষেতের স্বল্প পানিতে, মাছের পোনা ছাড়ার একটা সুবিধা হলো সেখানে পোনা মাছের খাদ্য আছে প্রচুর, আর নিরাপত্তাও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। ধানক্ষেতে দ্রুত গতিতে বড় হয়ে ঐ সব পোনা মাছ ধীরে ধীরে খাল বিল হাওর–বাঁওড় নদ–নদীর দিকে এগুতে থাক বেই।

১১ কোটি জনগোষ্ঠির এই দেশে দু'দশ কোটি পোনা কিছুই নয়। এদেশে মুক্ত পানিতে হাজার কোটি পোনা ছাড়লে তার এক চতুর্থাংশও যদি প্রাণে বেঁচে বড় হতে পারে, তাহলেও জনপ্রতি ১০/১৫টি মাছ জালে ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ। তবে মুক্ত পানিতে ছাড়া পোনা থেকে বছরে যদি জনপ্রতি ১০টি মাছও ধরা পড়ে তাহলেও এটা এক নব দিগন্তের সূচনা বলে গণ্য করা উচিত।

www.pathagar.com

১৭.২ ঃ মৎস্য সম্পদ

এখন দেশের একটি সুপরিকল্পিত মৎস্য নীতি প্রণয়নের সময় এসেছে। সেই নীতিতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবগুলো গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি মনে করিঃ–

(১) "জাল যার জলা তার" স্লোগানটি এখন সম্পূর্ণ অচল। এটা বাতিল না করা পর্যন্ত দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করা যাবে না। এই রাজনৈতিক স্লোগানটি উদ্ভাবিত হয়েছিলো একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এককালে স্লোগান উঠেছিলো "লাঙ্গল যার, জমি তার"। সেই স্লোগানও অচল হয়ে বর্জিত হয়ে গেছে। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে ঐসব সস্তা স্লোগান দিয়ে ক্ষণিকের উত্তেজনা সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু ক্ষুধাপীড়িত মানুষকে দারিদ্রের কবল থেকে উদ্ধার করে তার ব্যক্তি সত্তা বিকাশের পথ এটা নয়। তাই "জাল যার, জলা তার" স্লোগানের পরিবর্তে বর্তমান কালের স্লোগান হওয়া উচিত "পোনা আবাদ করবে যে, মাছ ধরার অধিকার পাবে সে।"

(২) "মৎস্যজীবি" সম্প্রদায় বলে আজ আর বিশেষ কোন জনগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা উচিত নয়। মৎস্যজীবির পরিবর্তে এখন "মৎস্যচাষী" কথাটি প্রচলিত হওয়া উচিত। জজ সাহেব, সচিব সাহেব, উকিল সাহেব তাঁর পুকুরে নিবিড় মৎস্য চাষ করে প্রচুর মৎস্য উৎপাদন করলে তাকে মৎস্যচাষী বলা যেতে পারে, কিন্তু মৎস্যজীবি তো বলা যাবেনা। ঠিক সেইভাবে মৎস্যজীবি বলে পরিচিত পিতার পুত্র বিজ্ঞানী হয়ে গেলে, ডাক্তার হয়ে গেলে, তাকে মৎস্যজীবিতো বলা যাবে না, এমনকি মৎস্য চাষীও বলা যাবে না, যদি না তিনি বাস্তবতায় মৎস্যচাষে খন্ডকালীনের জন্যও নিজেকে নিয়োজিত করেন। আসলে মৎস্য চাষ বা আবাদ একটি সার্বক্ষণিক কাজ নয়। এটা একটা খন্ডকালীন কাজ। এটাকে একমাত্র পেশা হিসাবে কারোই গ্রহণ করার দরকার নেই। মৎস্যজীবি বলে যারা এতোদিন পরিচিতি লাভ করেছেন, তারাও মাছ ধরাকে একমাত্র পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি। তারাও একাধারে কৃষক কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি।

(৩) ঠিক ভূমিরই মতো দেশের সম্পূর্ণ জলাশয়, জলাভূমি নদ–নদীকে মালিকানার দিক দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা উচিতঃ

(ক) ব্যক্তিমালিকানাধীন জলাশয়। (খ) রাষ্ট্র মালিকানাধীন জলাশয়, (হাওর, বাঁওড়, নদী, নালা ইত্যাদি)। যারা মৎস্যজীবি বলে এতোদিন পরিচিত হয়েছেন তাদের অনেকের নিজস্ব পুকুর আছে। যুগের চাহিদা হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রত্যেকটি জলাশয়, সেটা যতো ছোটই হোক না কেন, সেটাই একটি সম্পদ। এর মালিককে এই সম্পদের "সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার" করতেই হবে। মৎস্য চাষ শস্য চাষের চেয়ে অনেক সহজ এবং বেশী লাভজনক। অতি অল্প পানির ডোবাতেও আজকাল খন্ডকালীন মৎস্য চাষ প্রচলিত হয়ে গেছে। থাইল্যান্ডে শুকনো মৌসুমে সেচের পানি দিয়ে যে ধান চাষ করা হয়, সেই ধান ক্ষেতে তিন থেকে ছয় ইঞ্চি পানির মধ্যে তিন মেসে প্রচুর মৎস্যচাষ হয়ে আসছে। আমাদের দেশের কেবল ডোবাতেই নয়, ইরি বোরো ক্ষেতেও তিন মেসে মৎস্য চাষ একটি বিরাট উৎপাদনমুখী পদক্ষেপ। আমাদের মৎস্য বিশেষজ্ঞরা

www.pathagar.com

অবশ্যই এটা সমর্থন করবেন। এবং মৎস্য পরিদপ্তর আবশ্যকীয় সাহায্য সহায়তা প্রদান করবে।

একা কথায় ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি জলাশয়ও অব্যবহৃত ফেলে অপচয় করা যাবে না। এ কথাটা শহরাঞ্চলে সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। ঢাকা মহানগরীতে ছোট বড় শত শত পুকুর অব্যবহৃত ফেলে রেখে কেবল মশার বংশ বিস্তারেই সহায়তা করছে। এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঢাকা মহানগরীসহ দেশের প্রত্যেকটি শহরে যতটি জলাশয় আছে তার প্রত্যেকটিকে একেকটি মৎস্য খামারে পরিণত করতে হবে। শিক্ষিত বেকার যুবকগণকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই কাজে লাগিয়ে দিলে চমকপ্রদ ফল পাওয়া যাবে। আবশ্যক হলে নতুন আইন পাশ করে এই সকল জলাশয়ে উপযুক্ত অংশীদারিত্বের শর্তে মৎস্যচাষের অধিকার সরকার গ্রহণ করে বেকার যুবকদের বন্দোবস্ত দিতে পারেন। এইরূপ উৎপাদনমুখী আইনকে জনগণ অবশ্যই স্বাগত

ঢাকা মহানগরীসহ সকল শহরে, এমন কি জেলা উপজেলা সদরে, যে সকল দীঘি পুকুর বা জলাশয় আছে এগুলোতে মৎস্য চাষের ব্যাপারে অনুরূপভাবে শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এক বিরাট গণকল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যে সরকার এই পদক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করবেন, সেই সরকারের এই কৃতিত্ব মানুষ ভুলতে পারবে না।

মুক্ত পানিতে মাছের পোনা ছাড়ার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। প্রতি বছর দেশের ৪৪০১টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটির মুক্তপানিতে, বিশেষকরে ধান ক্ষেতে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ পোনামাছ ছাড়ার এক স্থায়ী কর্মসূচী এখনই গ্রহণ করা উচিত। এরূপ একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নে গেলে দেখা যাবে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছে, তাদের আপন আপন এলাকার মুক্ত পানিতে পোনা ছাড়ার জন্য। এটা সারাদেশে এক নূতন আশা, এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। আর মাস কয়েক পরই যখন এই অণু-পরমাণু আকারের মাছের পোনা কয়েক ইঞ্চি লম্বা মাছরূপে ধরা দিবে তখন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে আশার আলোকবর্তিকা জেগে উঠবে।

(৩) মাছ ধরার জন্য পানি কমানোর প্রথা বেআইনী ঘোষণা করা উচিত। পানি কমিয়ে যে কোন জলাশয়ে মাছ ধরার ফল দাঁড়ায় মাছের বংশ বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা। আর পানি একেবারে শুকিয়ে মাছ ধরার যে প্রবণতা গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় এটা আরো বেশী ক্ষতিকর। একদিকে পানি শুকিয়ে মাছের বংশ পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়া হয়, অন্য দিকে শুকনো মৌসুমে খাল নালার পানি ভাটির দিকে ঠেলে দিয়ে এলাকাকে পানি বিহীন করে ফেলা হয়। দু'চারটি টাকি, পুটি মাছের জন্য মূল্যবান পানি এভাবে সেচিয়ে ফেলে পাশাপাশি জমিতে চাষাবাদের বিঘ্নসৃষ্টি করা হয়। এই ক্ষতিকর প্রবণতা বন্ধ করতেই হবে। ভূমির সাথে পানির "সর্বাত্মক সর্বতোম সদব্যবহার" করতেই হবে, এবং সেটা করার জন্য বর্ষাকালে যে পানি বন্যা ও প্লাবণের আকার ধরে মানুষের ক্ষতি সাধন করে, সেই পানিকে যেখানেই সম্ভব বন্দি করে রাখতে হবে শুক্‌নার সময় ঐ ক্ষতি পূরণ করার জন্য।

www.pathagar.com

পানির উপর জাতীয় নীতি প্রনীত হওয়া উচিত, বর্ষাকালে যখন বাড়তি পানি শত্রুরূপে দেখা দেয় তখন সেই বাড়তি পানিকে দ্রুত সাগরের দিকে ঠেলে দেয়া, আর বর্ষাশেষে যখন খাল বিল নদীনালার পাড় ভেসে উঠতে থাকে তখন যেখানেই সম্ভব বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে রেখে সারাটি শুষ্ক মৌসুম সেই পানিকে খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা। এই কার্যক্রম কঠিন নয়, ব্যয় বহুলও নয়। দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে এই কার্যক্রম অত্যাবশকীয়।

www.pathagar.com

১৭.৩ ঃ চিংড়ির চাষ

সারা বিশ্বের মৎস্য পরিসংখ্যান পরীক্ষা করলে দেখা যাবে চিংড়ির স্থান সর্বাগ্রে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মাছের মধ্যে চিংড়িই হলো সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। অতিক্ষুদ্র প্রজাতির চিংড়ি থেকে শুরু করে বৃহত্তম প্রজাতির চিংড়ি পর্যন্ত অফুরন্ত চাহিদা। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি সিঙ্গাপুরেও কোন কোন অভিজাত রেঁস্তোরায় একটি মাত্র বৃহত্তম চিংড়ি দিয়ে এক ব্যক্তির নৈশ ভোজ সমাধা হয়ে যায়। অবশ্য মূল্য দিতে হয় ৫০ থেকে ১০০ ডলার।

বিগত কিছুকাল থেকে বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক চিংড়ি বাজারে স্থান পেয়ে গেছে। বছরে এখন গড়পড়তা প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকার চিংড়ি রপ্তানী হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সরকার এখনো চিংড়ি চাষকে একটি অত্যন্ত লাভজনক শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি দেননি, চিংড়ি উৎপাদনের বিরাট প্রতিবন্ধকতা ও ঝামেলা সমাধান করা হয়নি, এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিংড়ি খামারের প্রযুক্তিগত ও পুঁজিগত সহায়তার ব্যবস্থাও হয়নি। এসব করা হলে চিংড়ি থেকে রপ্তানী আয় ৮/১০ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো।

দুঃখের বিষয়, এমনকি লজ্জার বিষয়, চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করণ সম্বন্ধে এখনো সুস্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী কোন নীতিই প্রণীত হয়নি। আমি সব জান্তা নই, এবং সবজান্তার ভূমিকা পালন করতেও প্রস্তুত নই। তবু আমি জোর দিয়ে বলবো, বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়ে গেছে কেবলমাত্র সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অভাবে এই সম্ভাবনা হেলায় বিনষ্ট হচ্ছে। সরকারের কাছে আমার সনির্বন্ধ নিবেদন, আর একটি মুহূর্ত বিলম্ব না করে দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি চিংড়ি নীতি প্রণয়ন করা হোক, আর বিদ্যুৎ গতিতে এর বাস্তবায়ন শুরু করা হোক।

চিংড়িনীতি সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকুই বলবো, চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াজাত করণ, বাজারজাত করণ, এই তিনটি কার্যক্রমের কোন একটিরই দায়িত্ব সরকারী কোন সংস্থার উপর সরাসরি অর্পন করলে, অপচয়ের আরেকটি নুতন সূত্রের সৃষ্টি হবে। আমার আরেকটি বক্তব্য, চিংড়ি চাষ যাতে ধনকুবেরদের কুক্ষিগত না হয়, স্বনামে বেনামে যাতে একেকটি পরিবার এই কার্যক্রমে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

চিংড়ি চাষে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবককে সংযুক্ত করার সুযোগ আছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে এই একটি কার্যক্রমই অত্যাশ্চর্য অবদান রাখতে পারবে, আর সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও হবে প্রচুর পরিমাণে।

www.pathagar.com

১৭·৪ ঃ ব্যাঙের চাষ

ব্যাঙ বাংলাদেশের রফতানী পণ্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ব্যাঙের পা রফতানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বিগত তিন বছরে ব্যাঙের পা রফতানী করে বাংলাদেশ যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে তার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া গেলঃ–

১৯৮৫–৮৬ ঃ ৩৫,৮০,০০,০০০ টাকা
১৯৮৬–৮৭ ঃ ৩১,৪০,০০,০০০ টাকা
১৯৮৭–৮৮ ঃ ৪২,৮০,০০,০০০ টাকা

ব্যাঙ ধরা নিয়ে দেশে বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাঙের অবদান অনস্বীকার্য্য। সেই জন্যই সরকার ব্যাঙ ধরার সময় সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু দারিদ্রে জর্জরিত কিছু সংখ্যক লোক রপ্তানীকারকদের প্ররোচনায় সারাবছরই ব্যাঙ ধরার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আর কিছু সংখ্যক রপ্তানীকারকরা চিংড়ির সাথে প্রক্রিয়াজাত করে নিষিদ্ধ সময়েও অবৈধ ভাবে ব্যাঙের পা রপ্তানী করছে। আমাদের দেশের বর্তমান সার্বিক যে কলুষিত পরিবেশ, সেটা ভেদ করে কেবল নিষেধাজ্ঞা মারফত কোন অবৈধ কাজই বন্ধ করা যাচ্ছে না। তবে ঐ পরিবেশ পরিস্থিতি গ্রহণ করে নেয়া যায় না। সেটারও প্রতিবিধান করতে হবে। তবে এখানে আমরা দারিদ্র বেকারত্ব মোচনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছি। অবৈধ কাজ বন্ধ করার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে।

ব্যাঙের পা রপ্তানীর মতো একটি সহজ ও লাভজনক কার্যক্রমকে সংকোচিত না করে সম্প্রসারিত করার চিন্তাভাবনা করা উচিত। আমি ব্যাঙের চাষের কথাই ভাবছি। তবে এই বিষয়টিতে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। ব্যাঙের চাষ বা ব্যাঙ খামার আমি স্বচক্ষে দেখেছি বহুকাল পূর্বে। কিন্তু এই কার্যক্রমের গভীরে যাইনি। তবে বাংলাদেশের যে সব এলাকায় প্রাকৃতিক নিয়মেই ব্যাঙ জন্মায় সে সব এলাকায় ব্যাঙের চাষ করা যাবেনা কেন?

ব্যাঙ বিশেষজ্ঞরা জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তাদের সুপারিশমত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এইরূপ একটি কার্যক্রম গ্রহণ করলে প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু সংখ্যক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে, ব্যাঙের পা রপ্তানী সম্প্রসারিত হবে; আর তখন মুক্ত এলাকায় ব্যাঙ ধরার নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি করার যুক্তি শক্তিশালী হবে।

ব্যাঙ চাষ একদিকে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে সহায়ক হবে, আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মুক্ত এলাকায় ব্যাঙ ধরা কঠোর ভাবে দমন করা যাবে।

www.pathagar.com

১৭.৫ ঃ মুক্তার চাষ

মুক্তা বা মোতি এক অতি মূল্যবান রত্ন। ইহা সারা বিশ্বব্যাপী মহিলাদের অলংকারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে হীরা ইত্যাদি অন্যান্য মণি-মুক্তা খনিজ পদার্থ, মোতি একটি প্রাণীর পেটের মধ্যে জন্মায়। সেই প্রাণীটি হলো ঝিনুক।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপাদিত মুক্তা সারা বিশ্বে পিংক পার্ল নামে পরিচিত। এই ইষৎ লালচে মোতির চাহিদা বেশী, মূল্যও বেশী। বিদেশী পর্য্যটকরা ঢাকায় পৌছেই খোঁজেন লালচে মুক্তা।

পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে এই প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির কোন পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি, আর যেটুকু নেয়া হয়েছে, সেটা গবেষণার মধ্যেই আবদ্ধ আছে। তার চেয়েও বেশী পরিতাপের বিষয়, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝিনুকের পেটের ভিতর থেকে মুক্তা উদ্ধারের জন্য লক্ষ লক্ষ ঝিনুক হত্যা করে দিন দিন ঝিনুকের বংশই বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে।

১৯৫৫-৫৬ সালে উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা, তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার পুলিশ প্রধান হিসাবে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকায় ভ্রমণ করে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলাম এই ঝিনুক নিধনযজ্ঞ। বর্ষা শেষে তখন হাওরের পানি কমে নদী-নালার তীর ভেসে উঠেছে। শত শত লোক পানি থেকে দু-হাত ভর্তি কুড়িয়ে নিচ্ছে অসংখ্য ঝিনুক, আর নৌকা ভর্তি সেই ঝিনুক স্তূপিকৃত করা হচ্ছে শুকনো স্থানে। একেকটি স্তূপের পাশে বটি দা বা ছুরি নিয়ে আসন গাড়া নরনারী আর ছেলে মেয়েরা খপ খপ করে একেকটি ঝিনুককে ফালি করে দু-টুকরো করছে। আঙ্গুল দিয়ে সেই ফালি করা ঝিনুকের মাংসটুকু নাড়াচাড়া করে মুক্তা না পেয়ে টুকরো করা ঝিনুকের লাশ ছুঁড়ে ফেলছে আরেকটি স্তূপে। নদীর তীর দিয়ে এরকম শত শত পারিবারিক দল মুক্তা আহরণের নামে ঝিনুক নিধন যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শোনা গেলো শোর; আর সেই হর্ষধ্বনির সাথে যোগ দিল পাশাপাশির নরনারী সব। অনুসন্ধানে জানলাম একটি মুক্তা পাওয়া গেছে। সরিষার বীচির মত ক্ষুদ্র আকারের সেই মোতিটা আহরণ করতে গিয়ে কয়েক শত বা কয়েক হাজার ঝিনুক নিধন করে এই ছোট্ট একটি মোতি সংগ্রহ করে এই একটি পরিবারের লোক সন্তুষ্ট। তারা ভেবেও দেখেনি ঝিনুক নিধনের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। হত্যা করা ঝিনুকের মাংসটুকু বাড়ীতে নিয়ে হাঁস-মুরগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার ঝামেলাতেও তারা যায় না। এমনকি ঐ মাংসটুকু আলাদা করে পানিতে ফেলে দিলে মাছের খাদ্য হয়ে যাবে, সেদিকেও তাদের খেয়াল নেই। স্তূপিকৃত দ্বিখন্ডিত ঝিনুক রোদে শুকিয়ে তার মাংসটুকু মাটিতে ঝরে পড়ে সারের কাজ করবে তাতেই তারা সন্তুষ্ট। আর খন্ডিত ঝিনুকের শক্ত বহিরাবরণগুলো তারা ঘরে নিয়ে গুড়ো করে চুনা বানাবে, তাতেও কিছুটা অর্থ উপার্জন হবে। গলিত ঝিনুক মাংসের শুকাবার প্রক্রিয়ায় যে বিকট দূর্গন্ধ বেরুচ্ছে তাতে তারা অভ্যস্ত।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনার হাওর এলাকায় যা তিনযুগ পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি, আজও সেই অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর প্রক্রিয়া চলে আসছে সারা বাংলাদেশের যেখানেই ঝিনুক জন্মায় সেখানেই।

১৯৬৪–৬৫ সনে যখন সরকারী উদ্যোগে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ব পরিভ্রমণে যাই, তখন সপ্তাহ ব্যাপী টোকিওতে জাপান পুলিশের কর্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করার একটা কর্মসূচী জুড়িয়ে দেই। এর একটা উদ্দেশ্য ছিল, কৃত্রিম পদ্ধতিতে জাপানে মোতি বা মুক্তা উৎপাদনের কার্যক্রমটি দেখে আসা। সেই প্রথমবার যা দেখেছিলাম পরবর্তীতে আরো দু–তিনবার ঐ প্রক্রিয়াটি নিরীক্ষণ করেছি।

সেখানে মোতি/মুক্তা আহরণ করতে ঝিনুককে হত্যা করা হয় না। বিরাট হলের মধ্যে সারিবদ্ধ ভাবে বসেছে সন্ধানী মহিলারা। প্রত্যেকের সামনে একেকটি ছোট্ট এক্স–রে মেশিন; বা হাতে একটি প্লাষ্টিকের বাস্কেট থেকে উঠাচ্ছে একটি ঝিনুক, মেশিনের নির্দিষ্ট স্থানে এটাকে বসিয়ে সেই মেশিনটি চালু করে তাকাচ্ছে নির্দিষ্ট ছিদ্র দিয়ে। বিদ্যুৎ বেগে সযত্নে রেখে দিচ্ছে পরিক্ষিত এক একটি ঝিনুককে বিভিন্ন নম্বর দেয়া ব্যাগে। কিছুক্ষণ পর পরই আরেকটি মেয়ে এসে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাগগুলো। পরিপক্ক মুক্তা ধারণকারী ঝিনুক ছাড়া বাকী সব ঝিনুক চলে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন পুকুরে। কেবল পরিপক্ক মুক্তা ধারী ঝিনুক সংগ্রহ করা হচ্ছে একটি পাত্রে। যে ঝিনুকের পেটে মুক্তার রেনু গজায়নি কেবল সেইটিকে ইনজেকশান দিয়ে পরাগায়িত করে পাঠানো হচ্ছে পৃথক পুকুরে। পরিপক্ক মুক্তা সংগ্রহ করা হচ্ছে একটি ঝিনুককে ফালি করে। শত শত মেয়ে কাজ করে যাচ্ছে মেশিনের মতো, কিন্তু হাসি মুখে। টু শব্দটিও নেই।

প্রযুক্তিটি আজ আর আমাদের দেশেও অভিনব কিছু নয়। ময়মনসিংহ মুক্তা গবেষণাগারে এ সব মেশিন বহুদিন আগেই এসে পড়ে আছে; আর দেশব্যাপী ঝিনুক নিধন চলছে।

উল্লেখ্য যে ঝিনুকের পরাগায়ন একটি কৃত্রিম প্রক্রিয়া হলেও যে মুক্তা উৎপাদিত হয় সেটা কিন্তু কৃত্রিম নয়। সেটা আসল মুক্তা। ঠিক যেমন গাভীর কৃত্রিম প্রজননের ফসল, বাছুরটিতো নকল নয়; সেটা তার গর্ভধারিনীর চেয়েও উন্নতমানের আসল গরু। এমনি করে কৃত্রিম প্রজননে মাছের যে পোনা জন্ম নেয় সে পোনাতো কৃত্রিম নয়। সেটা যথার্থ ভাবেই আসল মাছ। মুক্তার বেলাও তাই।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুক্তা চাষের বিরাট সম্ভাবনা রয়ে গেছে বাংলাদেশে। প্রাকৃতিক নিয়মে মুক্ত পানিতে যেসব ঝিনুক জন্মাচ্ছে তাদের নিধন বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝিনুক পরীক্ষার ব্যবস্থা উপযুক্ত স্থানে করলেই ঝিনুক নিধন বন্ধ হয়ে যেতো, এবং এক বিরাট সম্পদ সমৃদ্ধি লাভ করতো।

ময়মনসিংহ সিলেট হাওর এলাকা ছাড়াও চট্টগ্রামের মহেশখালী এবং ফরিদপুরের বিলে যথেষ্ট মুক্তা আহরণ হয়, ঝিনুক নিধন পদ্ধতিতে। ফরিদপুরের গোলাপী মুক্তার চাহিদা প্রচুর। দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের জন্য আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। এরূপই একটি সহজ পদক্ষেপ বদ্ধ জলাশয়ে মাছের পাশাপাশি মুক্তার চাষ। এটাও এখন আর অভিনব কিছু নয়। জাপান চার/পাঁচ যুগ পূর্বে মুক্তার কৃত্রিম প্রজনন

www.pathagar.com

পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলো কারণ তাদের দেশে আমাদের দেশের মতো বদ্ধ জলাশয় নেই, হাওর বাঁওড় নদী নালা নেই বললেই চলে। দেশের চতুর্দিকে সাগর–মহাসাগর। তাই তাদের মুক্তা চাষের সুযোগ সীমিত। আমাদের দেশে মুক্তা চাষের যে বিরাট সুযোগ রয়ে গেছে তাতো আর কোথাও দেখিনা। তাই আন্তরিকতার সাথে একটু উদ্যোগ নিলে মুক্তাচাষে আমরা শত শত শিক্ষিত বেকার নারী–পুরুষকে নিয়োজিত করতে পারবো, আর এই কাজের সম্পূরক হিসাবে হাজার হাজার দরিদ্র লোকের কাজের সংস্থান হবে।

আমার প্রস্তাব, ঢাকা মহানগরী থেকে এই কার্যক্রম শুরু করা উচিত। যে ঐতিহাসিক মতিঝিল থেকে মুক্তা আহরণ করা হতো, সেই ঐতিহাসিক মতিঝিল থেকেই আরম্ভ করা যাবে না কেন? ওয়াপদা হাউসের পিছনে এখনও মতিঝিলের একাংশ গভীর জলমগ্ন। সেখান থেকেই শুরু হতে পারে মুক্তা চাষের অভিযাত্রা। সেই সাথে ধানমন্ডি লেক ও অন্যান্য জলাশয়েও বিস্তৃত হতে পারে এই কার্যক্রম। সাথে সাথে প্রশিক্ষণ দেয়া কিছু যুবককে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে মহানগরীর ব্যক্তি মালিকানাধীন কয়েকটি জলাশয়ে মুক্তা চাষ শুরু করতে।

এই কার্যক্রম প্রথমে মহানগরীতেই সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে এই জন্য যে নূতন করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অর্থাৎ ভূমি অধিগ্রহণ, দালান কোঠা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য আপাততঃ ব্যয় করতে হবে না। মহানগরীতে দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞরা অবস্থান করছেন। এইরূপ একটি নূতন প্রকল্পের জন্য তারা খন্ডকালীন সময় আগ্রহে দেবেন বলে আশা করা যায়। তদুপরি মহানগরীতে অবস্থানরত বহু আগ্রহী যুবক যুবতী কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য খন্ডকালীন কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে আমি আশা করি। সর্বোপরি, মহানগরীতে অবস্থিত এই পরীক্ষা মূলক প্রকল্পের প্রচার করা হবে সহজ।

যেহেতু মুক্তা চাষ গবেষণা কেন্দ্র ময়মনসিংহে অবস্থিত হয়ে গেছে, সেহেতু প্রথম পর্যায়ে সেখানে অন্তত একটি আদর্শ মুক্তাখামার গড়ে তোলা উচিত।

মুক্তাচাষের সম্ভাবনা ও সম্প্রসারণের সুযোগ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এটা ব্যয় বহুল নয়। এরজন্য কোন পৃথক জলাশয়ের প্রয়োজন নেই। মাছ চাষের সাথে সাথে মুক্তা চাষও চলতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াও কঠিন কিছু নয়। আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতিও দুর্মূল্য নয়। তাই এই প্রকল্পটি সরকারী উদ্যোগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চালু করা উচিত।

www.pathagar.com

১৭৬ ঃ গুইসাপ ঃ কচ্ছপ ঃ কাঁকড়া

থাইল্যান্ডে ৩০ হাজার কুমীরের খামার স্বচক্ষে দেখেছি। ব্যক্তি মালিকানাধীন এই খামার বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এতে পুঁজি বিনিয়োগ যে খুব মোটা অংকের নয়, তা খামারটি দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের দেশে এটা কি সম্ভব নয়? কুমীরের চামড়ার চাহিদাও যথেষ্ট এবং এর মূল্যও অনেক। আমাদের দেশে কি একটি কুমীর খামার স্থাপন করা যায় না?

গুই সাপের চামড়ার চাহিদাও প্রচুর। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুই সাপ মারা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও গুই সাপ নিধন চলছেই চলছে। আর চোরাই পথে গুই সাপের চামড়া পাচার হয়ে যাচ্ছে। গুই সাপতো প্রায় প্রত্যেক চিড়িয়াখানাতেই আছে। যে সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক নিয়মেই অধিক সংখ্যক গুইসাপ বিরাজ করে সেই সব এলাকায় ছোট ছোট কয়েকটি গুইসাপ খামার স্থাপন করা তেমন কঠিন কিছু বলেতো মনে হয় না। তারই সাথে অন্যান্য সাপ, যে গুলোর বিষ ও চামড়ার চাহিদা প্রচুর ও মূল্য অনেক, সেই সব সাপও যোগ দেয়া যায়। আমাদের দেশে সাপুড়েদের সংখ্যা প্রায় অগণীত। এরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং ভাসমান মানুষ। একটু অনুপ্রেরনা ও আর্থিক সাহায্য দিলে তারা নিজেরাই এসব খামার গড়ে তুলবে।

কচ্ছপের চাহিদাও আর্ন্তজাতিক বাজারে নগণ্য নয়। আমাদের দেশের সর্বত্রই পানিতে কচ্ছপ দেখা যায়। দেশের কয়েকটি দরগায় অতি সীমিত এলাকায় জলাশয়ে যে বিপুল সংখ্যক কচ্ছপ যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছে তা থেকে কি এটা প্রমাণ হয় না যে কচ্ছপ চাষ একটি লাভজনক ব্যবসা হতে পারে।

বৃহৎ আকারের কাঁকড়ার চাহিদা আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রচুর। এমনকি ঢাকার উচ্চমানের হোটেল রেস্তোঁরায় বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাঁকড়া পরিবেশন করা হয়। আমার বিশ্বাস বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাঁকড়ার চাষও অত্যন্ত লাভজনক হবে।

www.pathagar.com

১৭·৭ ঃ পানিতে অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন

পানিতে খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশ এগিয়ে গেছে। সেই দিন আর খুব বেশী দুরে নয় যে দিন পানিতে প্রচুর পরিমাণ শাকসব্জি উৎপাদন করা হবে। এখনই আমাদের দেশে পানিতে যে সকল শাকসব্জি জন্মায় সেগুলোর সম্প্রসারণ আবশ্যক। পানিতে জন্মানো কল্‌মি শাকের চাহিদা অনেক। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতেই পুকুরের কিনারে কিনারে কিছু পরিমাণ কল্‌মি শাঁক লাগিয়ে দেয়া উচিত। এতে পুকুরে পোষা মাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাছের জন্য যে খাদ্য দেয়া হয় তারই একটি অংশ সংগ্রহ করে কল্‌মি শাঁক দ্রুত বাড়তে থাকে। গৃহস্থের পরিবার প্রতিদিন কিছু শাঁক খাওয়ার পরও সপ্তাহে একবার এর কিছু অংশ বাজার জাত করতে পারেন।

শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। শাপলার সুদীর্ঘ ডগা শহরের মানুষের কাছে এক প্রিয় শব্জি খাদ্য। এটা হয়ত গ্রামের অনেক লোকই জানে না। শাপলার গোড়ায় গভীর পানির নীচে যে শালুক জন্মায় সেটা সিদ্ধ করে মিষ্টি আলুর মত খাওয়া যায়। শাপলা ফুলের ভিতরের ছোট ছোট বীজ শুকিয়ে ভাজি করে যে খই হয় তা এতোই মুখরোচক যে এই খই প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসতে থাকলে এর কাটতিও হবে প্রচুর।

ঢাকা মহানগরীতে পানি ফল একটি জনপ্রিয় সুখাদ্য। এই পানি ফলেরই আরেক নাম সিঙ্গারা। ঢাকার বাজারে আকর্ষণীয় বৃহৎ আকারের যে পানি ফল পাওয়া যায় এ গুলোর চাষ হয় মহানগরীর আশপাশের ডোবা গুলোতে। এই পানিফল চাষের সম্প্রসারণও লাভজনক হবে। শহরতলীতে বেকার যুবকরা এই পানির সিঙ্গারা বা পানিফল চাষ করে লাভবান হতে পারেন। এটাতো কোন সার্বক্ষণিক কাজ নয়। চারা সংগ্রহ করে লাগিয়ে দিলে আর কচুরিপানা ইত্যাদির উপদ্রব থেকে মুক্ত করে দিলে আপনা আপনি ভাসমান চারা বড় হয়ে ফল ধরতে থাকবে।

পানির আরেকটি জনপ্রিয় ফল হলো মাখনা। ঢাকার শ্যামবাজারে পাইকারী দরে মাখনা সহ সকল পানি ফলই পাওয়া যায়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। তাই এর উৎপাদনও প্রতিশ্রুতিশীল।

পদ্মফুলের কুঁড়ি ব্যাঙ্ককে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফুল। প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। ফুলদানীর পানিতে ডগা ডুবিয়ে রাখলে কয়েক দিন পর্যন্ত প্রথমে কুঁড়ি ও পরে ফুল ফোটে শোভা বর্ধন করে। পদ্মফলও একই ভাবে ফুলদানীতে রেখে তার শোভা উপভোগ করা হয়।

আমাদের দেশে পানি কচু এক সুস্বাদু সব্জি। জলাশয়ের কিনারের পানিতে জন্মায়। সিলেটের গোলাপগঞ্জ এলাকায় উন্নত মানের পানি কচু হয়।

শিক্ষিত যুবক যুবতীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে হয়তো নুতন প্রজাতির পানি ফল জন্মাতে পারবেন।

www.pathagar.com

১৮ঃ দারিদ্র বনাম শিল্প

১৮·১ ভূমিকা

বাংলাদেশের কোন সুবিন্যস্ত সুস্পষ্ট শিল্পনীতি নেই। মনে হয় যেন আমাদের হুজুগি চরিত্রই শিল্পায়নে প্রতিফলিত হচ্ছে। যখন যেটার দিকে ঝোঁক দেখা দিলো, সেদিকেই পড়লো দৌড়ের প্রতিযোগিতা। দেশে উৎপাদিত কাঁচা মালের সঙ্গে সংগতি রেখে ঐসব কাঁচা মাল ভিত্তিক শিল্প স্থাপন করাই সর্বত্র অগ্রাধিকার লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর এই নীতির উপর ভিত্তি করেই পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্যোক্তারা ছুটে এসেছিলেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। বৃহত্তম পাটকল থেকে শুরু করে ম্যাচ ফ্যাক্টরী, চিনির কল, বস্ত্রকল, বিস্কুট ফ্যাক্টরী, এমনকি ক্ষুদ্রতম সাবানের কারখানাও স্থাপন করেছিলেন তারাই। পশ্চিম পাকিস্তানী সচিব যুগ্ম সচিব বিভাগীয় প্রধানদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তারা এই সব শিল্প স্থাপন করে মুনাফা লুটেছিলেন, অবিশ্বাস্য ভাবে। আর সেই মুনাফা পাচার করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তাঁরাই চিহ্নিত হয়েছিলেন জনদরদী দেশপ্রেমিক হিসাবে। আমরা তাদেরকে বরণ করে নিয়েছিলাম আমাদের পথিকৃৎ হিসাবে, আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে। যাক, এই আলোচনা দীর্ঘায়িত করলে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা এসে যাবে। রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এইখানে আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচন করা, বেকারত্বের অভিশাপ দূর করা। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা বাংলাদেশের শিল্পায়নের পরিস্থিতি ও অগ্রগতি কিছুটা আলোচনা করবো।

১৮·২ঃ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প

পত্র পত্রিকায় রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের অব্যবস্থা, অপব্যবস্থা এবং অপচয়ের সংবাদ পাঠ করে জনমনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে এ দেশের শিল্প ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের সরাসরি সুযোগ থাকলে, জনগণকেই ক্ষতির বোঝা বইতে হবে। এই ধারণাটা কেবল আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই কমবেশী প্রযোজ্য। ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প বা ব্যবসায় মূল চালিকা শক্তি হয় মালিকের উৎসাহ, উদ্দীপনা, তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, আবশ্যক মতে ঝুঁকি নেয়ার ক্ষমতা এবং সাফল্যের সুনাম অর্জনের স্বাভাবিক আগ্রহ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প বা ব্যবসায় এই সবই অনুপস্থিত। তাই সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম টিকতে পারলোনা। মুক্ত অর্থনীতির মানেই হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ব্যর্থতা চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নেয়াই উচিত।

www.pathagar.com

১৮·৩ঃ পাট শিল্প

বিশ্বের সেরা পাট জন্মায় বাংলাদেশে, প্রচুর পরিমাণে। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেখা গেলো, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে, একটি পাটকলও নেই; সব পাট কলের অবস্থান পড়ে গেছে অদূরবর্তী সীমান্তের ওপারে। তাই সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠিত হলো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, আদমজী জুট মিল। বিশ হাজার নিয়মিত ও ১০/১৫ হাজার অনিয়মিত শ্রমিক নিয়ে যাত্রা শুরু করলো এই বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সুকৌশলে এই বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শত শত কর্মকর্তা ও কারিগর আমদানী করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে থেকে। এমন কি, অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগেও স্থানীয় লোকদের নামমাত্র ভাগ দিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার ধোঁয়া তুলে অবাঙ্গালী লোক নিয়ে আসা হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো, দেশপ্রেমের নামে, দেশোন্নয়নের অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপন করা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। এটা পরিষ্কার বুঝা গেলো পূর্ব পাকিস্তানের লোক যাতে পাটকল চালানোর কৌশলাদি শিখতে না পারে, কর্মচারী নিয়োগে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। আর এটাও জানাজানি হয়ে গেলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট পূর্ব পাকিস্তানেই প্রতিষ্ঠিত পাট কলে প্রক্রিয়াজাত করে পাটজাত দ্রব্য রফতানী করে যে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী হলো, তার সিংহভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য।

এই সব বৈষম্য ও অবিচার থেকেই শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানী বনাম পশ্চিম পাকিস্তানী, তথা বাংলা ভাষাভাষী বনাম উর্দু ভাষাভাষী শ্রমিকদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, হানাহানি, কাটাকাটি। পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রথম ফাটল ধরলো নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটস্থ আদমজী নগরে।

এতদ্বসত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরাই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ছলে বলে কৌশলে প্রতিষ্ঠা করতে থাকলো একের পর এক পাটকল। এই সব পাটকল যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করলো তার সিংহ ভাগই নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিলো এই দেশে। কিন্তু হলো ঠিক উল্টো। বঞ্চিত হলো বাংলাদেশের জনগণ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। ঐ ন্যায্য প্রাপ্যটুকু দিয়ে যদি তখনই এই দেশে স্থানীয় শ্রম ভিত্তিক শিল্পায়ন করা হতো, তা হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য, বিশেষ করে অত্যাবশ্যকীয় বস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী করায় কোন আপত্তি উঠতোনা।

সেটাতো গেল অতীতের বঞ্চনার কথা। এখন স্বাধীন বাংলাদেশে, সোনালী আঁশ পাট, এবং পাট শিল্পের অবস্থাটা একটু খানি বিবেচনা করে দেখা যাক। পাট চাষীরা যেই তিমিরে ছিলো এখনো সেই তিমিরেই আছে। জীবন যাত্রার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দেশী বিদেশী অন্যান্য মালামালের মূল্য যে মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, কাঁচা পাটের মূল্য সেই মাত্রায়

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পায়নি। তাই পাটচাষীরা দারিদ্রের দুষ্ট চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর ক্রমে ক্রমে তাদের আশা আকাংখা, কর্মশক্তি, এমনকি জীবনী শক্তিও লোপ পাচ্ছে। বিলম্বে হলেও এখনো প্রতিকারের সময় আছে। কর্তৃপক্ষ যদি দেয়ালের লিখন কিছুটা বুঝবার চেষ্টা না করেন, তা হলে দেশের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

অন্যান্য শিল্পেরই মত পাট শিল্পেও ভূমির যথেষ্ট অপব্যবহার হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ভূমি অপচয় রোধের একটি পদক্ষেপ হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ জারী করা হয়েছিল যে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সুস্পষ্ট বিধান অনুযায়ী ভূমি যে প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ হয়েছে কেবলমাত্র সেই প্রকল্পের জন্যই সেই ভূমি ব্যবহৃত হতে পারে; প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়নি এমন ভূমি ফেরত দেয়ার সুস্পষ্ট বিধান রয়ে গেছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে এক একটি প্রকল্পের জন্য যেটুকু ভূমির দরকার তার বহুগুণ বেশী ভূমি অধিগ্রহণ করে ফেলে রাখা হয়। এর পিছনে একটা গুঢ় রহস্য আছে। ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় বাজার দরের চেয়ে কমমূল্যে। অতীতে তো নামমাত্র মূল্যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ভূমি অধিগ্রহণ করে ফেলে রাখলে বছর বছর মূল্য বৃদ্ধি হয়ে অনার্জিত মুনাফা কুড়িয়ে নেয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সেই মুনাফার হার প্রায় অকল্পনীয়। ২০০ টাকা বিঘায় অধিগ্রহণ করা ভূমির মূল্য ২০ বছর পরে ২০ লক্ষ টাকা হয়েছে এমন বহু উদাহরণ আছে। বঞ্চিত হয়েছে ভূমির মূল মালিক গরীব চাষী। আর অনার্জিত মুনাফা লুটছেন ধনকুবের শিল্পপতি।

এই প্রবণতা বন্ধ করার বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে একটি পদক্ষেপ ছিলো ১৯৮৪ সালের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেই আদেশ, যে আদেশে বলা হয়েছিল শিল্প স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করা যে ভূমি শিল্প প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়নি সেই ভূমি ফেরত না দেয়া পর্যন্ত শিল্পায়নের ভূমি হিসাবেই গণ্য হবে। তাই এরূপ অধিগ্রহণ করা ভূমির উপর আরোপিত ভূমি উন্নয়ন কর শিল্পায়ন ভূমির নির্ধারিত রেটে দিতে হবে। এই আদেশ জারী হওয়ার পর ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি পাটকল থেকে আপীল করা হয়েছিল যে তাদের এরূপ প্রায় ১০০ একর ভূমির শিল্পায়ন ভূমির রেটে ভূমি উন্নয়ন কর দিলে এই অতিরিক্ত কর সেই শিল্পের জন্য অহসনীয় বোঝা হয়ে যাবে। উত্তরে বলা হয়েছিল জারীকৃত আদেশ সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত। অধিগ্রহণ করা যে বাড়তি ভূমি শিল্পে ব্যবহার করা হয়নি তা আইনানুগ ভাবে ফেরত না দেয়া পর্যন্ত শিল্পায়ন ভূমির রেটে ভূমি উন্নয়ন কর দিতেই হবে। পরবর্তীতে এই বিশেষ মামলাটির কি হয়েছিলো খবর রাখিনি; কিন্তু আইনের এই যুক্তিসঙ্গত বিধান দেশের স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে চালু করতেই হবে। এতে অবাঞ্ছিত ভাবে অধিগ্রহণ করা বহু ভূমি ফেরত পাওয়া যাবে। এবং সেই ভূমিকে খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে।

www.pathagar.com

১৮·৪ চা শিল্প

চা শিল্প সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য, চা বাগানগুলোকে বরাদ্দ করা মোট ২,৮০,১৭০ একর ভূমির মধ্যে ১,৬৮,৫,৬৬ একর ভূমি দীর্ঘদিন থেকে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। হয় এই অব্যবহৃত ভূমিতে আবাদ করতে হবে, আর না হয় এই ভূমির বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সরকারের সুদৃঢ় পদক্ষেপ অপরিহার্য।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, যেসব উঁচু টিলার পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বে উন্নতমানের চা গাছ লাগানো হয় সেই সব উঁচু টিলার দক্ষিণ পার্শ্ব অনাবাদি থাকবে কেন? মেনে নিলাম, দক্ষিণ ঢালু জমিতে প্রখর রৌদ্রের জন্য চা গাছ খুব ভাল জন্মায় না। তাই যদি হয়, তা হলে এই দক্ষিণ ঢালু ভূমির বিকল্প উৎপাদনমুখী স্থায়ী ব্যবহার করা হবে না কেন? সেই দক্ষিণ ঢালু ভূমিতে কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু, কাজু বাদাম, আর এসবের আংশিক ছায়ায় আনারস চাষ কি সম্ভব নয়? কোন না কোন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন অবশ্যই সম্ভব এবং সেটা হয় চা বাগানের মালিকরাই স্বয়ং শ্রমিক নিয়োজিত করে করবেন, আর না হয় বর্গা প্রথায় বেকারদের মধ্যে সে জমি ইজারা দেয়া হোক।

মোদ্দা কথা হলো চা বাগানের কোন ভূমিই অনাবাদী ফেলে রাখা এই ভূমি ক্ষুধার্ত জাতির স্বার্থের পরিপন্থী। এই সম্বন্ধে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

১৮·৫ঃ চিনি শিল্প

এই একটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্প যার উৎপাদন ক্ষমাত্রায় এতোবেশী তারতম্য হয়ে যায় যে, কোন্ বছর কত চিনি আমদানী করতে হবে তার পূর্বাভাস দেয়া প্রায় অসম্ভব।

আমরা জানি, চিনি শিল্পের সঙ্গে স্থানীয় গুড় উৎপাদনকারীদের একটা সংঘাত লেগেই আছে। এটা দুঃখজনক। আমার মনে হয় চাষীরা তাদের লাভ ক্ষতি বুঝে এবং তাদের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তবে চিনি শিল্পের সঙ্গে আখ চাষীদের সুদীর্ঘ দিনের সংঘাতের অস্থায়ী সমাধান দেয়া আমি সমীচীন মনে করিনা। আমার মনে হয় এই স্বার্থের সংঘাতের একটা সন্তোষজনক স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগ করা উচিত। এই কমিটির দায়িত্ব আদায়ে বেশী দিন লাগার কথা নয়, কারণ সমস্যাটি তো নতুন নয়।

এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে দেশে প্রস্তুত চিনির মূল্যের সঙ্গে আর্ন্তজাতিক বাজারের চিনির মূল্যের তুলনা করে দেখা উচিত, চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানী কম করার কোন পন্থা খুঁজে বের করা যায় কিনা।

www.pathagar.com

আখের গুড়ের চাহিদা এবং এর মূল্যের পাশাপাশি খেজুরের গুড়ের চাহিদা ও এর মূল্যের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

এই পুস্তকে আমি খেজুরের গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব দিয়েছি সেই প্রস্তাব মতো কাজ করলে চিনির চাহিদা কি কিছুটা কমবে না? সাথে সাথে আখের গুড়ের চাহিদাও কিছুটা কমবে, আখ চাষীরা আখের গুড় উৎপাদনে অনেকটা নিরুৎসাহ হবে এবং চিনি উৎপাদন বাড়বে। ফলে আখ চাষীদের সহিত চিনি উৎপাদনকারী সংস্থার দীর্ঘকালীন সমস্যা লাঘব হবে। এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ হবে দেশের অর্থনীতিতে একটা প্রভাব হবে।

১৮৬ ঃ চামড়া শিল্প

আমাদের দেশের একটি অমূল্য সম্পদ, যা উৎপাদনে সরাসরি কোন ব্যয়ই হয় না, এমনকি যা উৎপাদনকারীর অজ্ঞাতে অজান্তে উৎপাদিত হচ্ছে, তা হলো গবাদি পশুর চামড়া। তাই, গবাদি পশুর চামড়া যে দেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি সূত্র তা অনেকেই হয়তো জানেন না। গরু মহিষ ও ছাগলের চামড়া কেবলমাত্র কাঁচা থেকে পাকা করলেই এক অতি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়।

দেশের বিশাল জনগোষ্ঠির জুতা, স্যুটকেইস, ব্রীফকেইস ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত চামড়া বাদ দিয়ে যে চামড়া বিদেশে রফতানী হয় তা থেকে আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে কাঁচা চামড়া পাকা করার শিল্প, যেটা তেমন কোন উচ্চতর বা কঠিন প্রযুক্তির উপর ভিত্তিশীল নয়, এই শিল্পটিও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় একচেটিয়া ভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে আবদ্ধ ছিল। তাই এই শিল্প থেকে প্রাপ্ত বিরাট বৈদেশিক মুদ্রাও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়নি। আরো দুঃখের বিষয়, স্বাধীন বাংলাদেশের ১৮ বছরেও এই শিল্পের উন্নয়ন সাধনের কোন দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাই আজও পুরো পাকা করার ব্যবস্থা অপ্রতুল থাকা হেতু আধা পাকা চামড়া অতি সস্তায় রফতানী হচ্ছে। দেশের চামড়া শিল্পকে উন্নীত করে সম্পূর্ণ চামড়া পুরো পাকা করে নেয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। দরকার ছিলো সরকারের পক্ষ থেকে দৃঢ় সংকল্প, অনুপ্রেরণা প্রদান, প্রযুক্তিগত ও স্বল্প মেয়াদী পুঁজিগত সাহায্য। সরকার সেদিকে না গিয়ে কেবল মেয়াদ বেঁধে দিচ্ছেন, যে মেয়াদের পর আধা পাকা চামড়া রফতানী করা যাবেনা। বর্তমানে এই মেয়াদের শেষ তারিখ ৩০ জুন ১৯৯০। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ চামড়া পুরো পাকা করার ব্যবস্থা হওয়ার মত কোন কার্যক্রম এখনও গ্রহণ হয়নি। তাই খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের মেয়াদের মতো আধা পাকা চামড়া রফতানীর মেয়াদও বাড়াতেই হবে,

www.pathagar.com

হয় কাঁচা চামড়াকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে। আর তখন চোরাই পথে কাঁচা চামড়া রফতানীও শুরু হয়ে যাবে।

সরকার বৃহৎ বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পে পুঁজি নিয়োগ করছেন, ভালো কথা। কিন্তু এরূপ একটি বৃহৎ নূতন প্রকল্পের পুঁজি চামড়া শিল্প উন্নয়নে ব্যবহার করে এই পুরা শিল্পকে উন্নত করে নিতে পারেন। এতে সময় লাগবে নতুন প্রকল্প স্থাপনের অর্ধেকেরও কম, আর হাজার হাজার বেকার যুবকের কর্ম সংস্থান হবে অতি সত্তর।

আমার আকুল আবেদন, সরকার অতি শীঘ্র চামড়া শিল্প উন্নয়নে মনোযোগী হোন। এতে অতি অল্প সময়ে ফল পাওয়া যাবে আশাতীত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সুপারিশ করতে চাই। এতোদিন বহুজাতিক বাটা সু' কোম্পানী এদেশে কেবল জুতাই প্রস্তুত করতো। এখন তারা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ করাও শুরু করেছে। তাদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বিত হওয়ায় যখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে এই প্রকল্প শ্রীলংকায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই (১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে) আমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করি। এবং যে কয়টি দীর্ঘদিনের স্তূপীকৃত সমস্যা প্রথমেই হাতে নেই তার অন্যতম সমস্যা ছিল বাটা সু' কোম্পানীর ট্যানারী স্থাপনের জন্য ছোট একখন্ড ভূমি অধিগ্রহণ। সমস্যাটি আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে সমাধান করে দিয়ে ছিলাম। আজ বাটা সু' কোম্পানী কাঁচা চামড়া পাকা করছে, সেই পাকা চামড়ার একাংশ রফতানী করছে, আর অন্য অংশ দিয়ে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য জুতা বানাচ্ছে। হয়তো সেই জুতাও রফতানী করবে।

আমার সুপারিশ, উন্নত মানের রফতানীযোগ্য চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতের দু'চারটি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। সঙ্গত কারণেই এই সকল শিল্প ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়া উচিত।

১৮·৭ঃ রেশম শিল্প

রেশম চাষ বাংলাদেশে নূতন কোন কার্যক্রম নয়। ১৯৭৮ সালে সেরিকালচার বোর্ড গঠিত হয়েছিলো রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে বোর্ড কর্তৃক প্রায় দশ কোটি তের লক্ষ টাকার এক ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছেঃ- ১। সম্প্রসারণ গবেষণা ২। প্রশিক্ষণ ৩। উৎপাদন ৪। বাজারজাত করণ ৫। রেশম কারখানা আধুনিকীকরণ ও ৬। তুত চাষ সম্প্রসারণ। কিন্তু বোর্ড তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। কারণ হয়তো যুক্তিসঙ্গত। পুঁজির অভাব তো সরকারী প্রায় সব কার্যক্রমেই বিদ্যমান। এই একটি শিল্প আছে যার কাঁচামাল সম্পূর্ণভাবে দেশে ফলানো সম্ভব। রাজশাহী অঞ্চলে তুত গাছ সহজেই ফলানো যায় এবং রেশমের মান ও উন্নত। এখন প্রতি বছর ৭ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার কাঁচা

www.pathagar.com

আমদানী করতে হয়। বেশী করে তুত গাছ লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদন বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব। রেশম সুতা আমদানী বন্ধ করা উচিত।

সেরিকালচার বোর্ড এর সাফল্য ব্যর্থতার বিচার আমি করছি না। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে রেশম গুটি থেকে সংগৃহীত সুতা দিয়ে রাজশাহীতে যে শাড়ী কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হচ্ছে সেগুলোর গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত। এবং দেশে বিদেশে এর চাহিদা আছে যথেষ্ট। চড়াও মূল্যে বিদেশীরা ক্রয় করে নেয় রাজশাহীর রেশমী কাপড়। এই শিল্পটি সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দিলে দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে। সেরিকালচার বোর্ড যদি দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থাৎ যেসব এলাকায়, তুত গাছ সহজে জন্মায়, এবং রেশম কীটও পাওয়া যায়, সে সব এলাকায় বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দেন, শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের সাহায্য দেন, তাহলে একটি লাভজনক পেশা সম্প্রসারিত হতে পারে। রেশম শিল্পের সম্প্রসারণের সাথে সাথে দেশের দারিদ্র বেকারত্বের আংশিক লাঘব হওয়া সম্ভব। সাথে সাথে মূল্যবান রেশমী কাপড় বিদেশের বাজারে রফতানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

১৮.৮ঃ ক্ষুদ্র শিল্প

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত মোট শিল্পের সংখ্যা তিন হাজারেরও কিছু উপর বলে জানা যায়। এই গুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে আখ্যায়িত করলেও আসলে আমাদের দেশের মতো দরিদ্রতম দেশের জন্য এর একটিও দেশে প্রচলিত অর্থে ক্ষুদ্র নয়। এর এক একটিতে গড়পড়তা পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে অন্যূন এক কোটি টাকা এবং তা করা হয়েছিল ১০/২০/৩০ বছর পূর্বে। তখন মুদ্রার মান ছিলো আজকের চেয়ে অনেক বেশী।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে এই তিন হাজারের উর্দ্ধে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ দুই হাজারের মত ক্ষুদ্র শিল্প, রুগ্ন হয়ে অকেজো হয়ে বসে গেছে। তালাবদ্ধ দুই হাজারের মত শিল্প এখন পাহারা দিচ্ছে দুই তিনজন করে প্রহরী, যাদের বেতন দিচ্ছেন শিল্পের মালিক, আর ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ মাসে মাসে স্ফীত হয়ে এক একটি শিল্পের আর্থিক বোঝা যা দাঁড়িয়েছে তা ঐ শিল্পের মালিকের দ্বারা বহণ করা সম্ভব নয়। অনেক শিল্প মালিক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে তাদের শিল্প বিনামূল্যে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। এ যেন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। নগদ একটি পয়সাও বিনিয়োগ না করে কেবল ব্যাংক ঋণের বোঝা টুকুর দায়দায়িত্ব নিয়ে এইসব শিল্পের মালিকানা নিতেও বিজ্ঞলোক প্রস্তুত নন। অবস্থাটির একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিল্প উদ্যোক্তা বা মালিক বলছেন তার সারা জীবনের সঞ্চয় ২০/৩০/৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে বড় আশা নিয়ে তিনি শিল্প স্থাপন করেছিলেন, বিসিক শিল্প

www.pathagar.com

নগরীতে। ঋণ নিয়েছিলেন বিসিক অনুমোদিত ব্যাংক থেকে। কিন্তু কারখানা উৎপাদনে যাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী চলতি মূলধন দিতে ব্যর্থ হওয়ায় উদ্যোক্তা সর্বস্ব হারা হয়ে গেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেরও বক্তব্য আছে। তারা অভিযোগ তুলছেন কোন কোন শিল্প মালিক ব্যাংক প্রদত্ত অর্থের একাংশ পাচার করে নিয়ে অন্য ব্যবসা করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

গলদ যেখানেই থাক না কেন একথা তো সত্য, দেশের এতবড় একটা সম্পদ রুগ্ন হয়ে, অকেজো অচল হয়ে, পড়ে আছে সুদীর্ঘ দিন থেকে। এর পিছনে নিয়োজিত হাজার হাজার কোটি টাকার কোন উৎপাদন তো হচ্ছেই না বরং ক্ষীত হচ্ছে অব্যবহৃত অবস্থায়ও যথারীতি চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের অংক যোগ দিয়ে দিয়ে। আর এই শিল্পগুলোতে যে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োজিত ছিলো, এবং আরো হাজার হাজার নিয়োজিত হতে পারতো তারা বসে আছে বেকার হয়ে। সর্বোপরি এতগুলো শিল্প চালু থাকলে এগুলোর সম্পূরক কাজে, যেমন কাঁচা মাল সংগ্রহে, পরিবহণে, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে, শিল্পে নিয়োজিত মালিক কর্মচারী শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট বহুলোকের আপ্যায়ন ইত্যাদি সব মিলিয়ে যে এক বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গড়ে উঠতে পারতো, এমনকি কোথাও কোথাও গড়ে উঠেছিল, এই সমস্ত কর্মকান্ড অচল, স্থবির, তালাবদ্ধ।

এযে কত বড় ক্ষতি এটার পুরো বিশ্লেষণ দিতে গেলে এক গবেষণামূলক পুস্তক লিখতে হবে। এইখানে কেবল এতটুকু বলে রাখলেই চলে যে, যখন এই সব শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয় তখন স্থানীয় লোক বুক ভরা আশা নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছিল, এই বিশ্বাস নিয়ে যে তাদের এলাকায় শিল্প স্থাপিত হলে কেবল শিল্প মালিকই নয়, তারাও প্রচুর উপকৃত হবে। তাদের কর্ম সংস্থান হবে, শিল্পে কাঁচা মাল সরবাহে তারা অংশ নিতে পারবে, শিল্প ঘিরে দোকান পাট রেস্তোঁরা গড়ে উঠবে, শিল্পে যে বিদ্যুৎ লাইন আসবে তা তাদের সম্পূর্ণ এলাকাকে আলোকিত করবে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা ভোগ তারা করবে।

এই বুক ভরা আশায় তারা বিনা প্রতিবাদে তাদের চাষাবাদের মূল্যবান ভূমি স্বল্পমূল্যে ছেড়ে দিয়েছিলো শিল্প স্থাপনের জন্য।

দুই এক বছর ইট ভাঙ্গা, বালু টানা ইত্যাদি কাজ করার পর তারা দেখলো শিল্প স্থাপনের গতি মন্থর হয়ে গেছে। তারা ভাবলো এতো টাকা খরচ করে যেখানে দালান কোঠা নির্মিত হয়ে গেছে, সেখানে কিছুটা বিলম্ব হলেও শিল্প চালু তো হবেই। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে জনগণ যখন দেখলো যে শিল্পপতি পুঁজি বিনিয়োগ করে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে অন্তত দালানগুলো বানিয়েছেন, এমন কি কোথাও কোথাও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত মূল্যবান মেশিন এনে স্থাপন করেছেন সেই শিল্পপতির আগ্রহ ও কর্মব্যস্ততা কমে আসছে, আর তারপর তিনি বলতে গেলে লা-পাত্তা। তার শিল্প প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ, প্রহরীরা বছরের পর বছর কেবল পাহারাই দিচ্ছে। জনগণ আরো লক্ষ্য করলো, যে সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ এই শিল্প অনুমোদন করেছিলেন যেসব সরকারী বড়কর্তারা এসে মহাসমারোহে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যে পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যাংক অর্থ জোগান দিয়েছিলেন, এমনকি যে বিদেশী

www.pathagar.com

অর্থ প্রদানকারী সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন, তাদের কারো আর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না।

জনগণ ভাবে, তাদের ভাগ্যে তিন বেলা ভাতও সব সময় জোটে না, রুগ্ন পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রের চিকিৎসার পয়সা জোটে না, ছেলে মেয়েদের স্কুল মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়ার সঙ্গতিও তাদের নেই। আর তাদেরই চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ, কোটি টাকা অপচয় হয়ে গেলো, তাদের চাষাবাদের ভূমিটাও হাত ছাড়া হয়ে গেলো, শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করতেই পারলো না, অথবা উৎপাদন শুরু করে, কিছু দিন পর তাও বন্ধ হয়ে গেলো। আর বছরের পর বছর তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে, এবং এই তালাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পিছনে আবার পাহারা দেবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যয় হচ্ছে মাসে মাসে। জনগণ ভাবে, এই কি একটি গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের রীতিনীতি। আলাপ আলোচনায় তারা জানে, সারা দেশের সর্বত্র প্রায় একই অবস্থা। কোন দুষ্ট লোক হয়তো তাদেরকে কানে কানে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন কালের সেই প্রবাদ বাক্য "সরকার কা মাল দরিয়া মে ঢাল" আরো বলে দেয় বর্তমান কালের প্রবাদ বাক্যঃ 'শিল্প স্থাপন তো চালাক লোকের দেশী বিদেশী টাকা লুটের এক আধুনিক জটিল ষড়যন্ত্র', এই যে তালাবদ্ধ শিল্প পড়ে আছে, এটা চালু করার মধ্যে এখন আর কারো কোন স্বার্থ নেই, স্বার্থ যা ছিল তা আদায় হয়ে গেছে। আবার এই রুগ্ন শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যখন মোটা অংকের দেশী বিদেশী টাকা মঞ্জুরী হবে তখন আবার দেখবেন ঐ টাকার পিছনে হোমড়া চোমড়া ব্যক্তিদের দৌড়ের প্রতিযোগীতা। কিছুদিন পর আবার পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে। আবার মিল বন্ধ হবে, ঐ টাকা আত্মসাতের পুনরাবৃত্তির জন্যে।

এই সব প্রচারণার অনেকটাই সত্য নয়। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে জনগণ এই সব প্রচারণার সব কথাই বিশ্বাস করে নেয়। তাই তো জনগণ হতাশাগ্রস্ত। তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সমাজের উপর, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে রাষ্ট্রের উপর, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের উপর। যে জনগণ বিশ্বাস করে দেশের সর্বত্রই প্রতারণা ফাঁকি, কথায় ও কাজে মিল নেই, বিত্তশালীরা পর্যন্ত রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিচ্ছে, আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার কোন প্রতিকার করা হচ্ছে না, সেই জনগণের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে?

১৮.৯ ঃ পশু খাদ্য শিল্প

বাংলাদেশের মানুষ সনাতনী পন্থায় বছরের সাত মাস শুষ্ককালীন মৌসুমে গোচারণ ভূমিতে গবাদী পশুকে ছেড়ে দিয়ে পশু খাদ্যের প্রধান সমস্যার সমাধান করেন। বর্ষাকালীন পাঁচ মাসের মধ্যে মাস দুয়েক পর্যন্ত গবাদী পশুকে এদিকে সেদিকে সারাদিন ঘুরিয়ে নিলে গবাদী পশু প্রাকৃতিক নিয়মেই তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যা কিছু খাবার পায়

www.pathagar.com

তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ভারী বর্ষণের সময় ও বন্যাপ্লাবনের সময় মাস তিনেক গবাদী পশুকে গোয়াল ঘরে রাখতে হয়। এই সময় সঞ্চয়কৃত খড়ই হয় গবাদী পশুর প্রধান খাদ্য।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং চলাচলের রাস্তা, সেচের খাল ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য দেশের সীমিত ভূমির উপর যে অসম্ভব চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রথম শিকার হয়ে গেছে গোচারণ ভূমি। এখন আর দেশে গোচারণ ভূমি নেই বললেই চলে। তাই পশু খাদ্য এখন একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি আমাদের এই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশ সমূহে, গবাদী পশু চারণ করে খাদ্য সংগ্রহের প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কয়েক শতাব্দী পূর্বে। প্রকৃত পক্ষে গোচারণ ভূমি নামক নির্দিষ্ট জায়গা সংরক্ষিত রাখা ভূমিরই একটা অপচয়। গোচারণ ভূমিতে গবাদী পশুর খাদ্য জন্মাবারই সুযোগ পায়না। একদিকে পশুর শক্ত খুরের চাপে অধিকাংশ ঘাস অংকুরিতই হতে পারে না। আর যেটুকু অংকুরিত হয় সেটাতো পশু সঙ্গে সঙ্গেই গলাধঃকরণ করে ফেলে। সারা বিশ্বে তাই আজ গবাদী পশুর চারণ বন্ধ হয়ে গেছে। গবাদী পশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎশিল্পে উৎপাদিত হচ্ছে। আর গবাদী পশুকে খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে গোশালায়।

এই আলোচনা আমরা কেবল গবাদী পশুর খাদ্যের মধ্যেই সীমিত রাখবো না। আমরা এটাকে পশু খাদ্য নাম দিয়ে গৃহপালিত সকল পশু পাখি, এমনকি মৎস্য বা জলীয় প্রাণীর খাদ্যের অর্ন্তভূক্ত করে নিবো। কারণ গবাদী পশুর উন্নতমানের খাদ্য কেবল গৃহপালিত পশু পাখির খাদ্যই নয়, জলীয় প্রাণীরও খাদ্য।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের প্রথম স্বাধীনতার ৪২ বছরে, এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতার ১৮ বছরেও বাংলাদেশে উন্নতমানের ব্যাপক ভিত্তিক পশু খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী এপনো নিশ্চিত হয়নি। অথচ ১৯৬০ এর দশকে পাকিস্তানে কোন কোন বহুজাতিক ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানী বিপুল পরিমাণে পশু খাদ্য প্রস্তুত করতো। আজ বাংলাদেশে গবাদী গৃহপালিত পশু পাখি পালনে এবং মৎস্য চাষ কার্যক্রমে যে দৈন্যতা, যে উদাসীনতা, অবহেলা দেখা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণই হলো, পশু পাখি ও মৎস্যের খাদ্যের অভাব। আজ বাংলাদেশে যেখানে বছরে ৯০ লক্ষ টন দুধের দরকার সেখানে উৎপাদিত হয় মাত্র ১৩ লক্ষ টন। আজ সারাবিশ্বে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহেও যখন মোরগ-হাঁসের মাংস ও ডিম পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে, তখনো আমরা হাটি-হাটি পা-পা করছি। আজ বাংলাদেশে ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার পুকুর-জলাশয়ে যথেষ্ট মৎস্য চাষ করা যাচ্ছে না, মূলতঃ খাদ্যেরই অভাবে। এই ব্যর্থতাকে কি বলে অখ্যায়িত করবো। এটাকি আসলে ব্যর্থতা, না পরিকল্পিত কোন ষড়যন্ত্রের ফল? সরকার আজ যখন শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে দেশটাকে উন্নত করার সংকল্প নিয়েছেন, তখন আমার একান্ত অনুরোধ, গৃহপালিত পশু পাখি ও জলাশয়ে পালিত মৎস্যাদির খাদ্য প্রস্তুতকে সর্বাধিকার দেয়া হোক। কারণ এই শিল্প যে দ্রব্য উৎপাদন করবে, সেটা দেশের খাদ্য উৎপাদনে দ্রুতগতিতে সরাসরি অবদান রাখবে; আর সাথে সাথে দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

www.pathagar.com

আমরা জানি গৃহপালিত পশু এবং মৎস্যাদির খাদ্য বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন মানের ও বিভিন্ন মূল্যের। আমাদের প্রস্তাব, গ্রামে গ্রামে পশু পাখি মৎস্যের খাদ্যের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন করা হোক। জেলায় উপজেলায় আরেকটু উন্নতমানের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা হোক। এবং জাতীয় পর্যায়ে বৃহৎ আকারের সর্বোন্নত মানের পশু খাদ্য উৎপাদনের জন্য বৃহৎ শিল্প স্থাপন করা হোক। শুনেছি বাংলাদেশের কেউ কেউ নাকি পশু খাদ্য শিল্প স্থাপন করে এটাকে অলাভজনক রুগ্ন শিল্প হিসাবে ফেলে রেখেছেন। এটা যদি সত্য হয় তাহলে এর সমাধান বের করতে হবে। এটা যদি ঋণের মূলধন পাচারের অজুহাত হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিকারের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের শিল্প মন্ত্রনালয় এখন তড়িৎকর্মা ব্যক্তিগণ কতৃর্ক পরিচালিত। তাই তড়িৎ গতিতে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকবো।

গৃহপালিত পশু পাখির ও জলাশয়ের মৎস্যাদিকে তো আর উপোস রাখা যাবে না। তাই অর্ন্তবর্তীকালে জনগণকে সক্রিয় হতে হবে। বাড়ীতে বাড়ীতে সীমিত আকারে হলেও পশু খাদ্য প্রস্তুত সম্ভব। খড়ের সঙ্গে ইউরিয়া মিশিয়ে উন্নত মানের পশু খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইপিল ইপিল নামীয় অতিদ্রুত বর্ধণশীল বৃক্ষের পাতা পশুর প্রিয় খাদ্য। ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রত্যেক বাড়ীতে ছোট্ট একটু জায়গায় ৪০/৫০টি ইপিল ইপিলের বীজ লাগিয়ে দিলে চারাটি মাস তিনেকের মধ্যে ৮/১০ ফুট লম্বা হয়ে যায়। তখন এর পাতা খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে গবাদী পশু সানন্দে ভক্ষণ করে। বাড়ীতে বাড়ীতে নেপিয়ার ঘাসের ৫০টি চারা লাগিয়ে একটু যত্ন করলে কিছু দিন পরপরই গবাদী পশুকে এই উন্নত মানের ঘাস খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যায়, এগুলোর বীজ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে পাওয়া যায়। চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষারখৈল ইত্যাদি মিশিয়ে মোরগ–হাঁস ও পুকুরের মাছকে দিলে অতিদ্রুত গতিতে বর্ধিত হয়।

১৮·১০ঃ কয়লা

"৬০ টাকা মন দরে খোলা বাজারে কয়লা বিক্রয় হইতেছে" দৈনিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত খবরটি বিজ্ঞ পাঠকের মনে নাড়া দেওয়াই স্বাভাবিক। পাঠকবর্গের মনে এই প্রশ্ন জাগাও স্বাভাবিক যে, সাধারণ অদক্ষ মানুষ যে কয়লা উত্তোলন করছে নিশ্চয়ই প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে সেই কয়লা উত্তোলন ও সরবরাহে খুব বেশী অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অভিজ্ঞ মহলের অভিমত সরকার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই কয়লা অচিরেই দেশীয় অর্থনীতিতে এক উন্নয়নমুখী জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে। আমার বিশ্বাস সরকারী সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানায় এই শিল্প স্থাপনের অনুমতি দিলেও, বেসরকারী পর্যায়ে এই ভূ–গর্ভ সম্পদ উত্তোলন ও সরবরাহের মাধ্যমে বেকারত্ব বিমোচন ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

www.pathagar.com

খনিজ সম্পদ বিশেষজ্ঞদের সুনিশ্চিত অভিমত, দেশের সীতাকুন্ড উপজেলার কদম রসুল এলাকা, বগুড়া জেলার কুচসা এলাকা ও জয়পুর হাট জেলার জামালগঞ্জে, দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় প্রচুর পরিমাণ উন্নতমানের কয়লা ভূ-গর্ভে অনাহোরিত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত রংপুর জেলার পীরগঞ্জে যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যাবে তাই দেশের শত বছরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। বিশেষজ্ঞদের আরো অভিমত যে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আরো কয়লার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আর্ন্তজাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে জামালগঞ্জের কয়লা ভারতের রাণীগঞ্জের কয়লার সমতুল্য। বিশেষজ্ঞদের মতে ১১০ মিলিয়ন টন কয়লা শুধু মাত্র বড়পুকুরিয়া ও জামালগঞ্জে পাওয়া যাবে, যার পরিমাণ আরো বেশীও হতে পারে।

কয়লা শুধু জ্বালানীই নয়, কয়লা শিল্পের বিকাশের ফলে সাথী শিল্প হিসাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, খাদ্য ও রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্রশিল্প, সিমেন্ট ও কাগজ শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা নিশ্চিত। এছাড়া গার্হস্থ্য জ্বালানী সংকট মোচন, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার নিশ্চিত করণ ও বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যাদি (যেমনঃ আলকাতরা, বেনজিন, টলুইন, ফেনল, ন্যাপথলিন, নাইলন, প্লাষ্টিক, প্রসাধন সামগ্রী, বিভিন্ন রং ইত্যাদি) প্রস্তুতকারী শিল্পের বিকাশ সম্ভব।

১৮.১১ ঃ পীট

ইরেজী পীট শব্দের বাংলা কোন প্রতি শব্দ খুজেঁ পাইনি। সাধারণ ভাবে যা বুঝি তা হলো পীট অপরিপক্ক কয়লা। অভিধান মতে পীটের অর্থ হলো "জল সিক্ত হওয়ায় বিকৃতাকার প্রাপ্ত এবং আংশিক অঙ্গারীভূত জলাভূমির উদ্ভিদ পদার্থঃ ইহাকেই শুকাইয়া জ্বালানীতে পরিণত করা হয়।" পুঁথি পুস্তকে পড়েছি এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন পীটের বয়স কয়েক হাজার বছর এবং পাকা কয়লার বয়স তার দিগুণ বা ততোধিক।

সকলেই জানেন বাংলাদেশের গভীর ভূ-গর্ভে উন্নতমানের কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে। বিগত কয়েক যুগ ধরে সেই কয়লা উত্তোলনের জন্য সরকারী পায়তারা চলছে। আমার বর্তমান আলোচনায় খনিজ পদার্থকে গণ্য করছি না। আমি কেবল সেই সব প্রাকৃতিক সম্পদকেই বিবেচনায় নিচ্ছি যেটার উত্তোলন মানুষের হাতে করে নেয়াই সম্ভব। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি পীট উত্তোলন অতিসহজ। বাংলাদেশের একটি বিরাট এলাকার জনগণ পীটকেই তাদের প্রধানতম জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করছেন যুগ যুগ ধরে।

১৯৪৮ সালে তদানীন্তন সিলেট জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান হিসাবে কতোয়াল নামক জাহাজে সুনামগঞ্জ মহকুমার আজমীরিগঞ্জ থানা পরিদর্শনে যাচ্ছিলাম। দেখলাম নদীর দুই তীরের উপড়ে কালো রঙের সুউচ্চ টিবি। মাঝে মাঝে মেয়েরা ঐ সব টিবির উপর থেকে শুক্না গোবরের মত জিনিসটি ঝুড়ি ভর্তি করে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষের

www.pathagar.com

সারেংকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন এটা এক প্রকার কালোমাটি; নদীর কিনার ভেঙ্গেপড়ার সময় বের হয়ে আসে আর গ্রামবাসীরা এটা উঠিয়ে শুকাবার জন্য ঐসব ঢিবি তৈরী করে রাখেন। তারপর আবশ্যকমত ঢিবির উপর থেকে ঐ কালো মাটি নিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করেন। কৌতূহল বশতঃজাহাজ নদীর কিনারে লাগালাম। নেমে গিয়ে ঐ "কালো মাটি" হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখলাম। শুকানোর পর এর ওজন মাটির ওজনের অনেক কম। গ্রামবাসীরা বললেন, সুনামগঞ্জের বিশাল হাওর এলাকায় বহুসংখ্যক নদী ও খালের তীরবর্তী জনগণের জ্বালানী ঐ কালো মাটি।

প্রশ্নের উত্তরে গ্রামবাসীরা আরো বললেন ঐ সব হাওর এলাকার প্রায় সর্বত্র দু-চার ফুট মাটির নীচে এই কালো মাটি ভর্তি। আমার অনুরোধে একজন যুবক দৌড়িয়ে কোদাল নিয়ে এসে নদীর তীর থেকে কয়েকগজ দূরে দু-তিনটি কোপ মারতেই বেরিয়ে আসলো ভেজাভেজা কালো মাটি, ওজন প্রায় মাটিরই মত। তবে একটু মচকালেই ভেঙ্গে যায়। কয়েক সের ঐ কালো মাটির নমুনা সঙ্গে নিয়ে গেলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও এক ব্যক্তিগত চিঠিসহ ঐ কালো মাটি পাঠিয়ে দিলাম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রধান জনাব জাকির হোসেনের কাছে। উত্তরে তিনি জানালেন ঐ কালো মাটির নমুনা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে। ১৯৫০ সালে আমি যখন নোয়াখালী জেলার পুলিশ প্রধান তখন সংবাদ পত্রে দেখলাম পূর্ব পাকিস্তানের হাওর অঞ্চলে মাটির স্বল্প নীচে যে পীট বা কাঁচা কয়লা পাওয়া গেছে তার পরিমাণ ও অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ করাচী থেকে আগমন করছেন। তারপর ধীরে ধীরে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

৩৫ বছর পর বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী হিসাবে যখন জগন্নাথপুর উপজেলায় যাই তখন স্পীড বোট থেকে প্রত্যক্ষ করি সেই তিন যুগ পূর্বের দৃশ্য। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা বললেন সেই যে তিন যুগ পূর্বে একটা জরিপ হয়েছিলো তারপর আর কোন কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়নি। আবার নমুনা সাথে নিয়ে ঢাকা ফিলে আসলাম। কথা বললাম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদের সঙ্গে। তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ভূ-তাত্ত্বিক পরিদপ্তরের পরিচালক জনাব আবু বকরকে। প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি এসেই বললেন ১৯৫০ সালের সেই জরিপের সম্পূর্ন রিপোর্ট তার পরিদপ্তরে মজুত আছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সকল পীট পাওয়া যায় তার নমুনাও সংরক্ষিত আছে। তদুপরি তার পরিদপ্তরে পীট সম্বন্ধে প্রচুর পুঁথি পুস্তক আছে। দু-তিনজন পীট বিশেষজ্ঞও আছেন।

যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার পর ভূ-তাত্ত্বিক পরিদপ্তরে গিয়ে আমি মিলিত হই প্রায় ১ ডজন ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের সাথে। তাদের কাছ থেকেই জানতে পারি বাংলাদেশের হাওর এলাকায় মাটির উপর স্তরের মাত্র কয়েক ফুট নীচে যে পীট মজুদ আছে তার পরিমাণ আনুমানিক ৩০০ বিলিয়ন মেট্রিক টন। এর মধ্যে কেবল ফরিদপুর জেলায়ই ১২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

www.pathagar.com

সারা দেশের ভূ-তাত্ত্বিক সার্ভে তো হয়নি। দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে নদীর পানি দিয়ে ভেসে আসছে পীট। এগুলোর সূত্রই এখনো জানা যায়নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঢাকা জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় স্বচক্ষে দেখেছি প্রচুর পীট।

ভূ-তাত্ত্বিক পরিদপ্তরের জাদুঘরে গিয়ে দেখলাম সংযত্নে রক্ষিত বহু নমুনার মধ্যে স্থান পেয়েছে ঐ কাঁচা কয়লার অনেকগুলো নমুনা। ১৯৪৮ সালের আজমীরিগঞ্জের নমুনাটি দেখে মনে হলো সেটাই আমার পাঠানো নমুনা।

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনায় বসলাম। বললাম বাংলাদেশে জ্বালানীর প্রকট অভাব হেতু মোটা অংকের কয়লা, কেরোসিন আমদানী করতে হচ্ছে। আর বললাম স্কটল্যান্ডের মতো গ্রেট বৃটেনের একটি ছোট্ট প্রদেশ যদি উন্নয়নের শীর্ষ তালিকায় স্থান লাভ করার পরও পীটকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পড়ে থাকা পীট ব্যবহার করে আমাদের দারিদ্র মোচনে অন্তত কিছুটা অগ্রসর হতে পারিনা। উত্তরে একজন বিশেষজ্ঞ বললেন ১৯৫০ দশকের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেছে যে পীট আহরণ ও সংকুচিত করে একে একটা নির্দিষ্ট আকার দেয়া এবং এর পরিবহণে যা খরচ পড়বে তাতে এটা মূল্যের দিক দিয়ে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আরেকজন বিশেষজ্ঞ বললেন ১৯৬০ এর দশকে যশোর জেলার কোন এক স্থানে পরীক্ষা মূলক ভাবে একটি ইটের বাটায় কয়লার পরিবর্তে পীট ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ফল হয়েছিল সন্তোষজনক। কিন্তু তারপর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ১৯৫০ বা ১৯৬০ দশকে জ্বালানীর যে মূল্যছিল ১৯৮০ দশকে তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তদুপরি পীট উত্তোলন বা আহরণ তো একটি খন্ডকালীন কাজ। মহিলারাতো বটেই, এমনকি ছেলেমেয়েরাও এই কাজ করছে। কেবল সংকোচন করে ইটের মত ঘন ও শক্ত আকারে পরিবর্তিত করে সূর্য রশ্মিতে শুকিয়ে নিলেই তো এটা বাজারজাত করণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পীটকে এখন মূল্যের দিক থেকে জ্বালানী কাঠের তুলনায় সস্তা হবে কিনা।

একজন বিশেষজ্ঞ দৃঢ় প্রত্যয়ে বললেন বর্তমান জ্বালানীর দুর্মূল্যের বাজারে পীট অবশ্যই সস্তায় বাজারজাত করা সম্ভব হবে। তার পরই মন্ত্রী সভার এক নিয়মিত বৈঠকে আমি বিষয়টির অবতারণা করলাম। প্রেসিডেন্ট এরশাদ গভীর মনযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শুনে অনতিবিলম্বে স্বচক্ষে পীট এর অবস্থান দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়াল এডমিরাল মাহবুব আলী খানও সাথে যেতে চাইলেন। নির্দিষ্ট দিনে আমরা হেলিকপ্টারে আজমীরিগঞ্জ গিয়ে পৌছলাম। স্পীট বোটে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা গিয়ে পৌছলাম নদীর পাড়ে বিস্তৃর্ণ মাঠে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ব্যবস্থাপনায় কয়েকজন লোক কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রেসিডেন্ট এরশাদকে বললাম আপনার পছন্দমত যেকোন একটি স্থান দেখিয়ে দিন, সেখানেই কোপ দিলে দেখা যাবে মাটির নীচে কালো মাটি নামক পীট। রাষ্ট্রপতি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি উঁচু স্থানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। কোদালের এক কোপ দুই কোপ তিন কোপ। তারপরই আসলো কাংখিত সেই কালো মাটি। একটু ভেজা ভেজা। কিন্তু হাতে নিলে ময়লা লেগে থাকে না। রিয়াল এডমিরাল

www.pathagar.com

এম এ খান অন্য আরেকটি স্থান দেখালেন। আবার সেই অভিজ্ঞতা। কোদালের তিন/চার কোপ পরেই পীটের স্তর। গর্তটি একটু বড় করে দেখা গেল স্তরটি বিন্যস্ত, কিন্তু এর গভীরতা আঁচ করা গেল না। স্থানীয় জনগণ বললেন ঐ স্তর সর্বত্রই চার/পাঁচ ফুট পুরু।

আজমীরিগঞ্জ হাওরের মধ্যে অবস্থিত নদী মাতৃক এলাকা। কয়েক হাজার ছোট ছোট নৌকা বোঝাই করে এসেছেন লক্ষাধিক নারী পুরুষ রাষ্ট্রপতির বাণী শুনতে। শ্রোতাদের একাংশ নদীতে ভাসমান, একাংশ ডাংগায়, আর এক অংশ গাছের ডালে ডালে অবস্থান নিয়েছে।

সেই জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বল্লেন আপনাদের এই এলাকায় মাটির নীচে যে কালো সম্পদ রয়ে গেছে তা প্রক্রিয়াজাত করে দেশের জ্বালানী সমস্যা লাঘব করা যাবে; আর এই উৎপাদন হবে আপনাদের অর্থ উপার্জনের এক নূতন পথ।

তারপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিদপ্তরে শুরু হলো নূতন গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা। তার সমাপ্তি হয়েছে বলে মনে হয় না। এই সম্পদটিকে আদৌ ব্যবহার করা হবে কিনা এর কোন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়নি। কিন্তু স্থানীয় জনগণ নির্বিবাদে নিজের খেয়াল খুশিমত দেশের এই সম্পদ ব্যবহার করে যাচ্ছে। উপরে প্রদত্ত পরিসংখ্যানে যে সবস্থানে পীট এর অবস্থান দেখানো হয়েছে তা ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক নদী দিয়েই ভেসে আসে পীট।

আমার প্রস্তাব, আর বিলম্ব না করে পীট উত্তোলন আহরণের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ঘোষণা করে বেসরকারী খাতে এই অমূল্য জ্বালানী উত্তোলন আহরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের আশু ব্যবস্থা করলে দেশের অর্থনীতিতে এক উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখবে। আহরণ ও উত্তোলনের কাজে হাজার হাজার পুরুষ ও নারীর কর্ম সংস্থান হবে। ভেজা ভেজা নরম কালো মাটিকে সংকুচিত করে ইটের আকার দিতেও আরো হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ এক নূতন ব্যবসার সৃষ্টি করবে। এই ব্যবসায় অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক নিয়োজিত হতে পারবে।

বর্তমানে ইট পোড়ানোর জন্য লক্ষ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা আমদানী করতে হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিতে হয় তা বেঁচে যাবে–

আমরা যদি বছরে আমদানীকৃত কয়লার দ্বিগুণ পীট উত্তোলন করি তাহলে এই মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে পারি। সাথে সাথে দারিদ্র প্রপীড়িত এই দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে। বেকারত্ব বিমোচনের সাথে সাথে ঐ পীট সমৃদ্ধ এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থারও একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

আমার প্রস্তাব পীট এর পরিকল্পিত উত্তোলন ও সঙ্কুচিত করণের একটি কুটির শিল্পের প্রকল্প সহসাই প্রস্তুত করে হাজার হাজার যুবক যুবতীকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হোক। এটা শুরু হয়ে গেলে অর্থনীতির স্বয়ংক্রীয় প্রক্রিয়ায় বাজারজাতকরণও আরম্ভ হয়ে যাবে এবং আরো হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে।

www.pathagar.com

১৮·১২ ঃ চুনাপাথর

বাংলাদেশে সাবেক সিলেট জেলার, বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক এলাকায় প্রচর চুনাপাথরের খনি আছে। যুগ যুগ ধরে স্থানীয় অদক্ষ শ্রমিকরা এই চুনাপাথর, মাটি খুড়ে উত্তোলন করে আর প্রধানত নৌকায় ঢাকা ও বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। এছাড়াও সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভূ-পৃষ্ঠের উপর কিছু চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর জয়পুর হাটে ভূ-গর্ভে বিপুল পরিমাণ চুনাপাথরের খনি আবিকৃত হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশে যে পরিমাণ চুনাপাথর মজুত আছে, তা দিয়ে এক বা একাধিক সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা সম্ভব। দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে এদেশেরই অবহেলিত উপেক্ষিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের এটা আরেক সূত্র। আমাদের দেশে প্রাপ্ত চুনা পাথরের মান কোন অংশেই অন্য কোন দেশের চুনা পাথরের চেয়ে নিম্নতর নয়। আমাদের দেশে আমদানীকৃত শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে সিমেন্ট একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকার সিমেন্ট আমদানী করে থাকে। অথচ এই সিমেন্ট প্রস্তুতের প্রধান উপাদান চুনা পাথর আমাদেরই দেশে অবহেলিত উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার অভিমত, ছাতকের চুনা পাথরের উপর ভিত্তি করে যেমন ছাতক সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছিলো সেই বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে, তেমনিভাবে জয়পুরহাটে ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চুনাপাথর ভিত্তিক বিরাট সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করে অচিরেই বিদেশ থেকে সিমেন্ট আমদানী বন্ধ করা হোক।

১৮·১৩ ঃ বোলডার বা গোল পাথর

সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার উত্তরে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষে, খাসিয়া জৈয়ন্তীয়া পাহাড় ও গারো পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের দেশেরই অভ্যন্তরে প্রচুর গোল পাথর মজুত আছে। মাঝারী ও ছোট আকারের বোলডারের সাথে প্রচুর পরিমাণে শিঙ্গুল বা নুড়ি পাথরও মজুত আছে। উত্তরবঙ্গের নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার উত্তর সীমান্তেও ঐ সব পাথর বেশ কিছু মজুত আছে।

বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সীমান্তবাসীরা নানা দুর্ভোগ সহ্য করেও এই সব পাথর সংগ্রহ করেন। এর কিয়দংশ ব্যবহৃত হয় স্থানীয় এলাকায় আর অধিকাংশ চলে যায় দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে।

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ নামক স্থানে বাংলাদেশ রেল বিভাগের পাথর সংগ্রহ করার ও ভাঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সীমানার কয়েকশত গজের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়েছিল

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলে। যে কারণেই হোক, এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। এর অবস্থানের চর্তুপার্শ্বের বিরাট এলাকা জুড়ে পাথর আর পাথর। অথচ তারা আহরণ করেন অতি স্বল্প পরিমাণ পাথর। বছরে বছরে লোকসান দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। এটা বিরাষ্ট্রীয়করণ অপরিহার্য।

আরেকটু উজানে গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং নামক স্থানে পাথরের বৃহত্তম কোয়ারী বা খনি। সেখানে স্থানীয় হাজার হাজার লোক প্রত্যহই পাথর সংগ্রহ করেন এবং সেটা বিক্রয় করেন ফড়িয়াদের কাছে অত্যন্ত সস্তায়। ফড়িয়ারা আবার এগুলো বিক্রয় করেন মহাজনদের কাছে তাঁরা ট্রাকে তুলে পাথর নিয়ে যান সিলেটে। উল্লেখ্য যে বৃটিশ আমলে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিলেট শিলং সড়ক দিয়েই ঐ সব ট্রাক যাওয়া আসা করে জাফলং। এখন সেই সড়কের অবস্থা বিশেষ করে, লোহার নড়বড়ে পুলগুলোর অবস্থা এতই দুর্বল যে যানবাহন চলাচলে সময়ের অপচয় হয়, গাড়ীর ক্ষতি হয়, আর দুর্ঘটনার ঝুঁকিতো আছেই। এই সব কারণে সস্তায় সংগৃহীত পাথরের মূল্য অপরিমিতভাবে বাড়তে থাকে।

উল্লেখ্য যে সিলেটের এই বোলডারের মান উন্নত। এরূপ বোলডার ভেঙ্গে নুড়ি বানিয়ে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয় কংক্রীট এর কাজে। ইটের চেয়ে এইসব পাথর বহুবেশী শক্ত। তাই ইট ভেঙ্গে কংক্রীটে ব্যবহার করার চেয়ে ঐসব শক্ত বোলডার ভেঙ্গে নুড়ি বানিয়ে আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে বড় বড় পুলে, আকাশ চুম্বি দালান নির্মাণে। বর্তমান সময়ে ইট পোড়ানোর জ্বালানী বিশ্রাটের জন্য ইটের মান হয়েছে নিম্নমুখী, আর মূল্য উর্ধ্বমুখী। তাই বোলডারের চাহিদা বেড়েই চলেছে।

সরকার একটুখানি উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত এলাকায় যে বোলডার পাওয়া যায় তার উত্তোলন, পরিবহণ ও ভাংগনের ব্যবস্থা একটু সুগম করে দিলে বাংলাদেশ রেলওয়ের আর ভারত থেকে পাথর আমদানী করতে হতো না। কংক্রীটের কাজের জন্য নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করে বিরাট বিরাট পুল ও বহুতলা দালানের ছাদ ঢালাইয়ে ব্যবহৃত কংক্রীটের মান উন্নততর করা সহজ হতো। রাস্তার কার্পেটিং এ ব্যবহারের জন্য প্রচুর শিঙ্গলস্ এবং অতি উন্নতমানের বালু একই এলাকা থেকে আহরণ করা যেতো সর্বোপরি গ্যাস, কয়লা বা কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানোর আবশ্যকতা কমে যেতো, ইট ভাঙ্গা মজুরগণই পাথর ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত হতেন।

কেউ কেউ বলেন সিলেটের, তথা বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে বোলডার যা আছে তার পরিমাণ সীমিত। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই বিতর্কে যাব না। কিন্তু স্বচক্ষে যা বারে বারে দেখেছি তাতো অবিশ্বাস করতে পারি না। খরস্রোতা নদীর হাটু পানিতে এক এক জন লোক ঠিক একই স্থানে দাঁড়িয়ে পানির নীচ থেকে পাথর উঠাচ্ছে, আর ছোট নৌকায় খটখট করে রাখছে। ভোলাগঞ্জে ১৯৪৭ সনে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, ১৯৮৪ সালেও ঠিক সেই দৃশ্যই দেখেছি। ৫০০ থেকে ১০০০ নৌকা নিয়ে এই কাজ চলছে। প্রতিটি নৌকায় দুজন লোক। নৌকা জট নেই কারণ বিরাট এলাকা। হাজার হাজার নৌকা সঙ্কুলান হবে। একটি পাথর উঠাতেই প্রচন্ড স্রোতের ঠেলায় আরেকটি পাথর এসে ঐ স্থান দখল করে

www.pathagar.com

নিচ্ছে। তাই নৌকা বোঝাই হয়ে গেলে দুজন লোক নৌকায় উঠে যায়, আর স্রোতের ঠেলায় নৌকা ভাটির দিকে যেতে থাকে। একটু গভীর নদীর পাড়ে সংগৃহীত পাথর স্তূপিকৃত করে ঐ দুজন শ্রমিক সজোরে ঠেলে খালি নৌকা নিয়ে উজানমুখী যায়, আবার পাথর সংগ্রহের জন্য। আর সুবিধামত স্থানে গিয়ে ঐ একই কাজ করতে থাকে অবিরাম ভাবে।

ভোলাগঞ্জে বাংলাদেশ রেলওয়ে পাথর সংগ্রহ করে ক্রেইন দিয়ে। সেই ভারী ক্রেইন তো স্থিতিশীল। ডানে, বায়ে, সামনে মাত্র ৫০/৬০ গজের মধ্য থেকে উঠাচ্ছে বিরাট ঝুড়ি ভরতি পাথর। বাঁদিক থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘুরছে, আর পাথর উঠাচ্ছে। ডান সীমানায় পৌঁছে আবার বাঁদিকে ঘুরছে। বছরের পর বছর একই পরিধির ভিতর থেকে পাথর উঠছে। পাথর তো নিঃশেষ হয়নি। তবু বিশেষজ্ঞরা পাথরের পরিমাণ সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাথর উত্তোলনের, পরিবহণের ও ভাংগার ছোট খাটো অসুবিধা দূর করে দিলে বাংলাদেশের নদীর ভাঙ্গন বন্ধ করার জন্য, রেল লাইনের জন্য এবং কংক্রীটের জন্য আবশ্যকীয় সম্পূর্ণ বোলডার, নুড়ি পাথর ও উন্নতমানের বালু সংগ্রহ করা সম্ভব হবে ঐ এলাকা থেকেই, আর সাথে সাথে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বেকার ও অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।

১৮·১৪ কুটির শিল্প

অনেকেই বলেন বাংলাদেশের দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের পথ নিহীত আছে কুটির শিল্পের মধ্যে। কুটির শিল্পের একটু ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তারা বলেন, দেশের প্রচুর বাঁশ বেত ইত্যাদি আঁশ জাতীয় কাঁচা মাল রয়ে গেছে, যেগুলো দিয়ে বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে পারে।

প্রায় দুই যুগ পূর্বে শুরু হয়েছিলো পাটের সিকা তৈরী এবং রফতানী। প্রাথমিক ভাবে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছিলো। তারপর ধীরে ধীরে স্থিমিত হয়ে গেল সিকা রফতানী এবং অনিবার্য কারণে সিকা উৎপাদন। তবে পাটের সেন্ডেল ও জুতা পশ্চিমা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তখন থেকে পাটের জুতা আর সেন্ডেল রপ্তানী চালু আছে। কিন্তু পাটের জুতা ও সেন্ডেল তৈরী আর হস্তশিল্প বা কুটির শিল্প নয়। এগুলো এখন বেশ বড় আকারের যান্ত্রিক শিল্পে পরিণত হয়েছে।

বাঁশ বেতের হস্ত শিল্প ও প্রথমে বেশ প্রসার লাভ করেছিলো। কিন্তু ফিলিপাইন ও তাইওয়ানের সঙ্গে নৈপুণ্য ও উৎকর্ষতার প্রতিযোগিতায় আমাদের অদক্ষ হাতের তৈরী ঐ সব হস্তশিল্প সুবিধা করতে পারছে না। তবু বেশ কিছু লোক এখনো বাঁশ বেতের হস্তশিল্পে নিয়োজিত আছেন।

কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পের প্রসার নির্ভর করছে দু'টি শর্তের উপর। প্রথমতঃ বিভিন্ন ধরনের প্রচুর কাঁচামাল উৎপাদন হতে হবে। দ্বিতীয়ত কুটির শিল্পীদের চটপটে

www.pathagar.com

বিদ্যুৎ বেগে হাত চালাতে অভ্যস্ত হতে হবে। আমাদের দেশে এই দুটিরই অভাব। হস্ত শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছেনা। বাঁশ, বেত, মুরতার অভাব। নুতন নুতন কাঁচা মাল উৎপাদনের উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনা নেই বললেই চলে।

দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" যে সব প্রস্তাবনা আমরা দিয়েছি, এগুলো বাস্তবায়িত হলে কুটির শিল্পের প্রচুর কাঁচা মাল এদেশেই উৎপাদিত হবে।

আমাদের প্রস্তাবানুযায়ী, অবিলম্বে কাঁচামাল উৎপাদন শুরু হবে এই আশার উপর ভিত্তি করে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেলা উপজেলা সদরে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শুরু করতে পারেন। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের এই প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামে গ্রামে বিভিন্নমুখী কুটির শিল্প স্থাপনের নুতন নুতন পদ্ধতি সৃষ্টি করুন। আমরা আশা করি আমাদের প্রস্তাবিত "ভূমির সর্বাত্মক সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের" মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কুটির শিল্পের কাঁচা মাল অচিরেই উৎপাদন শুরু হবে। এবং আমাদের কাংখিত দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে কুটির শিল্প এক বিরাট অবদান রাখবে।

১৮-১৫ মৌমাছির চাষ

সুষম খাদ্যের জন্য, বিশেষ করে শিশুদের অপুষ্টিজনিত দুর্বলতা ও অসুখ-বিসুখ নিবারণের জন্য মধু একটি অতি উত্তম খাদ্য। তবে আমাদের দেশের শতকরা ১ ভাগ লোকের ভাগ্যে ও বছরে ১বার দুবার একটুখানি মধু খাওয়ার সুযোগ হয়না। এর কারণ মধুর দুস্প্রাপ্যতা ও দূর্মূল্য।

মৌমাছির আবাদ মোটেই কঠিন নয়। যে কোন মহিলা প্রায় বিনা পরিশ্রমে অত্যন্ত আর্কষনীয় ও আনন্দদায়ক উৎপাদনমুখী এই কাজ সমাধা করতে পারেন।

মৌমাছি এক প্রকার অত্যন্ত পরিশ্রমী সদা ব্যস্ত ও শৃংখলাবদ্ধ পতঙ্গ। এরা সঞ্চয়ী, মিতব্যয়ী ও সামাজিক প্রাণী হিসাবে পরিচিত। প্রাণী জগতে মানুষের যতো সব বন্ধু নীরবে আজীবন কাজ করে, মৌমাছি তাদের অন্যতম। মৌমাছি প্রত্যহ ছোট বড় বৃক্ষরাজী, এমন কি শাক সব্জি ও ঘাসের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। ফুলের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা ফুলের পরাগ অন্য ফুলে নিয়ে যায় এবং এরই ফলশ্রুতিতে তৈরী হয় ফল ও বীজ।

যেখানেই উদ্ভিদ আছে সেখানেই কোন না কোন জাতের মৌমাছি ঘুর ঘুর করছে আর মৌচাক তৈরী করার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ দীর্ঘকালের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স উদ্ভাবন করেছে যার নির্দিষ্ট কুঠুরীতে একটিমাত্র রাণী মৌমাছিকে সযত্নে লালন করলে মৌমাছির কর্মীবাহিনী সেই স্থান খুঁজে বের করবেই। আর সেখানে মৌচাক তৈরী করবেই। এটা মানুষের নতুন কোন উদ্ভাবন নয়। সৃষ্টির একটি ছোট্ট রহস্যকে মানুষ তার নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করার একটি কলা কৌশল।

www.pathagar.com

গাছের মধ্যে মৌমাছি ঠিক যেভাবে মৌচাক তৈরী করে এবং সেই মৌচাকে যেভাবে মধু ও মোম প্রস্তুত হয়, একই ভাবে পাতানো কাঠের বাক্সে একের পর এক তৈরী করতে থাকে, আর সেই মৌচাকেও তৈরী হয় মধু ও মোম।

বাংলাদেশে মধু উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটি সখ হিসাবে এখানে সেখানে কেউ কেউ সাফল্যজনকভাবে করছেন। এটা থেকে তারা প্রায় বিনাপরিশ্রমে স্বল্প আয় করে থাকেন। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট জাতের ফলের গাছ অত্যন্ত অল্প বিধায় মধুর উৎপাদনও কম। বিশ্বের বহুদেশে সচক্ষে দেখেছি, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত কমলা বাগান, আপেল, আঙ্গুর ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ফলের বাগানে প্রচুর মৌচাক। উন্নতমানের মধু ও মোম সেই সব বাগানের একটি বাড়তি আয়।

আমাদের দেশের সাগর সৈকতে বিশাল সুন্দরবন এলাকায় ফলের গাছ নেই বললেই চলে। তথাপি বিভিন্ন জংলী গাছের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে প্রচুর পরিমাণে মধুর উৎপাদন হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলায় উপজাতীয় অধিবাসীরা কিছু কিছু ফুল উৎপাদন করেন। সেই জন্য ঐ এলাকার মধু কিছুটা উন্নতমানের। সিলেটের উত্তর সীমান্তে, খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে যে এলাকায় সুস্বাদু কমলা উৎপাদিত হয় সেই এলাকার উন্নতমানের মধুর নামই হলো কমলা মধু।

দারিদ্র ও বেকারত্ব বিমোচনের যে পরিকল্পনা আমরা জাতির সামনে তুলে ধরছি, তার মধ্যে দেশের সর্বত্র ফলমূল শাকসব্জি বিপুলভাবে উৎপাদন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের এই পদক্ষেপের সাথে প্রাকৃতিক নিয়মেই মধু উৎপাদন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা সেটাকে অনির্ধারিত কোন না কোন গাছের মাথা থেকে হাতের কাছে নিয়ে আসার যে পরীক্ষিত প্রক্রিয়া এদেশেই প্রচলিত আছে তার কেবল সম্প্রসারণের সুপারিশ করছি। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য যে প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক তা এই দেশেই আছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ভূমিকাঃ "Fools, rush in where augels fear to tread". আমরা এমন একটি ভয়াবহ এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি, যেখানে বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও প্রবেশ করতে ভয় পান। তবে আমরাতো সজ্ঞানে এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছি।

আমরা পুস্তকের প্রারম্ভেই বলেছি, বাংলাদেশের গণ মানুষের সমস্যাবলী কোন কালেই চিহ্নিত হয়নি, সমাধানের প্রচেষ্টাতো দূরের কথা। আমরা কখনো এরূপ আশা প্রকাশ করিনি যে, বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র এই ভূখন্ডে বসবাসরত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এক জন গোষ্ঠিকে রসাতলের তলাহীন অতল থেকে রাতারাতি টেনে তুলে নিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবো। এরূপ একটা দুরাশা আমাদের মনের অবচেতন কোণেও কস্মিনকালে স্থান পায়নি।

আমরা যে আশা নিয়ে এই ভয়াবহ এলাকায় অনাধিকার প্রবেশ করেছি সেটা হলো, এই দুর্ভাগা অতিক্ষুদ্র দেশের বিড়ম্বিত অতিবৃহৎ জণগোষ্ঠির সমস্যাবলী চিহ্নিত করার একটি প্রয়াস এবং চিহ্নিত করা সমস্যাবলী সমাধানের রূপরেখার সূচনা করা।

যুগ যুগ ধরে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে কোন কুল–কিনারা না পেয়ে ১৯৮৫ সালে "দেশটা কি রসাতলেই যাবে?" শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে ঐ চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করি। পচাঁশির সেপ্টেম্বর থেকে উনানব্বইর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান আমার সমস্ত চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তাই আজ যখন এই চিন্তা চেতনাকে লিপিবদ্ধ করে এর একটা শেষ সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছি, তখন এইটুকু পরিতৃপ্তি লাভ করছি যে, আর কিছু না হোক, এক ভয়াবহ এলাকার দ্বার উম্মোচন তো করে ফেলেছি, বিজ্ঞজনদের প্রবেশের সুযোগতো সৃষ্টি করে দিয়েছি; এখন তাঁরা সেখানে সদর্পে প্রবেশ করে বিচরণতো করবেনই, এমনকি এই ভয়াবহ এলাকায় লুক্কায়িত মনি মুক্তা আহরণ করে ক্ষুধার্ত জাতিটার ক্ষুন্নি বৃত্তি করতে আর বাঁধা প্রাপ্ত হবেন না।

বাংলাদেশের আসল সমস্যা যে অর্থনৈতিক, অন্য সকল সমস্যা যে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকেই জন্ম লাভ করে ক্রমে ক্রমে আসল সমস্যাটাকে চাপা দিয়ে রেখেছে, সে উপলব্ধি বহুকাল পূর্বেই আমার মনে জেগেছিলো, কিন্তু যতোই চিন্তা করলাম, দেখলাম অর্থনৈতিক সমস্যার একক, বিচ্ছিন্ন সমাধান কোন ভাবেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশ নামক মুমূর্ষ রুগীর সমস্ত শরীরটা এখন অসংখ্য পার্শ্ব রোগ এমনভাবে আক্রান্ত করেছে যে মূল রোগটা এখন দৃষ্টি গোচরই হয় না। মূল রোগ থেকে উদ্ভূত পার্শ্ব রোগগুলোই এখন দৃষ্টিগোচর হয় বেশী, এবং ঐ পার্শ্ব রোগগুলোকেই এখন আসল রোগ বলে মনে হয়। মূল রোগ হয়তো পাকস্থলিতে, কিন্তু হাত, পা, নাক,মুখ, চোখ, কান সবই এখন রোগাগ্রস্ত হয়ে, এমনই শক্তিহীন, অবশ হয়ে পড়েছে যে এখন ভিন্ন ভিন্ন রোগের চিকিৎসা নয়, গোটা মুমূর্ষু শরীরটা চিকিৎসা করা ছাড়া এই রুগীকে রোগ মুক্ত করা সম্ভবই নয়।

www.pathagar.com

সেই জন্য আমি প্রয়াশ পেয়েছি, বাংলাদেশ নামক রুগীটার সমস্ত রোগ চিহ্নিত করতে, এবং একই সাথে চিহ্নিত করা সকল রোগের চিকিৎসা শুরু করতে। একথাটা প্রকারান্তরে হলেও পুস্তকের প্রথমদিকে বলে রাখতে দ্বিধাবোধ করিনি।

বাংলাদশের সার্বিক সমস্যাকে আমরা চারটি মৌলিকভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির শাখা-প্রশাখা চিহ্নিত করার প্রয়াশ পেয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত সমাধানে আমরা প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখা ইচ্ছাকৃতভাবেই বিবেচনায় নেইনি। যেমনঃ দেশের রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর আমরা মূল সূত্র নির্ধারণ করেছি এবং কেবলমাত্র সেই মূল সূত্র সমাধানের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেছি। আমি বিশ্বাস করি ঐ মৌলিক সমস্যার সমাধান ছাড়া রাজনৈতিক সমস্যার আর কোন স্থায়ী সমাধানই নেই। কোন সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠক যদি বিকল্প সমাধানের প্রস্তাব দিতে পারেন, আমি সেটা সাদরে বিবেচনা করবো এবং যদি সেই প্রস্তাব আমার প্রস্তাবের চেয়ে সহজতর ও বাস্তবধর্মী হয়, তাহলে আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবো।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমি বলেছি, যেহেতু গোটা প্রশাসন রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট হয়ে গেছে, এবং রাজনৈতিক সমস্যার আশু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব নয়, সেইহেতু আমি প্রশাসনিক সমস্যার সার্বিক সমাধানের প্রচেষ্টা থেকেও বিরত থেকেছি। তবে প্রশাসনের যে একটি সমস্যা,-দুর্নীতি, মানুষের জীবনযাত্রায় পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, এমনকি মানুষের অস্তিত্বকেই অসহনীয় করে তুলেছে, প্রশাসনিক দুর্নীতি সমস্যাটির প্রতিকারের একটি আংশিক রূপরেখা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়েছি। ক্ষমতাসীন সরকার যদি এটা গ্রহণ করে নেন, তাহলে আমি নিশ্চিত, সহসাই এর চমকপ্রদ ফল পাওয়া যাবে, মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে, আর সরকার কৃতিত্বের দাবীদার হবেন। কিন্তু সংকল্প-সিদ্ধান্তের অভাবেই হোক, আর প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতার জন্যই হোক, সরকার যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন, তাহলে আমি দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে দেশের আইনের পরিসীমা অতিক্রম না করে যে কার্যক্রমটি পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়েছি, তাছাড়া আর কোন বিকল্প পথ আমি খুঁজে পাইনি। কোন সম্মানিত পাঠক বিকল্প প্রস্তাব দিতে পারলে আমি সেটা সাদরে বিবেচনা করবো।

সামাজিক সমস্যা সমাধানে আমি আরো বেশী প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। সামাজিক সমস্যাবলী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যাবলীরই উপসর্গ। রাজনৈতিক প্রশাসনিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়। এই প্রতিকূলতার মধ্যে আমি শিক্ষা সমস্যা সমাধানের একটি প্রস্তাব দিয়েছি, যার সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করবে সরকারের সংকল্প সিদ্ধান্তের

স্বাস্থ্য সমস্যা সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছি তার সমাধানও মূলত সরকারের সংকল্প সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তবে এই ক্ষেত্রে জনগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কিছু কাজ শুরু করলে অবশ্যই কিছু ফল পাবেন। অনুরূপভাবে নারী নির্যাতন ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এই দুটি সমস্যার সমাধানেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রণী ভূমিকা এক আশাব্যঞ্জক অবদান রাখতে পারে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে আমি দারিদ্রকেই দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি; এবং বারে বারে বলেছি দারিদ্র সমস্যার সমাধান ছাড়া বাংলাদেশের কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। পুস্তকের এক বৃহৎ অংশ নিবেদিত হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, তথা দারিদ্র বেকারত্ব সমস্যার উপর। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, সরকার দারিদ্র সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসলে এই হতভাগা দেশ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, দারিদ্র কবলিত দেশগুলোর জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে। আমার প্রত্যাশা, ক্ষমতাসীন সরকার আমার এই প্রস্তাব গভীর মনোযোগ সহকারে বিবেচনাকরবেন।

কিন্তু দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনে আমার প্রস্তাবাবলী যদি দু-চারটি পরিবারও গ্রহণ করে নেন, তবে কাজ শুরু করে দিতে কোন বাঁধা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। একেকটি পরিবার সম্পূর্ণ এককভাবেই যদি আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদের সাফল্য সুনিশ্চত। সেই ক্ষেত্রে একজন সমাজসেবী হিসাবে আমি আমার সীমিত শক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করতে পিছপা হবো না।

লক্ষ্যমাত্রা ঃ আমাদের বিঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা হলো দেশের এগারো কোটি মানুষের মধ্যে দশ কোটির দারিদ্র বিমোচন করা আর ছয় কোটি মানুষ, যাদের অবস্থান আন্তর্জাতিক দারিদ্রের নিম্নতম সীমা রেখারও নিচে, তাদের দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার করা উৎপাদনমুখী উপার্জনক্ষম করে স্বাবলম্বী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা। একেকটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়ের কমতো কোন হিসাবেই নয় বরং আট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা একটি পরিবারের গড়পড়তা লোকসংখ্যা সাত ধরে নিলাম। আর নারী পুরুষ সহ একেকটি পরিবারের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ধরে নিলাম তিনজন। অর্থাৎ দশ কোটি লোক এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পরিবারে বিভক্ত। এই এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পরিবারে কর্মক্ষম নরনারীর সংখ্যা দাঁড়ায় চার কোটি আটাশ লক্ষ। এই চার কোটি আটাশ লক্ষ কর্মক্ষম নরনারীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সার্বক্ষণিক কর্মরত আছেন বলে ধরে নেয়া যায়। তাহলে দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ নরনারী হয় আংশিক না হয় সার্বক্ষণিক বেকার। তবে এটাও ধরে নেয়া যায় যে এই দুই কোটি পচাঁশি লাখের মধ্যে অন্তত দুই কোটি লোক সার্বক্ষণিক বেকার নন। এরা খন্ডকালীন কাজ করেন অর্থাৎ এই দুই কোটি লোক আংশিক বেকার। বাকী পঁচাশি লক্ষ নরনারী সার্বক্ষণিক বেকার। আমাদের এই পরিকল্পনার রূপরেখায় পঁচাশি লক্ষ সার্বক্ষণিক বেকার ও দুই কোটি আংশিক বেকারকে কোথায় কিভাবে কর্মসংস্থান করে দিবো, তার নীল নক্শা তৈরী করা সম্ভব নয়। তবে আমরা সে প্রস্তাবনা উপস্থাপিত করছি তাতে পঁচাশি লক্ষ সার্বক্ষণিক বেকারের কর্মসংস্থান তো অবশ্যই হবে, দুই কোটি আংশিক বেকারেরও কর্মঘন্টা যথেষ্ট বেড়ে যাবে। অর্থাৎ আংশিক বেকারত্বের প্রকটতা কমে আসতে শুরু হবে।

আমরা এই পুস্তকে যে সব কার্যক্রমের প্রস্তাব করেছি তাতে কত লোককে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাবে তার একটা আনুমানিক হিসাব আমরা নিম্নে প্রদান করছি। এই হিসাবের জন্য আমরা পরিবার প্রতি গড়পড়তা ২৫টি দীর্ঘস্থায়ী ফলবান বৃক্ষ লাগানোর আইনত অধিকার সৃষ্টি করে দিতে পারলে ধরে নেব আমাদের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

সাধিত হয়েছে। ঐ ২৫টি ফলবান বৃক্ষের সাথী ফল হিসাবে ঐ পরিবার এখন আরো একশতটি বা ততোধিক তৃণ জাতীয় গুল্ম জাতীয় অথবা সব্জি জাতীয় উদ্ভিদ লাগাবার সুযোগ লাভ করবে। ২৫টি দীর্ঘস্থায়ী ফলবান গাছ থেকে ঐ পরিবারের বার্ষিক আয় হওয়া উচিত অন্তত ১২ হাজার টাকা; আর সাথী ফসল থেকে অন্তত ৬ হাজার টাকা; অর্থাৎ বার্ষিক মোট ১৮ হাজার টাকা।

যে স্থলে আমাদের উদ্ধারকৃত ভূমি, মাঠের চাষাবাদের ভূমি, সেই স্থলে তো বৃক্ষের হিসাব সংগত হবে না; সেখানে মোটামুটি পরিবার প্রতি বার্ষিক ১৮ হাজার টাকায় আয় দেখানোই সংগত হবে। এই সূত্র ধরে আমরা এখন হিসাব করে দেখি আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মোট কত পরিবার অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব লাভ করে।

এবার আমরা একটু হিসাব করে দেখি আমাদের পরিকল্পনায় ১০ কোটি দরিদ্র জনসংখ্যার ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবার কি পরিমাণ উপকৃত হতে পারেনঃ-

(১) আমরা ৪৮ কোটি দীর্ঘস্থায়ী ফলবান বৃক্ষ লাগাবার মত স্থানের সন্ধান পেয়ে গেছি; এখন সরকার যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবার গড়পড়তা ৩৪টি দীর্ঘস্থায়ী ফলবান বৃক্ষের মালিক হতে পারবেন। চারা লাগানোর ৫ থেকে ৬ বছর পর এই ৩৪টি ফলবান বৃক্ষ বছরে কম পক্ষে ১৫ হাজার টাকার ফল দান করতে থাকবে। প্রথম ৫/৬ বছর ঐ বৃক্ষগুলোই মাঝে মাঝে সাথী ফসল, যেমন দ্রুত ফলনশীল শাক সব্জি, আদা, হলুদ এবং অতি লাভবান পেঁপে চাষ করে একটি পরিবার বছরে সহজে অন্তত ১২ হাজার টাকার ফসল উৎপাদন করতে পারবেন। এই হিসাবে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারই ভূমির মালিকানা না পেলেও স্থায়ী বৃক্ষরূপী স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আয়ের পথ পেয়ে যাবেন।

(২) দেশের বর্তমান গো-সম্পদ ছাড়াও আমরা প্রস্তাব করেছি দেশের চূড়ান্ত ১১ কোটি লোকের জন্য ১১ লক্ষ উন্নতমানের গাভী আমদানী করতে। এই ১১ লক্ষ গাভীর লালন পালন ও পরিচর্যা করতে দেশের দরিদ্রতম নরনারীর কর্মসংস্থান ঘটবে প্রচুর। এতে তাদের পরিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে।

(৩) দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের আমরা যে প্রস্তাবনা রেখেছি তাতে বাৎসরিক অন্তত ২ লক্ষ মেঃ টন বাড়তি মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হবে। ২ লক্ষ মেঃ টন মৎস্যের মূল্য কমপক্ষে আটশত কোটি টাকা। এই কার্যক্রম লক্ষ লক্ষ নরনারীর কর্মসংস্থান হবে এবং দরিদ্র পরিবারের কর্মক্ষম লোকেরাই এই উৎপাদন মূলক কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হবে।

(৪) চরাঞ্চলের বর্তমানে অব্যবহার্য ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার একর ভূমিতে আমাদের প্রস্তাবিত পন্থায় চাষাবাদ করলে বছরে অন্তত ছয় লক্ষ মেঃ টন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হবে যার মূল্য কম পক্ষে পাঁচশত কোটি টাকা। এই বিরাট কার্যক্রমেও লক্ষ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান হবে। অর্থাৎ দরিদ্র বেকার লোকের বাড়তি আয়ের পথ হবে।

www.pathagar.com

(৫) চিংড়ি চাষ সম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাবনা রেখেছি তাতে এক বিরাট বাড়তি আয়ের সূত্র হবে এবং সেখানেও কর্মসংস্থান হবে লক্ষ লক্ষ লোকের।

ব্যক্তি ও স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক ঃ দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে তার যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে একটি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই স্থাবর সম্পত্তির জন্য তার যে একটা দায়-দায়িত্ব আছে সেই কথাটা সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ রাখার জন্য আমার প্রস্তাব মানব সন্তানের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সেই দায়িত্ব নিরূপিত করে দিবে একদিকে নির্দিষ্ট দায়িত্বজ্ঞান তাকে দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধ করবে আরেক দিকে কর্তৃত্ব বা মালিকানা তার মধ্যে একটা উৎসাহ অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবে। এই কাঁঠাল গাছটা পরিবার কর্তা সুরুজ আলীর, এই আম গাছটা স্ত্রী চাঁদ বিবির ঐ নারিকেল গাছটা ছেলে তারা মিয়ার, ঐ তালগাছটা মেয়ে সাজেদার, ঐ কুল গাছটা বৃদ্ধ দাদার, ঐ পেয়ারা গাছটা বৃদ্ধ দাদীর এই পদ্ধতিতে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের ফলবান বৃক্ষের প্রতি একটি ব্যক্তিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হবে এবং এই আকর্ষণ বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত করলে স্বল্পস্থায়ী সাথী ফসলের পরিচর্যায় একটা অবিশ্বাস্য প্রতিদান দিবে।

মহিলাদের ভূমিকাঃ মহানগরী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত মহিলারা ফলবান বৃক্ষ, শাক সব্জি, তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপাদনে চমকপ্রদ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ঢাকা মহানগরীতে এবং অন্যান্য শহরে যে সব অনিষ্টকারী অনর্থকরী ফলহীন জরাজীর্ণ বৃক্ষ অতিমূল্যবান ভূমি দখল করে আছে আর আর্থিক কোন প্রতিদানই দিচ্ছেনা এগুলোর মূল উৎপাটন করিয়ে তারা নিজস্ব বাসস্থানের স্বল্পপরিসরেও উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদনের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। যাদের শহরে বাড়ীতে কোন ব্যবহারযোগ্য ভূমিই নেই, তারা বারান্দায়, বেলকোনীতে ছাদের উপরে, মাটির টবের মধ্যে, শাক সব্জি এবং বিশেষ করে ফুল উৎপাদন করতে পারেন। এটা চিত্ত বিনোদনের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি ছেলেমেয়েদেরও এদিকে আকৃষ্ট করা সচ্চরিত্র গঠনে উত্তম সহায়ক।

শহর এবং শহরতলীতে বাণিজ্যিক হারে ফুলের চাষ ঢাকায় শুরু হয়ে গেছে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত মহিলারাও আজকাল এই বিনোদনমূলক কাজের মাধ্যমে একদিকে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন অন্যদিকে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করছেন।

অনেক মহিলারা উন্নতমানের মোরগ পালন করে ভাল উপার্জন করছেন। তিতর, টার্কি ও ময়ূর পালন উচ্চমানের বিনোদন এবং অত্যন্ত লাভজনক। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আমি যখন রমনার বেইলী রোড, পার্ক রোডের সুবিশাল বাড়ীতে থাকতাম তখন আমাদের পরিবারের গর্ব ছিল ছয়টি ময়ূর, চারটি টার্কি এবং প্রায় ১ ডজন তিতর। ঐ বাড়ীরই প্রাঙ্গণে এখন ছয়জন মন্ত্রীর জন্য নতুন বাড়ী নির্মাণ হয়েছে।

ঢাকায় বর্তমানে বেশ কিছু মহিলা বিদেশী উন্নতমানের কুকুর ও বিড়াল পুষে বাচ্চা বিক্রী করে ভাল টাকা উপার্জন করছেন। এগুলোর বিজ্ঞাপন প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়। খরগোস ও গিনিপিগ পালনও অত্যন্ত লাভজনক। মহিলারা অতিসহজে এইসব বিভিন্নমুখী আনন্দদায়ক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারেন।

www.pathagar.com

খাদ্যাভ্যাসঃ দেশের অর্থনীতির সাথে খাদ্যাভ্যাসের সম্বন্ধ নিবিড়। আমাদের দেশে খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠছে কোন বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় নয়। দেশের অশিক্ষিত লোকের কথা বাদই দিলাম; যারা শিক্ষিত বলে দাবী করি, আমরাইতো কোন্ খাদ্যের মূল্যমান কি তা সঠিক ভাবে জানি না। আমরাইতো সস্তা ও সহজলভ্য শাক সব্জি, ফলমূল যথেষ্ট পরিমাণে খাইনা। পুষ্টি বিজ্ঞান আমাদের দেশে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমার প্রস্তাব প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক। স্বাস্থ্যের উপর কোন্ খাদ্যদ্রব্যের কি প্রভাব, এটাতো জীবন যাত্রার প্রথম সবকই হওয়া উচিত। সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদনের সহজ কলাকৌশল প্রাথমিক শিক্ষারই অঙ্গ হওয়া উচিত।

একটি স্বাস্থ্যবান সবল কর্মঠ মেধাবী জাতি গঠনে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। প্রচলিত অত্যধিক মস্লা যুক্ত খাদ্যের স্থলে বিভিন্ন প্রকার মুখরোচক সুষম খাদ্য প্রস্তুত হতে থাকলে ধীরে ধীরে মানুষ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করবে। পুষ্টিবিজ্ঞানীগণ এ সম্বন্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করি।

অবকাঠামোঃ দারিদ্র–বেকারত্ব বিমোচনের যে কর্মসূচী আমরা গভীর সাধনা–গবেষণা করে দাঁড় করেছি, এটা একটি রূপরেখা মাত্র। এখন এটা সংশোধন, পরিবর্ধন, এমনকি পরিবর্তন তেমন কঠিন কাজ নয়। কঠিন কাজ হলো এর বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ সরকারের এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক অব কাঠামো নেই, যা দারিদ্র বিমোচনের এই ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়ীত্ব পালন করতে পারে। অন্য কোন দেশেও এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে বলে জানিনা। দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের নামে শ্বেত হস্তীর জন্ম দিয়ে অপচয়ের নুতন আরেকটি সূত্র সৃষ্টি করা যেতে পারেনা।

দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচনের কর্মসূচীতে সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগের, প্রত্যেকটি সংস্থার, প্রত্যেকটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। অর্থাৎ, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো কোন একটি মন্ত্রণালয়ের একক আওতায় পড়বে না। এটা হবে সামগ্রীক ভাবে বাংলাদেশ সরকারের সর্বব্যাপী এক কর্মসূচী।

আমার মতে, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্বে থাকতে হবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা সরাসরি দেশের সরকার প্রধানের নেতৃত্বে ও নির্দেশে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সমর্পণ করবে। তবে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সেটা তদারকির দায়িত্ব ঐ প্রতিষ্ঠানকেই পালন করতে হবে।

দারিদ্র বিমোচন কর্তৃপক্ষ একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার কোন আবশ্যকতা আমি দেখি না। এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ততোদিনই দরকার যতোদিন দারিদ্র বেকারত্ব বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন হবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন হয়ে

www.pathagar.com

গেলে আর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখিনা। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের আয়ুষ্কাল ১০ বছরের বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সরকার প্রধানের অধীনে এটা একটা উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হওয়াই বাঞ্চনীয় হবে। একটি জরুরী আইন পাশ করে এই স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সৃষ্টি করে যতশীঘ্র কাজ আরম্ভ করা হবে ততোই মঙ্গল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

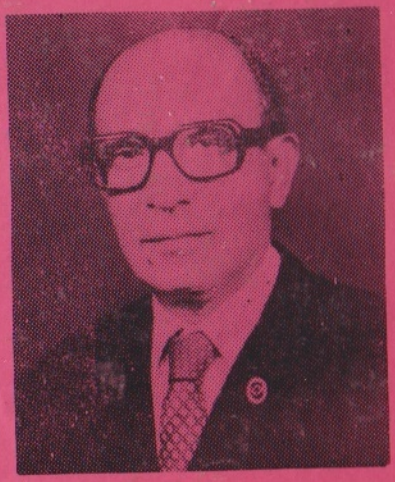

মোহাম্মদ আবদুল হক

জন্মঃ কামালপুর, জাকিগঞ্জ, সিলেট, ১৯১৮

শিক্ষাঃ বি, এ (অনার্স ইংলিশ), কলিকাতা, ১৯৪২

সরকারী চাকুরীঃ ১৯৪৩ সালে প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে ডি, এস, পি নিযুক্ত। ১৯৪৭ সালে পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তানে উন্নীত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সড়ক পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

প্রশিক্ষণঃ ইন্টারপোল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, এফ বি আই, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান পুলিশ প্রশাসন ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে ওয়াশিংটনে বিশ্ব পুলিশ প্রধানগণের নির্বাচিত নেতা।

বিদেশ ভ্রমণঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, গণচীন, জাপান সহ ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার প্রায় সকল দেশ একাধিকবার।

প্রতিষ্ঠাতাঃ ১৯৪৩ সাল থেকে বিভিন্ন জেলায় অনেক স্কুল, মক্তব, মসজিদ, লাইব্রেরী,বিনোদন কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম, পার্কসহ ঢাকা পুলিশ ক্লাব, রাজারবাগ উদ্যান ও মসজিদ, সাপ্তাহিক ডিটেকটিভ ও বাংলার ডাক, দেশের বৃহত্তম পুলিশ সমবায় সমিতি, পলওয়েল কমপ্লেক্স (প্রিটিং প্রেস, সপিং সেন্টার, জোনাকী সিনেমা হল), দেশের প্রথম প্রাইভেট হাসপাতাল 'আরোগ্য নিকেতন', জাকিগঞ্জ কলেজ ইত্যাদি।

সমাজ সেবাঃ জাতীয় সমবায় মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রামীণ ঋণ উপদেষ্টা, প্ল্যানিং কমিশনের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সৌদি আরবে অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য, ইরান ও সৌদি আরবে জনশক্তি বিষয়ক প্রতিনিধি দলের নেতা, আর্ন্তজাতিক সমবায় সেমিনারে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও বুলগেরীয়ায় নির্বাচিত সভাপতি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পুলিশ সমবায় সমিতি (১৯৬০-৭০), প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক ডিটেকটিভ (১৯৬০-৭০), সভাপতি জালালাবাদ এসোসিয়েশন (১৯৬২-৭৮), সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতি (১৯৬২-৭৮), সভাপতি, জাতীয় চিত্তবিনোদন সমিতি (১৯৬২-৮৬), সভাপতি, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশন (১৯৬৪-৬৫), সভাপতি, পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসেস এসোসিয়েশন (১৯৬৬-৭০)

পদবীঃ এস কে; টি পিকে; পি পি এম; পি এস পি।

রাজনীতিঃ আসাম মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল সেক্রেটারী (১৯৪০-৪২), রাজনৈতিক পার্টি জাগদলের প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সদস্য (১৯৭৬-৭৮), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্দলীয় সদস্য (১৯৭৯-৮২), রাজনৈতিক পার্টি জনদলের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি (১৯৮২-৮৫), ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী (১৯৮৪-৮৫), জনদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি (১৯৮৫-৮৬), দলীয় রাজনীতি পরিত্যাগ (১৯৮৭)